নির্বাচিত সামবেদীয়ব্রাহ্মণ ও তদুত্তরবর্তী সাহিত্যে প্রাপ্ত নির্বচনপদ্ধতি: একটি সমীক্ষা

পিএইচ.ডি. গবেষণা নিবন্ধ

(আর্টস)

গবেষিকা

সুতপা মণ্ডল

নির্দেশিকা

ড. কাকলী ঘোষ

অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২৪

Certified that the Thesis entitled

"নির্বাচিত সামবেদীয়ব্রাহ্মণ ও তদুত্তরবর্তী সাহিত্যে প্রাপ্ত নির্বচনপদ্ধতি: একটি সমীক্ষা" – submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Dr. Kakali Ghosh, Professor, Department of Sanskrit, Jadavpur University and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the
Supervisor:
Dated:

Candidate:
Dated:

প্রস্তাবনা

নদীর স্রোতের ন্যায় প্রবহমান সময়ের গতিতে অনেক কিছুই যেমন বিলুপ্ত হয়ে যায়, তেমনি আবার পরিবর্তিত সময়কে পাথেয় করে কিছু বিষয় আরও পুষ্টি সম্পাদন করে পরিপূর্ণতা লাভ করে। দুরূহ বৈদিক সাহিত্যরূপ মহাসমুদ্রে অবাধ অবগাহনের এক অন্যতম পরিপন্থী হল 'নির্বচন'। এটি শব্দের অর্থনির্ণয়ের পাশাপাশি, উৎপত্তির ইতিহাস সম্বন্ধেও পাঠকগণকে অবগত করে। 'নির্বচন' বৈদিক যুগের সাহিত্যকে সহজবোধ্য ও সমৃদ্ধি প্রদান করেছে এবং সময়ের গতিতে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত না হয়ে পরবর্তীকালের সাহিত্যিকদের মানস-চক্ষুতে বিরাজিত থেকে লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যকেও অনন্যতা প্রদান করেছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে, বৈয়াসিক *মহাভারত*-এ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামের নির্বচনসমূহ। বৈদিক থেকে লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্য অবধি ব্যাপ্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করেই প্রস্তুত "নির্বাচিত সামবেদীয়ব্রাহ্মণ ও তদুত্তরবর্তী সাহিত্যে প্রাপ্ত নির্বচনপদ্ধতি: একটি সমীক্ষা" নামক গবেষণা নিবন্ধটিতে নির্বচনগুলির পদ্ধতিগত বিশ্লেষণের প্রয়াস করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে *নিরুক্ত* নামক নির্বচনশাস্ত্রে যাস্কাচার্য দ্বারা উল্লিখিত পদ্ধতিত্রয় এবং তদনুসারে 'অগ্নি' শব্দের নির্বচনসমূহকে স্মৃতিতে সংরক্ষণ করেই লক্ষ্য পূরণে সচেষ্ট হয়েছি। এছাড়াও বিষয়গত একঘেয়েমি নিবারণের জন্য পদ্ধতিগত বিশ্লেষণের সাথে শব্দগুলির নির্বচন অনুসারে উৎসসন্ধান এবং তুলনাত্মক আলোচনাতেও মনোনিবেশ করা হয়েছে।

'ভূমিকা' ও 'উপসংহার' সহ বর্তমান গবেষণা নিবন্ধটি মোট সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়টি 'ভূমিকা', দ্বিতীয় অধ্যায়টি 'নির্বাচিত সামবেদীয় ব্রাহ্মণসমূহে প্রাপ্ত নির্বচনপদ্ধতি', তৃতীয় অধ্যায়টি '*নিরুক্তে* প্রাপ্ত সামবেদীয় শব্দসমূহের নির্বচন', চতুর্থ অধ্যায়টি '*বৃহদ্দেবতা* ও *মহাভারতে* প্রাপ্ত নির্বচন', পঞ্চম অধ্যায়টি '*বেদমীমাংসা* ও *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থে বেদব্যাখ্যায় নির্বচন', ষষ্ঠ অধ্যায়টি 'নির্বাচিত বৈদিকগ্রন্থসমূহে ও *মহাভারতে* প্রাপ্ত কতিপয় দেববাচক শব্দের তুলনাত্মক আলোচনা' এবং সর্বশেষ সপ্তম অধ্যায়টি 'উপসংহার'। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে বক্তব্যের সমর্থনে 'তথ্যপঞ্জি' সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এছাড়াও গবেষণা নিবন্ধের শেষে 'পরিশিষ্ট' ও 'গ্রন্থপঞ্জি' যথাযথভাবে বিদ্যমান।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'B.A.', 'M.A.' ও 'M.Phil.' করার পর 'Ph.D' করার সুযোগ পেলে, ২০১৯ সালের ২০ই অগাস্ট এই বিভাগে গবেষণার জন্য আমার নিবন্ধীকরণ হয়। যেহেতু 'M.Phil.' এর আকরগ্রন্থ ছিল *নিরুক্ত* নামক নির্বচনশাস্ত্র সেইজন্য গবেষণার বিষয় ও দিক নিয়ে আলোচনার সময় আমার অধ্যাপিকা ড. কাকলী ঘোষ মহাশয়া, যিনি বস্তুত এই গবেষণা কার্যের নির্দেশিকা, আমাকে ব্রাহ্মণ সাহিত্যের নির্বচন ব্যাপারে পড়াশোনার জন্য নির্দেশ দেন। প্রাথমিকভাবে চারটি সংহিতার অন্তর্গত একাধিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থে অসংখ্য নির্বচন পাওয়া যায়। শোধপ্রবন্ধের পরিধি সংক্ষেপ করার জন্য *সামবেদসংহিতার* কয়েকটি ব্রাহ্মণগ্রন্থ এবং পরবর্তীকালে রচিত কয়েকটি লৌকিক ও বৈদিক গ্রন্থ আধার হিসাবে গ্রহণ করা হয়। সেখানে প্রাপ্ত নির্বচনগুলির *নিরুক্তকার* অনুসারে পদ্ধতিগত অনুসন্ধান মূল লক্ষ্যে পরিণত হয়।

যেকোনও গবেষণা কার্যের শুরুর দিকে প্রধান যে বাধা থাকে, তা হল তথ্যের অপর্যাপ্ততা। আমার গবেষণার কাজেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। যাস্কাচার্যের নির্বচনপদ্ধতি গুলির অর্থবোধের ক্ষেত্রে নানাবিধ মত পরিলক্ষিত হয়। অবশেষে সৌভাগ্যক্রমে আমার অধ্যাপিকার দিগ্-নির্দেশে 'অগ্নি' শব্দের ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তি এবং *নিরুক্তে* উল্লিখিত 'পরোক্ষবৃত্তি' ও 'অতিপরোক্ষবৃত্তি' শব্দ হিসাবে নির্বচন অনুযায়ী বিশ্লেষণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপিকা ড. কাকলী ঘোষ মহাশয়ার কাছে গবেষণার কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং মনে করি এই প্রাপ্তি আমার পুণ্যকর্মেরই ফলস্বরূপ। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে স্নেহে, শাসনে তাঁর সঠিক পথনির্দেশ ও সহযোগিতা গবেষণা নিবন্ধটি সম্পূর্ণ হতে বিশেষ সহায়তা প্রদান করেছে। শাস্ত্রীয় পরিসর ও ব্যবহারিক জীবনে তাঁর থেকে পাওয়া পরামর্শ ও উপদেশ আমার জীবনের পাথেয় স্বরূপ।

এখানে স্বীকার করতেই হয় যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ আমাকে পড়ার ও গবেষণা করার জন্য যে স্থান প্রদান করেছে, তার সৌজন্যেই অধ্যাপনার কাজে এবং গবেষণার কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখতে পেরেছি। অতএব কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি সংস্কৃত বিভাগের অন্যান্য সকল অধ্যাপক-অধ্যাপিকা বৃন্দকে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল ও ডিপার্টমেন্টাল লাইব্রেরি, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অফ কালচার্ মেন লাইব্রেরি, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিকদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। এছাড়াও Internet Archive, National Digital Library of India, Encyclopaedia Britanica, Shodhganga- এই কয়েকটি ডিজিটাল লাইব্রেরি ও রিসোর্সের প্রতি ঋণ স্বীকার করি।

সব শেষে বললেও যাদের মূল্যবান অবদানের কথা অত্যন্ত ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সাথে স্বীকার করতেই হবে, তারা হলেন আমার পরিবার ও বন্ধু। তাঁদের নিরন্তর অনুপ্রেরণা নানা শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে, কাজে মনোনিবেশ করতে সহযোগী হয়েছে।

বৈদিক সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে একবিংশ শতক পর্যন্ত নির্বচনের ব্যাপ্তি যেন মহাসমুদ্রের ন্যায়। আমি খুব সামান্যই পর্যালোচনা করতে পেরেছি। এই বিষয়ের ওপর গবেষণার পরিসর ও প্রয়োজন দুটিই বিদ্যমান। অতএব আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভবিষ্যতে তা গবেষকগণ কর্তৃক গবেষণার দ্বারা প্রকাশিত ও উদ্ঘাটিত হবে।

***

সূচিপত্র

			পৃষ্ঠাঙ্ক
প্রস্তাবনা		**:**	**১-২**
সূচিপত্র		**:**	**৩-৫**
প্রথম অধ্যায়	**ভূমিকা**	**:**	**৬-১৪**
১.০.	প্রাক্‌কথন	:	৬
১.১.	শোধনিবন্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ	:	৬-৭
১.২.	নির্বচনের ইতিবৃত্ত	:	৭-৮
১.২.১.	নির্বচন ও তার প্রতিশব্দসমূহ	:	৮-৯
১.২.২.	নির্বচন শব্দের উৎপত্তি ও প্রয়োগের ক্রমপর্যায়	:	৯-১০
১.২.৩.	নিরুক্ত শব্দের প্রয়োগ বৈচিত্র	:	১০-১১
১.২.৪.	নৈরুক্ত প্রক্রিয়ার প্রাপ্ত গ্রন্থ	:	১১
১.২.৫.	পদের ত্রিধা বর্গীকরণ	:	১১-১২
১.২.৬.	যাস্কীয় নির্বচনপদ্ধতি	:	১২
১.২.৬.১.	লক্ষণশাস্ত্রানুসারে নির্বচন	:	১২
১.২.৬.২.	লক্ষণশাস্ত্র ব্যতীত বৃত্তিসামান্যের দ্বারা নির্বচন	:	১২-১৩
১.২.৬.৩.	লক্ষণশাস্ত্রব্যতীত অক্ষরবর্ণসামান্যের দ্বারা নির্বচন	:	১৩
১.৩.	বিবেচনা	:	১৩
	তথ্যপঞ্জি	:	১৩-১৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	**নির্বাচিত সামবেদীয় ব্রাহ্মণসমূহে প্রাপ্ত নির্বচনপদ্ধতি**	**:**	**১৫-৬৬**
২.০.	ভূমিকা	:	১৫
২.১.	ব্রাহ্মণগ্রন্থের নামকরণ বিষয়ে বিবিধ মত	:	১৫
২.২.	ব্রাহ্মণগ্রন্থের লক্ষণসমূহ	:	১৫-১৬
২.৩.	ব্রাহ্মণসাহিত্যের প্রতিপাদ্য বিষয়	:	১৬
২.৪.	আরণ্যক ও উপনিষদ্ রূপে ব্রাহ্মণের অন্তিম দুই অংশ	:	১৬
২.৫.	সামবেদীয় ব্রাহ্মণসমূহ	:	১৬-১৭
২.৫.১.	সামবেদীয় নির্বাচিত ব্রাহ্মণসমূহ এবং প্রতিপাদ্য বিষয়	:	১৭-১৯
২.৬.	ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে প্রাপ্ত নির্বচনপদ্ধতি	:	১৯-৬২
২.৭.	উপসংহার	:	৬২

	তথ্যপঞ্জি	:	৬২-৬৬
তৃতীয় অধ্যায়	***নিরুক্তে* প্রাপ্ত সামবেদীয় শব্দসমূহের নির্বচন**	**:**	**৬৭-৮০**
৩.০.	ভূমিকা	:	৬৭
৩.১.	নির্বচনসমূহের তুলনা	:	৬৭-৭৯
৩.২.	উপসংহার	:	৭৯
	তথ্যপঞ্জি	:	৭৯-৮০
চতুর্থ অধ্যায়	***বৃহদ্দেবতা* ও *মহাভারতে* প্রাপ্ত নির্বচন**	**:**	**৮১-১১২**
৪.০.	ভূমিকা	:	৮১
৪.১.	গ্রন্থপরিচয়	:	৮১
৪.১.১.	*বৃহদ্দেবতায়* প্রাপ্ত নির্বচন সমূহের উৎসসন্ধান	:	৮১-৯৩
৪.১.২.	উপসংহার	:	৯৩
৪.২.	*মহাভারতে* (উদ্যোগপর্ব ও শান্তিপর্ব) প্রাপ্ত নির্বচন	:	৯৩
৪.২.১.	গ্রন্থপরিচয়	:	৯৩-৯৪
৪.২.১.১.	যাস্কীয় নির্বচনপদ্ধতি অনুসারে নির্বচনসমূহের বিশ্লেষণ	:	৯৮-১১০
৪.২.১.২.	উপসংহার	:	১১০
	তথ্যপঞ্জি	:	১১০-১১২
পঞ্চম অধ্যায়	***বেদমীমাংসা* ও *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থে নির্বচন**	**:**	**১১৩-১৪৩**
৫.০.	ভূমিকা	:	১১৩
৫.১.	গ্রন্থপরিচয়	:	১১৩
৫.১.১.	*বেদমীমাংসা* গ্রন্থে নির্বচন	:	১১৩-১২৩
৫.১.২.	উপসংহার	:	১২৩-১২৪
৫.২.	*সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থে নির্বচন	:	১২৪
৫.২.১.	গ্রন্থকার ও তাঁর সাহিত্যচর্চা	:	১২৪
৫.২.১.১.	*সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থের বিষয়বস্তু	:	১২৪-১২৫
৫.২.১.২.	নির্বচন-বিমর্শ	:	১২৫-১৪০
৫.২.১.৩.	উপসংহার	:	১৪০
	তথ্যপঞ্জি	:	১৪০-১৪৩
ষষ্ঠ অধ্যায়	**নির্বাচিত বৈদিক গ্রন্থসমূহে ও মহাভারতে প্রাপ্ত কতিপয় দেববাচক শব্দের তুলনাত্মক আলোচনা**	**:**	**১৪৪-১৬৬**
৬.০.	ভূমিকা	:	১৪৪

৬.১.	অগ্নি	:	১৪৪
৬.১.১.	অগ্নি শব্দের নির্বচনসমূহ ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা	:	১৪৪-১৪৭
৬.১.২.	নির্বচনগুলির তুলনা	:	১৪৮
৬.২.	আদিত্য	:	১৪৮-১৪৯
৬.২.১.	আদিত্য শব্দের নির্বচনসমূহ ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা	:	১৪৯-১৫০
৬.২.২.	নির্বচনগুলির তুলনা	:	১৫০-১৫১
৬.৩.	জাতবেদা	:	১৫১
৬.৩.১.	জাতবেদা শব্দের নির্বচনসমূহ ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা	:	১৫১-১৫৩
৬.৩.২.	নির্বচনগুলির তুলনা	:	১৫৩
৬.৪.	রুদ্র	:	১৫৩-১৫৪
৬.৪.১.	রুদ্র শব্দের নির্বচনসমূহ ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা	:	১৫৪-১৫৫
৬.৪.২.	নির্বচনগুলির তুলনা	:	১৫৫-১৫৬
৬.৫.	বরুণ	:	১৫৬
৬.৫.১.	বরুণ শব্দের নির্বচনসমূহ ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা	:	১৫৬-১৫৭
৬.৫.২.	নির্বচনগুলির তুলনা	:	১৫৭
৬.৬.	বিষ্ণু	:	১৫৭-১৫৮
৬.৬.১.	বিষ্ণু শব্দের নির্বচনসমূহ ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা	:	১৫৮-১৬১
৬.৬.২.	নির্বচনগুলির তুলনা	:	১৬১-১৬২
৬.৭.	হিরণ্যগর্ভ	:	১৬২
৬.৭.১.	হিরণ্যগর্ভ শব্দের নির্বচনসমূহ ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা	:	১৬২-১৬৩
৬.৭.২.	নির্বচনগুলির তুলনা	:	১৬৩-১৬৪
৬.৮.	উপসংহার	:	১৬৪
	তথ্যপঞ্জি	:	১৬৪-১৬৬
সপ্তম অধ্যায়	**উপসংহার**	**:**	**১৬৭-১৬৯**
পরিশিষ্ট		**:**	**১৭০-১৭৩**
Select Bibliography		**:**	**১৭৪-১৭৭**

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

১.০. প্রাক্‌কথন

বৈদিক সংহিতার অন্তর্গত ব্রাহ্মণসাহিত্যে বিবিধ মন্ত্রব্যাখ্যা এবং যাগযজ্ঞ বিষয়ে বর্ণনায় মাঝে মধ্যেই 'নির্বক্তি', 'নিরুক্তি', 'নির্বচন', 'ব্যুৎপত্তি' প্রভৃতি অভিধায় প্রযুক্ত হয়ে প্রাসঙ্গিক নানা শব্দের নির্বচন করা হয়েছে। এমনকী 'পূর্ব মীমাংসা' সূত্রের ভাষ্যকার শবরস্বামী ব্রাহ্মণ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের যে তালিকা প্রদর্শন করেছেন, সেখানেও 'নির্বচন' দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে কিন্তু এই নির্বচনগুলির উদ্দেশ্য কী, কোন বিশেষ নিয়ম বা পদ্ধতি অনুসারে এগুলির প্রণয়ন হয়েছে- সেই বিষয়ে সংহিতাত্মক ব্রাহ্মণ সাহিত্যে স্পষ্ট কোনও রূপরেখা পাওয়া যায়না। আবার পরবর্তীকালে বেদাঙ্গরূপে প্রাপ্ত *নিরুক্ত* নামে একটি নির্বচন শাস্ত্রও প্রণীত হয়। নিরুক্তকার আচার্য যাস্ক সেই গ্রন্থে তিনটি নির্বচন-পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন। এই নির্বচন শুধু বেদ-বেদাঙ্গেই সীমাবদ্ধ নেই, তারও অনেক পরে বিভিন্ন বেদ বিষয়ক গ্রন্থে এবং লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যেও তার প্রবহমানতা লক্ষ্য করা যায়। অতএব বর্তমান শোধপত্রের মূল লক্ষ্য- ব্রাহ্মণ এবং উত্তরবর্তী সাহিত্যে প্রাপ্ত নির্বচনগুলির অর্থ বিশ্লেষণপূর্বক নির্বচনকৃত শব্দটির উৎস অনুসন্ধান করা এবং যাস্কাচার্যের নির্বচনপদ্ধতি অনুযায়ী নিরুক্তিগুলি পর্যালোচনা করা এবং সুদূর বৈদিক সাহিত্যে প্রাপ্ত নির্বচন ধারা লৌকিকসাহিত্যে অবিকৃতভাবেই ধরা দিয়েছে নাকি অর্বাচীনের স্পর্শে বিকৃত রূপ প্রাপ্ত হয়েছে, সেই বিষয়েও আলোকপাত করা।

১.১. শোধনিবন্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

শোধপত্রের আকর গ্রন্থ হিসাবে সামবেদসংহিতার অন্তর্গত *তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ, জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ, জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ, কেনোপনিষদ্* ও *ছান্দোগ্যোপনিষদ্-* এই পাঁচটি গ্রন্থ নির্বাচিত হয়েছে। সামবেদীয় ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির মধ্যে নির্বাচিত গ্রন্থগুলি পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং একে অপরের পরিপূরক। তাই গ্রন্থগুলি আলোচনার আশ্রয়রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও যাস্কাচার্য দ্বারা উক্ত নির্বচনের সাথে বৈদিক নির্বচনের তুলনার জন্য নিরুক্ত নামক গ্রন্থটিও গৃহীত হয়েছে। বেদ অবলম্বনে রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে শৌনকাচার্য বিরচিত *বৃহদ্দেবতা,* দয়ানন্দ সরস্বতী মহোদয়ের *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থ, শ্রীমৎ অনির্বাণের *বেদমীমাংসা* গ্রন্থ নির্বাচন করা হয়েছে। *নিরুক্তের* দেবতাধ্যায়ে যেমন বৈদিক দেবতা বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন দেববাচক শব্দের নির্বচন করা হয়েছে তেমনি *বৃহদ্দেবতা* নামক বেদ বিষয়ক প্রকরণগ্রন্থেও অগ্নি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার একাধিক নামান্তর নির্বচনসহ আলোচিত হয়েছে। সেইজন্য বিষয়বস্তুগত দিক থেকে নিরুক্তের সাথে সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকায় গ্রন্থটি আলোচ্য শোধপত্রে স্থান পেয়েছে। দয়ানন্দ সরস্বতী এবং শ্রীমৎ অনির্বাণ বেদব্যাখ্যায় নতুন দিগ্-দর্শন করিয়েছেন। তাঁদের অবদানস্বরূপ গ্রন্থদুটিতে বিভিন্ন শব্দের নির্বচন উল্লিখিত হয়েছে। তাই এগুলি আলোচনার আকর হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। লৌকিক সাহিত্যের এক মহামূল্যবান সাহিত্যসম্ভার হল মহর্ষি ব্যাসদেব প্রণীত *মহাভারত*। অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত মহাকাব্যটির অন্তর্গত উদ্যোগপর্ব এবং শান্তিপর্বে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন নামের নির্বচন দেখা যায়, সেগুলি আলোচ্য শোধপত্রের বিষয়বস্তু।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আচার্য যাস্ক *নিরুক্ত* গ্রন্থে যে নির্বচন-সিদ্ধান্ত বা নির্বচন-ধারার কথা বলেছেন, তদনুসারে সামবেদসংহিতার অন্তর্গত নির্বাচিত ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে প্রাপ্ত নির্বচনগুলির শব্দার্থ বিশ্লেষণপূর্বক পদ্ধতি নিরূপণের প্রচেষ্টা করা হবে।

তৃতীয়-অধ্যায়ে *সামবেদসংহিতার* অন্তর্গত নির্বাচিত ব্রাহ্মণগ্রন্থ যথা- *তাণ্ডমহাব্রাহ্মণ, জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ, জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ও কেনোপনিষদ্* নামক বৈদিক গ্রন্থগুলিতে নির্বচনকৃত শব্দগুলি সম্পর্কে যাস্কাচার্য কী নিরুক্তি প্রদর্শন করেছেন, তা উল্লেখ ও অর্থনির্ণয়পূর্বক শব্দগুলির উৎস সন্ধান করতে চাই এবং সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণগুলিতে সেই একই শব্দের নির্বচনগুলিতে প্রাপ্ত ধাতু-প্রত্যয়গত বিশ্লেষণ উল্লেখ করে তুলনাত্মক বিবরণ প্রস্তুত করাও অপর এক লক্ষ্য।

চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনার দুই আকর গ্রন্থ হল শৌনকাচার্য বিরচিত *বৃহদ্দেবতা* নামক ঋগ্বেদীয় বৈদিক দেবতার বর্ণনাশ্রিত গ্রন্থ এবং মহর্ষি ব্যাসদেব রচিত *মহাভারত। বৃহদ্দেবতায়* বিদ্যমান বৈদিকদেববাচক শব্দগুলির নির্বচনসমূহ অর্থনির্ণয় ও বিশ্লেষণসহ উৎসসন্ধান প্রথম লক্ষ্য। দ্বিতীয়ত *মহাভারতের* উদ্যোগ এবং শান্তিপর্বে প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ নামের নির্বচনগুলি যাস্কাচার্যের নির্বচনসিদ্ধান্তত্রয় অনুসারে পর্যালোচনা করা। বৈদিক নির্বচন লৌকিক সাহিত্যের অঙ্গ হয়েও যাস্কের তিনটি নির্বচন সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিংবা শুধু ব্যাকরণকেই প্রাধান্য প্রদান করে বর্ণিত হয়েছে- সেই বিষয়ে আলোকপাত করা হবে।

পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনার মূল দুই ভিত্তি হল *বেদমীমাংসা* ও *সত্যার্থপ্রকাশ*। *বেদমীমাংসা* গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে বঙ্গভাষায় রচিত দেববাচক শব্দের নির্বচনগুলি অন্তর্গত শব্দসমূহের সাথে সম্পর্কিত সংস্কৃত শব্দ তথা ক্রিয়াপদগুলির সংস্কৃত রূপ বা ধাতুর অনুসন্ধান করে সামগ্রিকভাবে শব্দটির ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে বর্ণনা মূল বিবেচ্য। এছাড়াও *সত্যার্থপ্রকাশ* নামক গ্রন্থের প্রথম সমুল্লাসে ব্যাখ্যাত ঈশ্বরের একশত নামের মধ্যে পঞ্চাশটি নাম ব্যাকরণ ও ধ্বনিতাত্ত্বিক উভয় পদ্ধতি অনুসারে ব্যাখ্যা প্রদান কর্মে রত থাকব।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রধান আলোচ্য বিষয়- *ছান্দোগ্যোপনিষদ্, নিরুক্ত, বৃহদ্দেবতা, মহাভারত, ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা ও সত্যার্থপ্রকাশ* -এই গ্রন্থগুলিতে একাধিক দেববাচক শব্দ যেমন - 'অগ্নি', 'আদিত্য', 'জাতবেদাঃ', 'রুদ্র', 'বরুণ', 'বিষ্ণু' ও 'হিরণ্যগর্ভ' এই সাতটি শব্দের নির্বচনগুলির সম্পূর্ণ বিবরণ প্রদান করে তুলনাত্মক আলোচনার দ্বারা নির্বচনকৃত শব্দগুলির অর্থগত ও পদ্ধতিগত সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য নিরূপণ।

সপ্তম অধ্যায়ে উপসংহার অংশে প্রত্যেকটি অধ্যায়ের বিচার-বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলি ক্রমানুসারে বর্ণিত হবে।

অবশেষে পরিশিষ্ট নামক অংশে একবিংশ শতকের কয়েকজন বেদগবেষকের প্রবন্ধে প্রদর্শিত নির্বচনভাবনার নাতিদীর্ঘ উপস্থাপনা লক্ষিত হবে।

১.২. নির্বচনের ইতিবৃত্ত

'নির্বচন' সম্পর্কে যথাসম্ভব আলোচনার দ্বারা নির্বচন কী, এর নামান্তর, 'নির্বচন' শব্দের উৎপত্তির ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হল-

বেদ বা অপৌরুষেয় জ্ঞানরাশিস্বরূপ বৈদিক-সাহিত্য ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানরূপী গঙ্গার অজস্র প্রবাহের মূল স্রোত হিমালয়ের হিমরাশি সদৃশ। বৈদিক ঋষিরা এই অখণ্ড জ্ঞানরাশিকে উপলব্ধি ও আত্মস্থ করে ব্যাখ্যাগ্রন্থরূপে ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি রচনা করেন। আরণ্যক উপনিষদ্ এরই অন্তর্গত। বৈদিক আর্ষ-পরম্পরা লোপ হওয়ার পর মন্ত্রার্থ বোধের দিশায় নানাবিধ প্রক্রিয়ার উন্মোচন ঘটে, সেই সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে 'নির্বচন' বা 'নৈরুক্তিক প্রক্রিয়ার' এক বিশেষ স্থান বিদ্যমান। সংহিতায় যে পদ্ধতির বীজ বপন করা হয়েছে তা যুগ যুগান্ত ধরে প্রবহমান ধারায় অব্যাহত থেকে অদ্যাবধি বৈদিক, লৌকিক উভয় সাহিত্যের কাণ্ডারীদের ইষ্ট অর্থ প্রাপ্তির দিশা হিসাবে বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। ব্যাকরণ প্রক্রিয়া যেমন প্রকৃতি-প্রত্যয় বিশ্লেষণ পূর্বক শব্দের

উৎস সন্ধান ও অর্থ নির্ণয় করে। নির্বচন বা নির্বচনপদ্ধতিও শব্দের অর্থ প্রকাশের সাথে সেই শব্দোৎপত্তির ইতিহাস সম্পর্কে পাঠকদের অবগত করে।

১.২.১. নির্বচন ও তার প্রতিশব্দসমূহ

'নির্বচন' শব্দটি 'নির্'-এই উপসর্গ পূর্বক √বচ্-ধাতুর উত্তর 'ল্যুট্' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নিষ্পন্ন, যার অর্থ মন্ত্র বা দেবতা বিষয়ক শব্দ সম্পর্কে নিশ্চিত বা নিঃশেষ বা সম্পূর্ণ বচন। যে পদ্ধতিতে শব্দের অর্থ, উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পূর্ণরূপে উক্ত হয়, তাকে নির্বচন বলা হয়। *শব্দকল্পদ্রুম* গ্রন্থে 'নির্বচন' শব্দের অর্থ করা হয়েছে- নিরুক্তি, 'নিশ্চয় কথন', 'প্রশংসা' 'নির্গতবচনং যত্র' ইত্যাদি। যাস্কাচার্য বিরচিত *নিরুক্ত* গ্রন্থের বৃত্তিকার দুর্গাচার্য 'নির্বচন' শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন-

> অপিহিতস্যার্থস্য পরোক্ষবৃত্তাবতিপরোক্ষবৃত্তৌ বা শব্দে নিষ্কৃষ্য বিগৃহ্য বচনং নির্বচনম্।[১]

অর্থাৎ তাঁর মতানুসারে পরোক্ষবৃত্তি বা অতিপরোক্ষবৃত্তি শব্দের মধ্যে নিহিত বা লুকিয়ে থাকা অর্থকে নিষ্কাসিত করে তৎসম্পর্কিত ব্যুৎপত্তিপরক বচন বা নির্দেশকেই 'নির্বচন' বলা হয়। এটি নির্বচন সংজ্ঞার যৌগিক অর্থ। নির্বচন সংজ্ঞাটি এই পদ্ধতির জ্ঞাপক শাস্ত্রার্থেও রূঢ় বা প্রসিদ্ধ। অতএব পদের মধ্যে নিহিত অর্থের প্রকাশক ব্যুৎপত্তিগত নির্দেশ যে শাস্ত্রে করা হয়েছে, তাকে নির্বচন(শাস্ত্র) বলা হয়। এটি নির্বচন সংজ্ঞার যোগরূঢ় অর্থ। পরবর্তীকালে *অর্থশাস্ত্র*-কার কৌটিল্যাচার্যও 'নির্বচন'-এর লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

> গুণতঃ শব্দনিষ্পত্তির্নির্বচনম্।[২]

যদিও প্র. শিবনারায়ণ শাস্ত্রী 'নির্বচন' সংজ্ঞার পদ-পদার্থ-বিশ্লেষণরূপ বচন অর্থাত যৌগিক অর্থে প্রয়োগের প্রমাণ রূপে *দেবতাধ্যায়ব্রাহ্মণের* অন্তর্গত গায়ত্রী, উষ্ণিক প্রভৃতি শব্দের নির্বচনের উল্লেখ করলেও রূঢ়ার্থে অর্থাৎ পদ্ধতির জ্ঞাপক শাস্ত্রার্থে প্রয়োগের কোন প্রমান দেননি। অতএব বলা যায়, 'নির্বচন' শব্দের অর্থ 'নিরুক্তি' অথবা 'বিগ্রহ', যেকোন শব্দের অঙ্গ-উপাঙ্গ বিশ্লেষণ করে তার ব্যুৎপত্তি তথা মূলার্থবোধ (অথবা নিরুক্তি করার) এর প্রক্রিয়া অথবা পদ্ধতির নাম 'নির্বচন'।

নিরুক্তি

'নির্বচন' শব্দের একটি প্রতিশব্দ হল 'নিরুক্তি'। এই শব্দটি 'নির্' উপসর্গ পূর্বক √বচ্-ধাতুর উত্তর 'ক্তিন্' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নিষ্পন্ন, যার অর্থ 'নিশ্চিত বা নিঃশেষ উক্তি'। *বাচস্পত্যম্* অনুসারে কোন নির্বচনে প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি অবয়বার্থের উল্লেখের দ্বারা সমুচিত অর্থের বোধ হওয়াকেই 'নিরুক্তি' বলা হয়েছে। অতএব 'নিরুক্তি' শব্দের অর্থ 'ব্যুৎপত্তি'। কোন শব্দের ব্যাকরণগত ও ঐতিহাসিক বিকাশ সেই শব্দের নিরুক্তিরই অন্তর্গত। 'নিরুক্তি' শব্দের এই অর্থকে আধার করেই অলঙ্কারশাস্ত্রে 'নিরুক্তি' নামক একটি অলঙ্কারের নামকরণও করা হয়েছে।

নিরুক্ত

এটিও নির্বচন শব্দের একটি পর্যায়বাচী শব্দ। নিরুক্ত শব্দটি নির্ পূর্বক বচ্-ধাতুর সাথে ক্ত-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে উৎপন্ন হয়েছে। *শব্দকল্পদ্রুম* অনুসারে- "নির্নিশ্চযেন উক্তম্"[৩] অর্থাৎ নিশিতরূপে যা উক্ত হয়েছে। এছাড়াও অমরকোষের টীকায় বলা হয়েছে- "বর্ণাগমো বর্ণবিপর্যযশ্চ ইত্যাদিনা নিশ্চযেনোক্তং নিরুক্তম্"।[৪] হেমচন্দ্র পদবিভাজনকে 'নিরুক্ত' বলেছেন। বাচস্পত্যম্ অনুসারে অর্থকে সম্যকরূপে জ্ঞাপনের জন্য পদের বিভাগকরণকেই 'নিরুক্ত' বলা হয়। *Encyclopedia Britannica* গ্রন্থের ষষ্ঠ খন্ডে শব্দের উৎপত্তি এবং

অর্থের অনুসন্ধানকেই 'নিরুক্ত' বলা হয়েছে অর্থাৎ শব্দের মূল অর্থে পৌঁছানোর মাধ্যম বা পদ্ধতিই হল 'নিরুক্ত'।

ছান্দোগ্যোপনিষদে (৭/১/২) দেববিদ্যার খ্যাপক ভাষ্যরূপ শাস্ত্রার্থে আচার্য শঙ্কর 'নিরুক্ত' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন।

এছাড়াও *ঋগ্বেদভাষ্যভূমিকায়* সায়ণাচার্য বলেছেন-

> অর্থাববোধে নিরপেক্ষতযা পদজাতং যত্রোক্তং তন্নিরুক্তম্...তস্মিন্ গ্রন্থে পদার্থাববোধায পরাপেক্ষা ন বিদ্যতে...তদেতন্নিরুক্তং ত্রিকাণ্ডং ইতি।[৫]

অর্থাৎ শব্দের অর্থবোধের জন্য পদসমূহ যেখানে নিরপেক্ষভাবে উক্ত হয়, সেটি 'নিরুক্ত'। সেই গ্রন্থে অন্য গ্রন্থের সহায়তা ব্যতিরেকেই শব্দের অর্থ নির্ণয় করা হয়েছে। এই 'নিরুক্ত' গ্রন্থটি ত্রিকাণ্ডাত্মক। 'নিরুক্ত' সংজ্ঞাটি এখানে নিরুক্ত বা নির্বচনপদ্ধতির বোধক শাস্ত্রার্থে প্রযুক্ত হয়েছে।

অতএব এটা স্পষ্ট যে, পূর্বে 'নিরুক্ত' শব্দটি বেদবিদ্যার খ্যাপক শাস্ত্রার্থে এবং পদ-পদার্থ-বিশ্লেষণকারক বচন অর্থে প্রযুক্ত হত। পরবর্তীকালে এই সংজ্ঞার যৌগিক অর্থের বিস্তার ঘটে পদ-পদার্থ-বিশ্লেষক শাস্ত্রার্থেই রূঢ় বা প্রসিদ্ধ হয়।

এটিমোলোজী (Etymology)

নির্বচন শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'এটিমোলোজী' (Etymology)। 'এটুমন্' (Etumon) ও 'লোগোস্' (Logos) শব্দ দুটি যুক্ত হয়ে 'এটিমোলোজী' (Etymology) শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে, যেটি প্রাচীন গ্রীক শব্দ 'এটুমোলোজিযা' (Etumologia) থেকে এসেছে। 'এটুমন্' শব্দের অর্থ 'যথার্থ জ্ঞান' (Literal sense of a word) এবং 'লোগোস্' শব্দের অর্থ 'শব্দ' (Word), 'বর্ণনা' (Exaplation)। *কার্লস এন্সাইক্লোপীডিয়া* অনুসারে 'এটিমোলোজি' শব্দের অর্থ "The Science of Truth"[৬]

দি আক্সফোর্ড ডিক্সনরী আফ ইংলিশ এটিমোলোজি (The Oxford Dictionary of English Etymology) তে বলা হয়েছে এটিমোলোজীতে শব্দের উৎপত্তি ও বিকাশ এর অধ্যয়ন করা হয়- "the origin, formation and development (of a word)"।[৭]

অতএব বলা যায় 'নির্বচন' অথবা 'নিরুক্তি' অথবা 'নিরুক্ত' অথবা 'ব্যুৎপত্তি' অথবা 'এটিমালজী' (Etymology) এই শব্দগুলি একটি পদ্ধতিরই নামান্তর এবং শব্দের অর্থকে স্পষ্ট রূপে প্রকাশ করাই এদের বিশেষ উদ্দেশ্য।

১.২.২. নির্বচন শব্দের উৎপত্তি ও প্রয়োগের ক্রমপর্যায়

'নির্বচন' শব্দটি 'নির্' এই উপসর্গ পূর্বক √বচ্-ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। এটি একটি পদ-পদার্থ বিশ্লেষক পদ্ধতির বোধক। এই শব্দটি বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রূপে প্রযুক্ত হয়েছে। প্রয়োগের ঐতিহাসিক ক্রমানুসারে নির্বচন শব্দটির বিকাশের ধারা নিম্নরূপ-

ঋগ্বেদসংহিতায় 'নিরুক্ত' বা 'নির্বচন' শব্দটি সাক্ষাতভাবে প্রযুক্ত হয়নি, তবে একাধিক অংশে 'নিবচন' (নি+√বচ্) পদের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, যার অর্থ 'নিয়মিত বা সংযমিত বচন বা উক্তি'।

অথর্ববেদসংহিতায় 'নিরবোচম্' ক্রিয়াপদ এর প্রয়োগ দেখা যায়, যেমন-

> যক্ষ্মণাং সর্বেষাং বিষং নিরবোচম্ অহং ত্বত্।[৮]

অর্থাৎ যক্ষ্ম রোগের সকল প্রকার বিষ সম্বন্ধে তোমাকে বলেছি। অতএব 'বলা হয়েছে' -এই অর্থে এখানে 'নিরবোচম্' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

দেবতাধ্যায়ব্রাহ্মণের তৃতীয় খণ্ডে প্রথমেই "অথাতো নির্বচনম্"[৯] এইরূপে 'নির্বচন' শব্দটি অবিকৃতভাবে উল্লেখিত হয়েছে। সেই সঙ্গে পরবর্তী মন্ত্রগুলিতে গায়ত্রী, উষ্ণিক প্রভৃতি মন্ত্রের নির্বচনও করা হয়েছে।

পূর্বমীমাংসা দর্শনের ভাষ্যকার শবরস্বামী তার রচিত *শাবরভাষ্যে* ব্রাহ্মণের যে দশটি আলোচ্য বিষয়ের কথা বলেছেন সেখানে 'নির্বচন' শব্দটি দ্বিতীয় স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। অতএব 'নির্বচন' এই শব্দের বিকাশের পর্যায়ক্রমটি হল-

নিবচনম্ > নিরবোচম্ > নির্বচনম্।

১.২.৩. নিরুক্ত শব্দের প্রয়োগ বৈচিত্র

'নিরুক্ত' শব্দটি শুধুমাত্র নির্বচন প্রতিশব্দ নয়, এই শব্দের প্রয়োগক্ষেত্র ব্যাপক। নিরুক্ত শব্দটি কোথাও স্পষ্ট উচ্চারণ অর্থে কোথাও বা বেদের উপকারক বেদাঙ্গ অর্থাত নির্বচন শাস্ত্রার্থেও প্রযুক্ত হয়েছে। সেগুলি যথা-

কৃষ্ণযজুর্বেদের কাঠকসংহিতায় দেবতা বা সামের বিশেষণ হিসাবে 'নিরুক্ত' শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়-

তদ্বৈ দেবানাং ব্রহ্মা নিরুক্তং যচ্চতুর্হোতাস্তদেনং নিরুচ্যমানং প্রকাশং গময়তি।[১০]

এখানে 'নিরুক্ত' শব্দটি 'নির্বচন' বা 'ব্যুৎপত্তি' অর্থে প্রযুক্ত না হলেও 'বলা হয়েছে' বা 'ব্যাখ্যা করা হয়েছে'- এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

শাঙ্খায়নব্রাহ্মণের একাধিক স্থানে 'নিরুক্ত' শব্দটি ক্রিয়াপদ রূপে 'পূর্ণরূপে উক্ত হয়েছে'- এই অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে, যেটি নিরুক্ত শব্দের মূল অর্থ বা যৌগিকার্থ। যেমন প্রবর্গ্য মহাবীরের মহত্ত্ব বর্ণনাকালে বলা হয়েছে-

ইমে প্রাণা উচ্চৈর্নিরুক্তমভিষ্টুযাৎপ্রাণা বৈ স্তুভো নিরুক্তো হ্যেষঃ।[১১]

মন্ত্রটির অর্থ হল-

এই প্রাণসমূহকে উচ্চস্বরে ও 'স্পষ্ট রূপে' (শ্রাব্য) স্তুতি করতে হবে, এই স্তুতিই প্রাণস্বরূপ যেহেতু এটি 'প্রকট' (প্রকাশিত) হয়।

অথ যদুচ্চৈঃ সোমস্য যজতি চন্দ্রমা বৈ সোমো নিরুক্তো বৈ চন্দ্রমাস্তস্য ন পরস্তাত্ পর্যজেদিত্যাহুঃ।[১২]

উচ্চৈর্নিরুক্তমনুব্রূযাত্...যন্নিরুক্তম্, তস্মান্নিরুক্তমনুব্রূযাদ্...।[১৩]

এখানেও নিরুক্ত শব্দটি উচ্চারণের স্পষ্টতা বা স্পষ্ট উচ্চারণ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে।

সামবেদের অন্তর্গত *ছান্দোগ্যোপনিষদে* একাধিক স্থানে নিরুক্ত শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে, যেমন-

উদ্গীথোঽনিরুক্তঃ প্রজাপতের্নিরুক্তঃ সোমযস্য।[১৪]

এখানে 'নিরুক্ত' ও 'অনিরুক্ত' উভয় শব্দই স্পষ্টার্থে ও অস্পষ্টার্থে সামগানের বিশ্লেষণ রূপে উপলব্ধ হয়।

এছাড়াও *ছান্দোগ্যোপনিষদে* 'হৃদয়' শব্দের নির্বচনকালে 'নিরুক্ত' শব্দটি নির্বচন (নিরুক্তি) অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে-

স বা এষ আত্মা হৃদি তস্যৈতদেব নিরুক্তং হৃদ্যমিতি। তস্মাদ্ধৃদযম্।[১৫]

তৈত্তিরীয়োপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীতেও সৃষ্ট কার্য মধ্যে ব্রহ্মের অনুপ্রবেশ বর্ণনাকালে 'নিরুক্ত' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, সেটি হল- "নিরুক্তং চানিরুক্তঞ্চ"।[১৬] পারমার্থিক সত্য স্বরূপ ব্রহ্ম কার্যমধ্যে প্রবেশ করে দেশকালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন অর্থাত নির্বচনীয় ও অনির্বচনীয় হয়েছেন।

মুণ্ডকোপনিষদে যে ছয়টি বেদাঙ্গের নামোল্লেখ পাওয়া যায়, সেখানে 'নিরুক্ত' শব্দটি চতুর্থ বেদাঙ্গের স্থান প্রাপ্ত হয়েছে-

> ...শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষামিতি।[১৭]

অতএব *মুণ্ডকোপনিষদেও* নিরুক্ত শব্দটি রূঢার্থে অর্থাত শাস্ত্রার্থে প্রযুক্ত হয়েছে।

আচার্য ভরত তার *নাট্যশাস্ত্রে* রসাদির উৎপাদক ভাবাদির সঠিক অববোধের জন্য নিরুক্তের উল্লেখ করেছেন-

> ভাবাশ্চৈব কথং প্রোক্তাঃ কিং বা তে ভাবযন্ত্যপি।
> সংগ্রহং কারিকাং চৈব নিরুক্তং চৈব তত্ত্বতঃ।।[১৮]

এখানে নিরুক্ত এর লক্ষণ ও করা হয়েছে-

> নানানামাশ্রয়োৎপন্নং নিঘণ্টুনিগমান্বিতম্।
> ধাত্বর্থহেতুসংযুক্তং নানাসিদ্ধান্তসাধিতম্।।
> স্থাপিতোঽর্থো ভবেদ্যত্র সমাসেনার্থসূচকঃ।
> ধাত্বর্থবচনেনেহং নিরুক্তং তৎপ্রচক্ষতে।।[১৯]

এছাড়াও যাস্ক বিরচিত *নিরুক্ত* গ্রন্থের বৃত্তিকার দুর্গাচার্য নিরুক্তের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

> বর্ণাগম বর্ণবিপর্যযশ্চ দ্বৌ চাপরৌ বর্ণবিকারনাশৌ।
> ধাতোস্তদর্থাতিশযেন যোগস্তদুচ্যতে পঞ্চবিধং নিরুক্তম্।।[২০]

অর্থাৎ বৃত্তিকার দুর্গাচার্য শব্দের নিরুক্ত বা নির্বচনের পাঁচটি উপায়ের কথা বলেছেন। শব্দের উৎপত্তি ও অর্থনির্ণয়ের জন্য 'বর্ণাগম'; যেকোন নতুন বর্ণের আগম, 'বর্ণ-বিপর্যয়'; শব্দস্থিত বর্ণসমূহের স্থান পরিবর্তন, 'বর্ণবিকার'; বর্ণের হ্রস্ব দীর্ঘাদি মাত্রা পরিবর্তন, 'বর্ণলোপ', আদি- মধ্য-অন্তস্থিত যেকোন বর্ণের লোপ ও অর্থানুসারে ধাতু থেকে শব্দের কল্পনারূপ উপায় বা পদ্ধতিই 'নিরুক্ত' অর্থাৎ 'নিরুক্ত' শব্দটি এখানে নির্বচন পদ্ধতির দ্যোতক।

১.২.৪. নৈরুক্ত প্রক্রিয়ার প্রাপ্ত গ্রন্থ

নিঘণ্টু তথা নিরুক্ত নামে পৃথকভাবে সংকলিত শাস্ত্রের মধ্যে নিরুক্ত শাস্ত্রের পরম্পরায় বর্তমানে পূর্ণতঃ প্রাপ্ত শাস্ত্র হল পঞ্চাধ্যায়াত্মক '*নিঘণ্টু*' তথা দ্বাদশাধ্যায়াত্মক '*নিরুক্ত*'। যদিও *কৌৎসব্য-নিরুক্ত-নিঘণ্টু* গ্রন্থ উপলব্ধ হলেও এর ব্যাখ্যাসমূহের অপ্রাপ্তি হেতু এটিকে অপূর্ণ বলে মানা হয়।

১.২.৫. পদের ত্রিধা বর্গীকরণ

পদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত উল্লেখ করাই নির্বচনশাস্ত্রের প্রয়োজন। সেইজন্য নির্বচনশাস্ত্রকারগণ পদকে তিনটি বর্গে বিভক্ত করেছেন- 'প্রত্যক্ষবৃত্তি', 'পরোক্ষবৃত্তি' ও 'অতিপরোক্ষবৃত্তি'।

পদের অর্থ বিষয়ক ব্যাপার যখন সহজেই প্রত্যক্ষ হয়, পদ স্বরূপগতভাবেই যে অর্থে প্রবৃত্ত হয়, তার হেতু বলে দেয় অর্থাৎ ধ্বনিসমুদায়াত্মক পদে এমন ধ্বনি সমূহ সাক্ষাৎভাবে দর্শিত হয়, যা অর্থের সাথে সম্বদ্ধ

যেকোনো ক্রিয়া অথবা অর্থনিষ্ঠ কোনো বিশেষতার বাচক ভাষিক অংশ হয়, তখন ওই পদটিকে 'প্রত্যক্ষবৃত্তি' পদ বলা হয়।

যখন পদের স্বরূপ যে অর্থে পদটি প্রযুক্ত হয়েছে, তার হেতুর সাক্ষাৎ নির্দেশক হয়না, এমনকি স্বরূপগতভাবেও কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে যেমন কোনো বর্ণ লোপ, বা কোনো বর্ণ আগম করে, বা কোনো বর্ণ বিকৃত করে (ই এর স্থানে য্) পদের মধ্যে অর্থের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিশেষ অবস্থার বাচক ভাষিক অংশ প্রকাশিত হয়, তখন ওই পদটিকে 'পরোক্ষবৃত্তি' পদ বলা হয়।

যখন কোনো পদের স্বরূপ থেকে কোনোভাবেই পদটি যে অর্থে প্রবৃত্ত হয়েছে তার হেতু বোঝা যায়না, এমনকি পদটিতে ব্যাকরণসম্মত বর্ণ পরিবর্তন করেও প্রবৃত্তির হেতু স্পষ্ট নয়, সেইসমস্ত পদকে 'অতিপরোক্ষবৃত্তি' পদ বলা হয়।

১.২.৬. যাস্কীয় নির্বচনপদ্ধতি

যাস্কাচার্য তাঁর *নিরুক্ত* গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৈদিক শব্দের নির্বচনের উপায় প্রসঙ্গে ত্রিবিধ মত পোষণ করেছেন, সেগুলি হল-

১. লক্ষণশাস্ত্রানুসারে নির্বচন।

২. লক্ষণশাস্ত্র ব্যতীত অর্থসামান্যের দ্বারা নির্বচন।

৩. লক্ষণশাস্ত্র ব্যতীত অক্ষরবর্ণসামান্যের দ্বারা নির্বচন।

১.২.৬.১ লক্ষণশাস্ত্রানুসারে নির্বচন

যাস্কাচার্য নির্বচনের উপায়স্বরূপ প্রথমেই বলেছেন-

> যেষু পদেষু স্বরসংস্কারৌ সমর্থৌ প্রাদেশিকেন গুণেনান্বিতৌ স্যাতাং তথা তানি নির্ব্রূযাত্।[২১]

অর্থাৎ যে সমস্ত পদে স্বর (উদাত্তাদি) ও সংস্কার (প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগে সাধন) লক্ষণশাস্ত্র অর্থাৎ ব্যাকরণশাস্ত্রানুগত নিয়মের অনুগামী, যাদের স্বর ও সংস্কার হতে ধাতু বা ক্রিয়ার উপলব্ধি হয়, সেই সমস্ত পদের নির্বচন সেইভাবেই অর্থাৎ ব্যাকরণশাস্ত্রের নিয়মানুসারেই করতে হবে। যদিও 'প্রাদেশিকেন গুণেন' এই স্থানে 'প্রাদেশিকেন বিকারেণ' এইরূপ পাঠও দেখা যায়, যেটি স্কন্দস্বামী দ্বারা অনুমোদিত। তিনি 'বিকার' শব্দের অর্থ করেছেন 'ক্রিয়া'। যে সমস্ত পদের উদাত্তাদি স্বর ও ব্যাকরণ পদ্ধতি অনুসারে পরিবর্তন অর্থের অনুকূল হয় এবং ধাতুর সমুচিত ধ্বনি পরিবর্তনের সাথে যুক্ত হয়, তাদের নির্বচন সেইভাবেই অর্থাৎ ব্যাকরণশাস্ত্রানুসারেই করতে হবে।

অর্থানুকূল ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তিবিশিষ্ট শব্দ 'প্রত্যক্ষবৃত্তি' শব্দ। 'প্রত্যক্ষবৃত্তি' শব্দের নির্বচন ব্যাকরণ পদ্ধতি অনুসারে করতে হবে। ব্যাকরণের সহজ সরল প্রয়োগ এই সমস্ত শব্দের অর্থের নির্বচন করতে সমর্থ হলে তাদের প্রত্যক্ষবৃত্তি নির্বচন বলা হয়। অতএব ব্যাকরণশাস্ত্রের সাথে নির্বচনশাস্ত্রের কোনো সম্পর্ক নেই, একথা বলা যায়না। স্বর-সংস্কার ব্যাকরণ শাস্ত্রে গৌণ হলেও স্বর ও সংস্কারের ধারণাই নির্বচনশাস্ত্রে প্রবেশের ভিত্তি তৈরি করে।

১.২.৬.২ লক্ষণশাস্ত্র ব্যতীত অর্থসামান্যের দ্বারা নির্বচন

এই নির্বচন প্রধানতঃ পরোক্ষবৃত্তি শব্দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই নির্বচন প্রসঙ্গে বলেছেন-

অথানন্বিতেঽর্থেঽপ্রাদেশিকে বিকারেঽর্থনিত্যঃ পরীক্ষেত কেনচিদ্ বৃত্তিসামান্যেন।[২২]

অর্থাৎ, শব্দ যখন অর্থের অনুগামী নয়, যখন ধাতু বা ক্রিয়া অর্থপ্রকাশক নয়, তখন অর্থে নিয়ত থেকে অর্থাৎ অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে কোনও বৃত্তি বা ভাবের সমানতা দ্বারা পরীক্ষা বা নির্বচন করতে হবে।

১.২.৬.৩ লক্ষণশাস্ত্র ব্যতীত অক্ষরবর্ণসামান্যের দ্বারা নির্বচন

'অতিপরোক্ষবৃত্তি' শব্দের নির্বচনের জন্য এই পদ্ধতি প্রযোজ্য। এটি হল-

অবিদ্যমানে সামান্যেঽপ্যক্ষরবর্ণসামান্যান্নির্ব্রূযান্নত্বেব ন নির্ব্রূযান্ন সংস্কারমাদ্রিয়েত।[২৩]

অর্থাৎ বৃত্তি বা ভাবের সমানতা না থাকলেও অক্ষর অর্থাৎ স্বর, বর্ণ অর্থাৎ ব্যঞ্জন এদের সমানতা ধরে নির্বচন করবে, কিন্তু নির্বচন যে করবেনা তা নয়, নির্বচন করবেই, ধাতু প্রত্যয় গত সাধন আদর করবেনা।

১.৩. বিবেচনা

অতএব 'নির্বচন' শব্দের উৎপত্তির প্রথম পর্যায় যেমন বৈদিক সংহিতায় লক্ষ্য করা যায় তেমনি নির্বচন বা নির্বচনপদ্ধতির আংশিক প্রয়োগও সংহিতাতেই বিদ্যমান। সশরীরে এবং স্বমহিমায় এর প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় ব্রাহ্মণ সাহিত্যে। তৎকালীন ও তৎপরবর্তী সাহিত্যে নির্বচন শব্দটি 'নিরুক্ত', 'নিরুক্তি', 'ব্যুৎপত্তি' ইত্যাদি প্রতিশব্দেও অভিহিত হয়। শুধু তাই নয়, এটির একটি ইংরেজি নামান্তরও দেওয়া হয়, সেটি হল এটিমলোজি (Etymology)। নিরুক্ত শব্দেরও প্রয়োগ বৈচিত্র্য কম না। কোথাও ক্রিয়াবিশেষণ, কোথাও বা নির্বচন অর্থে আবার কোথাও নিরুক্ত নামক স্বতন্ত্র নির্বচন শাস্ত্র হিসাবে প্রযুক্ত হয়েছে। অতএব এবিষয়ে নিশ্চিত যে, নিরুক্ত শব্দের প্রয়োগবৈচিত্র্যের মতোই একাধিক বৈদিক ও লৌকিক শব্দের বিবিধ অর্থের বাহক হিসাবে বিশ্লেষণ করাই নির্বচনের প্রধান ভূমিকা।

তথ্যপঞ্জি

[১] জ্ঞানপ্রকাশ শাস্ত্রী (সম্পা.), *নিরুক্তম্* ২/১, পৃষ্ঠাঙ্ক ৯১।

[২] মানবেন্দু বন্দোপাধ্যায় (সম্পা.), *কৌটিলীযম্ অর্থশাস্ত্রম্,* পৃষ্ঠা ৪২৯ ।

[৩] *শব্দকল্পদ্রুমঃ, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮৮৯।*

[৪] তত্রৈব।

[৫] শারদা চতুর্বেদী (সম্পা.), *ঋগ্বেদভাষ্যভূমিকা,* পৃষ্ঠাঙ্ক ১৯৯।

[৬] *কার্লস এন্সাইক্লোপীডিযা* (খণ্ড-৭), পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৬৩।

[৭] *The Oxford Dictionary of English Etymology,* পৃষ্ঠাঙ্ক ৩২৯।

[৮] *অথর্ববেদসংহিতা* ৯/৮/১০।

[৯] *দেবতাধ্যায়ব্রাহ্মণম্* ৩/১।

[১০] *কাঠকসংহিতা* ৯/১৬।

[১১] *শাঙ্খায়নব্রাহ্মণম্* ৮/৩।

[১২] *তদেব* ১৬/৫।

[১৩] *তদেব* ১১/১।

[১৪] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্* ২/২২/১।

[১৫] *তদেব* ৮/৩/৩।

[১৬] *তৈত্তিরীয়োপনিষদ্* ২/৬।

[১৭] *মুণ্ডকোপনিষদ্* ১/১/৫।

[১৮] *নাট্যশাস্ত্রম্* ৬/৩।

[১৯] *তদেব* ৬/১২-১৩।

[২০] *নিরুক্তম্* (দুর্গাচার্যবৃত্তিঃ) ২/২৬।

[২১] অমরেশ্বর ঠাকুর (সম্পা.) *নিরুক্তম্* ২/১/১/২, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৮২।

[২২] অমরেশ্বর ঠাকুর (সম্পা.) *নিরুক্তম্* ২/১/১/৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৮৩।

[২৩] অমরেশ্বর ঠাকুর (সম্পা.) *নিরুক্তম্* ২/১/১/৪, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৮৪।

***

দ্বিতীয় অধ্যায়

নির্বাচিত সামবেদীয় ব্রাহ্মণসমূহে প্রাপ্ত নির্বচনপদ্ধতি

২.০. ভূমিকা

বেদজ্ঞান ছিল অখন্ড, সমগ্র। পরবর্তীসময়ে ভাসমান অমূল্য ভাবসম্পদকে সুনির্দিষ্টভাবে সংরক্ষণের চিন্তা যখন ঋষিদের মনে উদ্ভাসিত হয় তখন বিষয়বস্তু বা প্রকাশের মাধ্যম অনুযায়ী অখণ্ড বেদকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করে সংকলন করা হয়। প্রকাশমাধ্যম অনুযায়ী ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিনভাগে সাজানো হল। যেকারণে বেদের অপর নাম ত্রয়ী। এই ত্রয়ীর মধ্যে আমরা *ঋগ্বেদসংহিতা, সামবেদসংহিতা, যজুর্বেদসংহিতা* এবং *অথর্ববেদসংহিতা* এই চার সংহিতাকেই পাই। আবার বিষয়বস্তু অনুযায়ী মূলত মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মক বেদের বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে ব্রাহ্মণসাহিত্য। তাই ব্রাহ্মণসাহিত্যকেও পরবর্তীকালে শুদ্ধব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ এই তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। এই বিভাজনকে আরও সরলীকরণ করে বলা যায় যে, মন্ত্রের সংকলনই হল সংহিতা। মন্ত্রভাগের ব্যাখ্যা সহ যাগযজ্ঞের বিবরণ, বিবিধ উপাখ্যান প্রভৃতিতে সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণসাহিত্য। অতএব প্রত্যেক সংহিতার অন্তর্গত একাধিক ব্রাহ্মণগ্রন্থ বিদ্যমান। আবার কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই দুই ভাগেও বেদের বিভাজন করা হয়। সেক্ষেত্রে মন্ত্র বা সংহিতা এবং শুদ্ধব্রাহ্মণ হল কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত এবং আরণ্যক ও উপনিষদ্ হল জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত।

২.১. ব্রাহ্মণগ্রন্থের নামকরণ বিষয়ে বিবিধ মত

'ব্রাহ্মণ' শব্দটি 'ব্রহ্মন্' শব্দ থেকে এসেছে। পুংলিঙ্গ 'ব্রহ্মন্' শব্দের অর্থ সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি 'হিরণ্যগর্ভ'। ক্লীবলিঙ্গ 'ব্রহ্মন্' শব্দের দুটি অর্থ পাওয়া যায়। একটি হল 'পরব্রহ্ম', যে তত্ত্ব উপনিষদে প্রতিপাদিত হয়েছে, অপরটি হল 'মন্ত্র'।

গ্রন্থবাচক ব্রাহ্মণ শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ মন্ত্রার্থক 'ব্রহ্মন্' শব্দ থেকে উৎপন্ন অর্থাৎ যে গ্রন্থে সংহিতান্তর্গত মন্ত্রের ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেটিই ব্রাহ্মণগ্রন্থ নামে পরিচিত। *তৈত্তিরীয়সংহিতায়* বলা হয়েছে- ব্রাহ্মণং নাম কর্মণস্তন্মন্ত্রানাং চ ব্যাখ্যানগ্রন্থঃ।[১] গ্রন্থবাচক ব্রাহ্মণশব্দ নপুংসক লিঙ্গেই প্রয়োগ দেখা যায়। *মেদিনীকোষে* বলা হয়েছে- *ব্রাহ্মণং ব্রহ্মসংঘাতে বেদভাগ নপুংসকম্*।[২] *নিরুক্ত, শতপথব্রাহ্মণ, ঐতরেয়ব্রাহ্মণ, অষ্টাধ্যায়ী* প্রভৃতি গ্রন্থে 'ব্রাহ্মণ' শব্দটি গ্রন্থ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে।

'ব্রহ্মন্' শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতভেদ লক্ষ্য করা যায়, যেমন- কেউ কেউ বলেন 'ব্রহ্মন্' শব্দের অর্থ 'বেদ', বেদ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা সম্বন্ধিত বলেই 'ব্রাহ্মণ' এই নামকরণ। আচার্য যাস্ক 'ব্রহ্ম' বলতে কর্মকে বুঝিয়েছেন। শতপথব্রাহ্মণে 'ব্রহ্মন্' শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'ব্রাহ্মণ পুরোহিত'- "ব্রহ্ম বৈ ব্রাহ্মণঃ"।[৩] যজ্ঞে মন্ত্রের বিনিয়োগ বিধি স্পষ্ট করাই ব্রাহ্মণগ্রন্থের কাজ। দয়ানন্দ সরস্বতী সহমত পোষণ করে বলেছেন- "ব্রহ্মেতি ব্রাহ্মণানাং নামাস্তি"।[৪] মার্টিন হগ্ প্রভৃতি প্রাশ্চাত্ত্য বেদ-বিশেষজ্ঞের মতে 'ব্রহ্মন্' শব্দটি সকল পুরোহিত অর্থে না ধরে কেবল যজ্ঞের অধ্যক্ষ ও পুরোহিতগণের প্রধান 'ব্রহ্মা' নামক পুরোহিতের অনুশাসন বা উক্তিকে বুঝিয়েছেন।

২.২. ব্রাহ্মণগ্রন্থের লক্ষণসমূহ

ব্রাহ্মণগ্রন্থের লক্ষণ বিষয়ে প্রাচীন আচার্যরা বিবিধ মত পোষণ করেছেন। সূত্রকার আপস্তম্বের মতে- "কর্মচোদনা ব্রাহ্মণানি"[৫] অর্থাৎ কর্মের প্রতি প্রেরণাপ্রদানকারী (গ্রন্থগুলি) ব্রাহ্মণগ্রন্থ। পূর্বমীমাংসাকার জৈমিনি বলেছেন- "শেষে ব্রাহ্মণশব্দঃ"[৬] অর্থাৎ মন্ত্রব্রাহ্মনাত্মক বেদের মন্ত্র ব্যতিরিক্ত শেষ অংশই ব্রাহ্মণ। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির মতানুসারে ব্রাহ্মণের লক্ষণটি হল- "সমানার্থাবেতৌ ব্রহ্মন্ শব্দো ব্রাহ্মণশব্দশ্চ"।[৭] আচার্য দয়ানন্দ সরস্বতীর মতে- "চতুর্বেদবিদ্ভির্ব্রহ্মভির্ব্রাহ্মণৈর্মহর্ষিভিঃ প্রোক্তানি যানি বেদব্যাখ্যানানি তানি ব্রাহ্মণানি"।[৮] অর্থাৎ চতুর্বেদবিদ্ মহর্ষি ব্রাহ্মণগণের উক্ত বা কথিত বেদব্যাখ্যাই ব্রাহ্মণগ্রন্থ নামে পরিচিত।

২.৩. ব্রাহ্মণসাহিত্যের প্রতিপাদ্য বিষয়

ব্রাহ্মণগ্রন্থের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় যজ্ঞের বাস্তবিক স্বরূপ নিরূপণ, বিভিন্ন যজ্ঞের প্রয়োজন, যজ্ঞের রহস্য ও প্রতিকাত্মকতা প্রদর্শন। এই সমস্ত বিষয় প্রতিপাদনের জন্য বিধি ও অর্থবাদকে স্বীকার করা হয়েছে। তবুও ব্রাহ্মণের বিষয় রূপে এই দুই বিষয় ছাড়াও অন্য বিষয়ও আনুষঙ্গিক হিসাবে যজ্ঞিয় অনুষ্ঠান বিধির মধ্যে সমাবেশিত হয়েছে। শবরস্বামী তাঁর শবরভাষ্যে দশটি বিষয় উল্লেখ করেছেন, সেগুলি হল- হেতু, নির্বচন, নিন্দা, প্রশংসা, সংশয়, বিধি, পরকৃতি, পুরাকল্প, ব্যবধারণকল্পনা ও উপমান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করেছেন-

> হেতুর্নির্বচনং নিন্দা প্রশংসা সংশযো বিধি।
> পরক্রিযা পুরাকল্পো ব্যবধারণকল্পনা
> উপমানং দশৈতেতোবিধযো ব্রাহ্মণস্য তু।[৯]

উল্লিখিত দশটি বিষয়ের মধ্যে আপস্তম্ব মহাশয় ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তুর সুস্পষ্ট ধারণা জ্ঞাপক ছয়টি বিষয়ের অপর গুরুত্ব দিয়েছেন, সেগুলি হল- বিধি, অর্থবাদ, নিন্দা, প্রশংসা, পুরাকল্প ও পরকৃতি। বিশেষ বিশেষ কর্মানুষ্ঠানের নির্দেশ প্রদর্শন করে বিধিবাক্য। অপ্রবৃত্ত প্রবর্তন ও অজ্ঞাতার্থজ্ঞাপন এই দুটি বিষয় বিধির অন্তর্গত। বিধির অনুকরণ ও নিষেধের নিন্দা বাচক ব্যাখ্যামূলক আলোচনাই হল অর্থবাদ। নিন্দা হল বিরোধিমতের সমালোচনামূলক খণ্ডন। স্তুতির দ্বারা কোনো ক্রিয়ার অনুমোদনকে বলা হয় প্রশংসা। অতিপ্রাচীনকালে দেবতাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞসমূহের বিবরণ পুরাকল্প। বিশিষ্ট পুরোহিত বা রাজা কর্তৃক অসাধারণ কার্যাবলি হল পরকৃতি। যদিও এই ছয়টি বিষয় সম্পর্কে সকল আচার্য সহমত পোষণ করেননা। তাঁরা বিধি ও অর্থবাদকেই মূল বিষয় হিসাবে গ্রহণ করে নিন্দা, প্রশংসা, পরকৃতি ও পুরাকল্পকে অর্থবাদেরই প্রকারভেদ রূপে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন পূর্বমীমাংসাকার আচার্য জৈমিনি।

২.৪. আরণ্যক ও উপনিষদ্ রূপে ব্রাহ্মণের অন্তিম দুই অংশ

সংহিতার অন্তর্গত ব্রাহ্মণগুলির শেষ বা অন্তিমাংশকেই বলা হয় আরণ্যক, তবে সেটি কখন ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্তরূপে আবার কখনও বা পৃথকরূপেও বিদ্যমান। বিদ্যার দিক থেকে ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক পরিণতি আরণ্যকে এবং আরণ্যকের পরিণতি উপনিষদে। আরণ্যক এবং উপনিষদ্ দুটিই ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। ব্রাহ্মণে দ্রব্যযজ্ঞের বিধান আছে, আরণ্যকে তারই সূক্ষ্মভাবনা এবং উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞান আলোচিত হয়েছে।

২.৫. সামবেদীয় ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহ

সকল সংহিতাগ্রন্থের মধ্যে সামবেদের ব্রাহ্মণগ্রন্থ সর্বাধিক। সায়ণাচার্য *সামবিধানব্রাহ্মণের* ভাষ্যভূমিকায় সামবেদের আটটি ব্রাহ্মণের নাম উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল- *প্রৌঢ়* বা *পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ, ষড়্বিংশব্রাহ্মণ, সামবিধানব্রাহ্মণ, আর্ষেয়ব্রাহ্মণ, দৈবতব্রাহ্মণ, মন্ত্রব্রাহ্মণ, সংহিতোপনিষদ্ব্রাহ্মণ* এবং *বংশব্রাহ্মণ*। কুমারিলভট্ট

তাঁর '*তন্ত্রবার্তিক*' গ্রন্থে সামবেদের ব্রাহ্মণগ্রন্থের সংখ্যা আটটি বলেছেন। এই সংহিতার অন্তর্গত 'শাট্যায়ন' নামে আর একটি ব্রাহ্মণের উল্লেখ এবং তা থেকে উদ্ধৃতি সায়ণভাষ্যে পাওয়া যায় কিন্তু এর বাস্তবিক অস্তিত্ব এখনো পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত। সামবেদের জৈমিনীয় শাখার অন্তর্গত *জৈমিনীয় বা তলবকারব্রাহ্মণ* নামে আরও একটি ব্রাহ্মণগ্রন্থ বিদ্যমান। এই গ্রন্থটির সায়ণভাষ্য না পাওয়া গেলেও বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের বর্ণনার জন্য এটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও *জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ* নামেও আর একটি ব্রাহ্মণগ্রন্থ বর্তমানে উপলব্ধ। এটি জৈমিনীয়ব্রাহ্মণেরই শেষ চারটি অধ্যায় নিয়ত গঠিত। এটি *উপনিষদ্ব্রাহ্মণ* বা *তলবকার-উপনিষদ্ব্রাহ্মণ* নামেও পরিচিত। প্রসিদ্ধ *কেনোপনিষদ্ জৈমিনীয়ব্রাহ্মণে*রই অন্তিমাধ্যায়ে বিরাজিত। *মন্ত্র বা ছান্দোগ্যব্রাহ্মণে*র অন্তিম আটটি অধ্যায় সমন্বিত *ছান্দোগ্যোপনিষদ্*।

২.৫.১. সামবেদীয় নির্বাচিত ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহ এবং প্রতিপাদ্য বিষয়

সামবেদীয় ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে তিনটি অন্যতম ও উপলব্ধ শুদ্ধ ব্রাহ্মণ গ্রন্থ হল *প্রৌঢ় বা পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ, জৈমিনীয়* বা *তলবকারব্রাহ্মণ, জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ* এবং দুটি উপনিষদ্ হল *কেনোপনিষদ্* ও *ছান্দোগ্যোপনিষদ্*। ব্রাহ্মণসাহিত্যের অন্তর্গত এই গ্রন্থগুলি আলোচ্য শোধপ্রবন্ধের আকরস্বরূপ। এগুলি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল-

২.৫.১.১. *প্রৌঢ় বা পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ*

এই ব্রাহ্মণগ্রন্থটি সামবেদের অন্যান্য ব্রাহ্মণগুলির তুলনায় প্রাচীন। অতিবৃহৎ আকারের জন্য এটি *প্রৌঢ়ব্রাহ্মণ* নামে পরচিত। গ্রন্থটিতে পঞ্চবিংশতি সংখ্যক অধ্যায় থাকায় পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ নামেও প্রসিদ্ধ। *তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ* হিসাবেও এই গ্রন্থের সমধিক প্রসিদ্ধি রয়েছে। তাণ্ড্য ঋষি সংকলন করেছেন। গ্রন্থটি দুটি খণ্ডে বিন্যস্ত। বারটি অধ্যায়ে প্রথম খন্ড এবং অবশিষ্ট তেরটি অধ্যায় নিয়ে দ্বিতীয় খণ্ড।

এখানে অগ্নিষ্টোম, গবাময়ন প্রভৃতি সোমযাগের মধ্যে সারাবছর ধরে অনুষ্ঠিত যাগ সম্পর্কে ক্রমানুসারে উল্লেখ করা হয়েছে। যজুর্মন্ত্রের একটি সংহিতাস্বরূপ হল এই ব্রাহ্মণের প্রথম অধ্যায়টি। পরের দুটি অধ্যায়ে স্তোম রচনার প্রক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে। মহাব্রত, ত্রিবিৎ, ব্রহ্মসামবিধান প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। উদ্গাতৃগণের দিক থেকে অহীন, দ্বাদশাহ এবং সত্রের বিবরণ বর্তমান। সংবৎসরসাধ্য গবাময়নকে সমস্ত সত্রের প্রকৃতি বলা হয়েছে। সোম-প্রায়শ্চিত্তের বর্ণনা নবম অধ্যায়ে করা হয়েছে। ব্রাত্যদের বৈদিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে কৃত ব্রাত্যস্তোম নামক একাহ সোমযাগের বর্ণনা সপ্তদশ অধ্যায়ে লক্ষ্য করা যায় এবং সেখানে যথাক্রমে হীন, নিন্দিত, কনিষ্ঠ এবং জ্যেষ্ঠ ব্রাত্যদের জন্য চারটি ব্রাত্যস্তোম নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ব্রাত্যদের সম্পর্কে অল্পবিস্তর বর্ণানাও করা হয়েছে। *তাণ্ড্যব্রাহ্মণ*গ্রন্থে সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার ক্রমও বর্ণিত হয়েছে। ব্রাহ্মণকারের মতে প্রজাপতি দ্বারা বাক্ সর্বপ্রথম অব্যক্ত অবস্থা থেকে ব্যক্ত অবস্থায় পরিণত হয়েছে। প্রজাপতির ইচ্ছা অনুসারেই পৃথিবী অন্তরিক্ষ ও দ্যৌ সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় বর্তমান ছিল। এখানে ত্রিবিৎ বলতে অগ্নিষ্টোমের তিনটি সবনের কথা বলা হয়েছে। এই গ্রন্থেই প্রাণময়কোশ ও অন্নময়কোশকে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং আশ্রয়দাতা বলা হয়েছে- "ন বৈ প্রাণ ঋতেঽন্নাতপারযতি নাহন্ন ঋতে প্রাণাতপ্রাণেষু চৈ বাহন্নাদ্যৈ চ প্রতিতিষ্ঠতি"।[১০] এখানে বাক্ কে সরস্বতী বলা হয়েছে। *তাণ্ড্যব্রাহ্মণে* বলা হয়েছে জীবাত্মা শরীর ত্যাগের পর দূরগামী যমকে প্রাপ্ত হয় এবং সোমস্বরূপ ব্রহ্মার কাছে পুনর্জীবন লাভের প্রার্থনা করে তা লাভের পথকে সুগম করে।

২.৫.১.২. *জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ*

সামবেদের আটটি ব্রাহ্মণের মধ্যে একটি অন্যতম ব্রাহ্মণগ্রন্থ হল *জৈমিনীয় বা তলবকারব্রাহ্মণ*। গ্রন্থটি *তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ* অপেক্ষা কম প্রাচীন। যদিও গ্রন্থটি আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত এরকম তথ্য পাওয়া যায় তথাপি বর্তমানে একমাত্র উপলব্ধ ডঃ রঘুবীরকৃত সংস্করণ অনুযায়ী সমগ্র *জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ* তিনটি কাণ্ডে বিভক্ত, যেগুলির কয়েকটি খণ্ডে উপবিভাগও বর্তমান। প্রথম কাণ্ডে ৩৬৪ টি বিভাগ, দ্বিতীয়তে ৪৪২টি বিভাগ এবং অন্তিম কাণ্ডে ৩৮৬টি বিভাগ রয়েছে। এখনও পর্যন্ত এই গ্রন্থের কোনো ভাষ্য পাওয়া যায়নি। এমনকী শ্রৌতসূত্রে এই ব্রাহ্মণের সম্পূর্ণ বিনিয়োগ দেখানো সম্ভব হয়নি। তবে, সামগানের জটিল পদ্ধতিকে সঠিক ভাবে জানার জন্য এই ব্রাহ্মণগ্রন্থের গুরুত্ব অপরিসীম।

জৈমিনীয়ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তু অনেকাংশেই *তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণের* অনুরূপ হলেও আখ্যানভাগের দৃষ্টিতে এই ব্রাহ্মণ অধিক সমৃদ্ধ। বিভিন্ন পৌরাণিক এবং ধর্মীয় কাহিনীর সমাবেশ এখানে লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন যাগ-যজ্ঞের বিবরণ এই গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়। যেমন- প্রথমকাণ্ডে অগ্নিহোত্র, অগ্নিষ্টোম ও প্রায়শ্চিত্তবিধি ক্রমানুসারে বিবৃত হয়েছে। দ্বিতীয়কাণ্ডে গবাময়ন সত্র, একাহ যাগ, বার দিন ব্যাপী অহীন যাগ, বার দিনের বেশি স্থায়ী সত্রযাগ এবং গবাময়ন সত্র পর্যায়ক্রমে আলোচিত হয়েছে। অবশেষে তৃতীয় কাণ্ডে দ্বাদশাহ যজ্ঞ বিষয়ে করা হয়েছে।

পূর্বোক্ত যজ্ঞীয় বিষয় আলোচনার পাশাপাশি প্রজাসৃষ্টি, প্রাণোৎপত্তি, বাক্, মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি, বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের মূল বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এই ব্রাহ্মণ অনুসারে প্রজাপতি দেবতাই যজ্ঞ দ্বারা এই জগৎ প্রপঞ্চ নির্মাণ করেছেন। তিনিই সলিলের উপর পৃথিবীকে স্থাপন করেছিলেন। *জৈমিনীয়ব্রাহ্মণে* প্রাণকে দেবতা বলা হয়েছে- "এষাং হীদং দেবতা সর্বং প্রাণযতঃ। তদ্ সদ্ প্রাণযতঃ। তস্মাদ্ প্রাণঃ"।[১১] এই গ্রন্থে বাক্ কে ছন্দস্ বলা হয়েছে।

২.৫.১.৩. *জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ*

জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ-এরই শেষ চারটি অধ্যায় নিয়ে (বা এই ব্রাহ্মণের উত্তরভাগ, চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত) গঠিত উপনিষদ্ব্রাহ্মণ বা *জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ*। এটি *তলবকার-উপনিষদ্ব্রাহ্মণ* বা *গায়ত্র্যুপনিষদ্* নামেও পরিচিত। এই ব্রাহ্মণগ্রন্থটি হন্নস্ অর্টেল্ মহোদয় ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রোমান লিপিতে সম্পাদনা করেন। পরবর্তীকালে ভগবদ্দত্ত মহাশয় গ্রন্থটি দেবনাগরী লিপিতে সম্পাদনা করেন। এই সংস্করণটিই বর্তমানে উপলব্ধ।

জৈমিনীয়ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তুর সাথে এই ব্রাহ্মণেরও বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য বিদ্যমান। এখানেও প্রজাপতি কর্তৃক সৃষ্টি বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও পার্থিব শরীর থেকে ভিন্ন চেতন সত্তা রূপে আত্মন্ শব্দের বহুবার প্রয়োগ দেখা যায়। তবে এর অস্তিত্ব দেবতারাই একমাত্র জানতে পারেন। সেখানে দেবতাদের প্রতিনিধি হিসাবে বাক্, মন চক্ষু, শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয় এবং প্রাণাপানাদিসমূহকে উল্লেখ করা হয়েছে। এই গ্রন্থানুসারে প্রাণের দ্বারাই সকল দেবতা, পিতৃপুরুষ, মনুষ্য, গন্ধর্ব, অপ্সরা এবং সম্পূর্ন সংসার প্রাণবান হয়েছে। এই ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে মন থেকেই সকল দিকের উৎপত্তি। মন এবং এই দিক সমূহ অপরিমিত। মনকে হিংকার বলা হয়েছে- "মন এব হিংকারঃ"।[১২] বাক্ কেও মিথুন দেবতা হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। *জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ* অনুসারে যা আকাশ তাই বাক্, এই বাক্ থেকেই পৃথিবীলোক, অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, দেবগণ, ব্যাহৃতি এবং ওম্ এর সৃষ্টি। এছাড়াও এই ব্রাহ্মণে *জৈমিনীয়ব্রাহ্মণের* ন্যায় পুরুষতত্ত্বও আলোচিত হয়েছে।

২.৫.১.৪. *কেনোপনিষদ্*

কেনোপনিষদ্ সামবেদীয় ব্রাহ্মণসাহিত্যের অন্তর্গত একটি উপনিষদ্ গ্রন্থ। গ্রন্থটি চারটি খণ্ডে বিভক্ত। *জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ*-এর সপ্তম অধ্যায় বা *উপনিষদ্ব্রাহ্মণ* এর চতুর্থ অধ্যায়ের অষ্টাদশ থেকে একবিংশ খণ্ড পর্যন্ত

অংশ নিয়ে বিরাজিত। এটি *তলবকারোপনিষদ্* নামেও পরিচিত। 'কেনেষিতম্' পদ দ্বারা এই উপনিষদ্ আরম্ভ হওয়ায় '*কেনোপনিষদ্*' নাম। পদ্যে রচিত প্রথম দুই খণ্ডে বলা হয়েছে বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, মন এবং প্রাণ দিয়ে ব্রহ্মকে পাওয়া যায়না। প্রকৃতপক্ষে তিনি জানা অজানার বাইরে, তিনি প্রতিবোধবিদিত। 'উমা-হৈমবতী-উপাখ্যান' বর্ণিত হয়েছে অন্তিম দুই খণ্ডে। সেখানে দিব্য চেতনার ক্রমিক উন্মেষের একটি চিত্র পাওয়া যায় এবং দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পরিচয় পাওয়া যায়। উপাখ্যানের শেষে ব্রহ্ম সম্পর্কে সাধারণ কিছু বিবৃতি প্রদান করে তাঁকে লাভ করার প্রধান সাধন হিসাবে তপঃ, দম এবং কর্মের কথা বলা হয়েছে। এটাও বলা হয়েছে যে, বেদ, বেদাঙ্গ এবং সত্যই তাঁর আয়তনস্বরূপ।

২.৫.১.৫. *ছান্দোগ্যোপনিষদ্*

সামবেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্য বা মন্ত্র বা উপনিষদ্ব্রাহ্মণের শেষ আটটি প্রপাঠক নিয়ে গঠিত সর্বপ্রাচীন উপনিষদ্ গুলির মধ্যে অন্যতম হল *ছান্দোগ্যোপনিষদ্*। অতএব এই উপনিষদ্ আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায় আবার বারটি খণ্ডে বিভক্ত। দ্বিতীয় অধ্যায়ে চতুর্বিংশ খণ্ড বিদ্যমান, তৃতীয় অধ্যায়ে উনিশটি, চতুর্থ অধ্যায়ে সতেরটি খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়ে চব্বিশটি, ষষ্ঠ অধ্যায়ে ষোলটি খণ্ড, ছাব্বিশটি খণ্ড সমন্বিত সপ্তম অধ্যায়, এবং পনের খণ্ডে বিধৃত অন্তিম তথা অষ্টম অধ্যায়।

প্রথম অধায়ে নানাভাবে উদ্গীথোপাসনার কথা বলা হয়েছে। যেমন প্রথম খণ্ডেই ওঙ্কারকে উদ্গীথ জ্ঞানে উপাসনার বিধান আছে। এছাড়াও কোথাও প্রাণ রূপে, কোথাও আদিত্য, কোথাও বা প্রাণ বাক্ এবং অন্ন অথবা পৃথিব্যাদি ত্রিলোক, কোথাও বা আদিত্য, বায়ু ও অগ্নি, তিন বেদ হিসাবে উপাসনার কথা বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাধুত্ব শব্দের দ্বারা সামকে বোঝান হয়েছে। এখানেও বিবিধ ভাবনায় সামের উপাসনার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অখণ্ড সামের তাৎপর্য নিরূপিত হয়েছে। বিবাহের অনুষ্ঠানে বামদেব্য সামের বিশেষ প্রয়োগ বর্ণিত হয়েছে। কোথাও বা সাতরকম স্বরের বর্ণনা তাদের অধিষ্ঠাতা দেবতার উল্লেখ করে করা হয়েছে। ধর্মের তিনটি স্কন্ধের উল্লেখ, সামগানের দ্বারা যজমানের ত্রিলোকবিজয় বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে অন্যতম বিষয় হল মধুবিদ্যা। এছাড়াও গায়ত্রীর স্বরূপ ও উপাসনা, দ্বারপা বা দ্বারপালদের উপাসনা, শাণ্ডিল্যবিদ্যা, কোশবিদ্যা, পুরুষযজ্ঞবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান এবং আদিত্যের ব্রহ্মদৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে রৈক্ক ও জানশ্রুতির উপাখ্যান, সত্যকাম জাবালের ব্রহ্মবিদ্যালাভের কাহিনী প্রভৃতি বর্ণনা রয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে সত্যকাম জাবাল কর্তৃক প্রাণের উপাসনা আছে। এছাড়াও পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, বৈশ্বানরের অখণ্ড রূপের বর্ণনায় সমৃদ্ধ এই অধ্যায়। ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য হল এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান। 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যটি এই অধ্যায়েই বিদ্যমান। সপ্তম অধ্যায়ে অন্যতম বিষয় হল 'নারদ-সনৎকুমার-সংবাদ'। 'দহরাবিদ্যা' অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম ছয়টি খণ্ডের প্রতিপাদ্য। এরপর ইন্দ্র-বিরোচন-প্রজাপতি-সংবাদ আলোচিত হয়েছে। ব্রহ্মচৈতন্যকে বলা হয়েছে আকাশ। বিদ্যা-সম্প্রদায় ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির পর্যায় ও ফল বর্ণিত হয়েছে।

২.৬. ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে প্রাপ্ত নির্বচনপদ্ধতি

২.৬.১. *তাণ্ডমহাব্রাহ্মণ*-এ প্রাপ্ত নির্বচনপদ্ধতি

সামবেদীয় ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম হল *তাণ্ডমহাব্রাহ্মণ*। এই গ্রন্থটি পঁচিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। তাই এটি *পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ* নামেও পরিচিত। এই ব্রাহ্মণগ্রন্থে যজ্ঞে উদ্গাতৃগেয় স্তোত্র, স্তোম ইত্যাদি বিষয় আলোচনাকালে মন্ত্রান্তর্গত বিভিন্ন বৈদিক শব্দের নির্বচন করা হয়েছে। এখানে প্রাপ্ত ৪২টি শব্দের নির্বচন প্রসঙ্গক্রমে পর্যালোচনার দ্বারা নির্বচনপদ্ধতি বিষয়ে আলোকপাত করা যাক-

অভিজিৎ

তাণ্ডমহাব্রাহ্মণের ষোড়শ অধ্যায়ের চতুর্থখণ্ডে অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ ইত্যাদি একাহ সোমযাগে স্তোত্র মন্ত্রের আলোচনাকালে আখ্যায়িকাসহযোগে অভিজিৎ ও বিশ্বজিৎ শব্দের নির্বচন করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে দেবরাজ ইন্দ্র প্রজাপতির শ্রেষ্ঠ পুত্রত্ব অর্জনের পর সবকিছু জয় করতে প্রয়াসী হন। প্রথমে বিশ্ব অর্থাৎ জগৎ জয় করেন। তারপরও যা কিছু অনভিজিত ছিল সেগুলি জয় করতে ইচ্ছুক হন। তখন তিনি অভিজিৎ যজ্ঞের দেখা পান এবং সেই যজ্ঞের দ্বারাই অনভিজিত সব কিছু জয় করেন। অতএব অভিজয়ের সাধনহেতু এই যজ্ঞ অভিজিৎ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। নির্বচনটি হল-

সোঽকাময়ত যন্মেঽনভিজিতং তদভিজয়েযমিতি স এতমভিজিতমপশ্যত্তেনানভিজিতমভ্যজয়ত্।[১৩]

অর্থাৎ তিনি (দেবরাজ ইন্দ্র) কামনা করেছিলেন যা কিছু আমার (ইন্দ্রের) অনভিজিত আছে, সেগুলি জয় করতে হবে। তিনি অভিজিৎ যজ্ঞকে দেখেন (এবং) তার দ্বারা অবিজিত সমস্তকিছু জয় করেন।

এই গ্রন্থের বিংশতম অধ্যায়েও অভিজিদতিরাত্র নামক যজ্ঞের স্তোত্রের অধিকারি বর্ণনা কালেও অভিজিৎ শব্দের নির্বচন করা হয়েছে, সেটি হল-

অভিজিতা বৈ দেবা অসুরান্ ইমান্ লোকানভ্যজয়ন্।[১৪]

অর্থাৎ অভিজিৎ যজ্ঞ দ্বারা দেবতারা অসুরদের ও লোকসমূহ (পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক) জয় করেছিলেন।

বাইসতম অধ্যায়ে 'অভিজিৎ', 'বিশ্বজিৎ' ইত্যাদি নামক পাঁচদিন সাধ্য 'অতিরাত্র' যজ্ঞবিষয়ে আলোচনাকালে উক্ত পাঁচদিনের প্রশংসা করেছেন। যজ্ঞ চলাকালীন কোন মাসের চতুর্দশতম দিনকে 'অভিজিৎ' (দিবস) নামে অভিহিত করা হয়। অভিজিৎ দিনের প্রশংসাকালে বলা হয়েছে-

অভিজিতা বৈ দেবা ইমান্ লোকানভ্যজয়ন্।[১৫]

অর্থাৎ অভিজিৎ দিবসে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ দ্বারা দেবতারা এই লোকসমূহ (পৃথিব্যাদি ত্রিলোক) জয় করেছিলেন।

নির্বচনপদ্ধতি

তাণ্ডমহাব্রাহ্মণে অভিজিৎ শব্দের নির্বচনটি একাধিক পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হলেও একই ক্রিয়াপদের দ্বারাই নিরুক্তি করা হয়েছে। এটি একটি 'অসমস্ত-শব্দার্থ-নির্বচন' বলা যায়। এখানে তিনটি নির্বচনেই 'অভিজিৎ' শব্দটি 'অভ্যজযৎ' ও তার বহুবচন 'অভ্যজযন্' এই ক্রিয়াপদের নিরিখে প্রদর্শিত হয়েছে অর্থাৎ 'অভি' এই উপসর্গ পূর্বক *জি জয়ে* ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে অভিজিৎ পদটি নিষ্পন্ন হয়েছে। যেহেতু দেবরাজ ইন্দ্রের যা কিছু অবিজিত ছিল তার অভিমুখী হয়ে জয়লাভ করেছিলেন বা দেবতারা অসুরদের ও ত্রিলোকের অভিমুখে লক্ষীভূত হয়ে অভিজিতের দ্বারাই তাদের জয় করেছিলেন তাই অভিজিৎ এই নাম সিদ্ধ হয়।

পাণিনি ব্যাকরণানুসারে 'অভিজিৎ' শব্দটির ব্যুৎপত্তি হল- 'অভিমুখীভূয জযতি (শত্রূন্)' এই অর্থে অভি এই উপসর্গ পূর্বক *জি জয়ে* ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'অভিজিৎ' পদটি নিষ্পন্ন হয়েছে (অভি -*জি জয়ে* + 'ক্বিপ্')। এখানে প্রাসঙ্গিক সূত্রটি হল- "সৎসূদ্বিষদ্রুহযুজবিদভিদচ্ছিদজিনীরাজামুপসর্গেঽপি ক্বিপ্"[১৬] অর্থাৎ পাণিনি ব্যাকরণেও অভিজিৎ শব্দটি অভিমুখীকৃত হয়ে জয় করা অর্থে, জয়ার্থক জি ধাতু থেকেই নিষ্পন্ন হয়েছে। তাই বলা যায়, বৈয়াকরণ শব্দগঠনপ্রক্রিয়া অনুসারেই 'তাণ্ডমহাব্রাহ্মণে' 'অভিজিৎ' শব্দের নির্বচনগুলি সিদ্ধান্তিত হয়েছে। অভিজিৎ এই মূল শব্দের সাথে উৎস স্বরূপ ধাতু (*জি জয়ে*) বা ক্রিয়াপদের (অভজযত্) ধ্বনি ও অর্থগত সাদৃশ্য বিদ্যমান। অতএব ব্যাকরণের সহজ-সরল প্রয়োগ দ্বারাই নির্বচনটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়

যাস্কাচার্যের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী *তাণ্ডমহাব্রাহ্মণে* উল্লেখিত 'অভিজি'ৎ শব্দের নির্বচনটি প্রত্যক্ষবৃত্তি শব্দের নির্বচন বা প্রত্যক্ষ নির্বচন শ্রেণীর অন্তর্গত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

অভীবর্ত

তাণ্ডমহাব্রাহ্মণে পৃষ্ঠস্তোত্রনিবর্ত্তক সাম রূপে 'অভীবর্তসাম' বিধানকালে নামনির্বচনদ্বারা শব্দটির প্রশংসা করা হয়েছে। নির্বচনপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

> অভীবর্তেন বৈ দেবাঃ স্বর্গং লোকমভ্যবর্তন্ত যদভীবর্তো ব্রহ্মসাম ভবতি স্বর্গস্য লোকস্যাভিবৃত্যৈ।।[১৭]

অর্থাৎ 'অভীবর্ত' সামের দ্বারা দেবতারা স্বর্গলোকে অবস্থান করেছিলেন। অতএব স্বর্গলোকে অবস্থানের সাধন হওয়ায় এই সাম 'অভীবর্ত' এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

নির্বচনপদ্ধতি

'অভীবর্ত' শব্দের নির্বচন প্রসঙ্গে সায়ণাচার্যের উক্তি শব্দটির নির্বচন পদ্ধতি জ্ঞাপনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাঁর উক্তিটি হল-

> "অভিপূর্বাদ্বৃতবর্ত্তন ইত্যস্মাৎকরণে ঘঞ্, উপসর্গস্য ঘঞ্যমনুষ্যবহুলমিতি পূর্বপদস্য দীর্ঘঃ"।[১৮]

অর্থাৎ 'অভি' এই উপসর্গপূর্বক *বৃতু বর্তনে* ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে করণবাচ্যে 'অভীবর্ত' পদটি সিদ্ধ হয় এবং 'ঘঞ্যমনুষ্যবহুলমিতি' এই সূত্র দ্বারা উপসর্গ দীর্ঘত্ব প্রাপ্ত হয়ে 'অভীবর্ত' রূপটি পাওয়া যায়।

অতএব ব্যাকরণের সহজ সরল প্রয়োগকে অনুসরণ করেই 'অভীবর্ত' শব্দের নির্বচনটি সিদ্ধ হওয়ায় এটি প্রত্যক্ষ নির্বচনপদ্ধতির অন্তর্গত বলা যায়।

এছাড়াও অষ্টম অধ্যায়েও 'অভীবর্ত' শব্দের নির্বচন পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে-

> অভীবর্তেন বৈ দেবা অসুরানভ্যবর্তন্ত যদভীবর্তো ব্রহ্মসাম ভবতি ভ্রাতৃব্যস্যাভিবৃত্যৈ।।[১৯]

অর্থাৎ 'অভীবর্ত' দ্বারা দেবতারা অসুরদের অভিমুখে অবস্থান করেছিলেন। ভ্রাতৃব্য অর্থাৎ অসুররূপ শত্রুদের বধের জন্য, তাদের অভিমুখে অবস্থানের সাধন হওয়ায় এই সাম 'অভীবর্ত' সংজ্ঞা লাভ করে।

নির্বচনপদ্ধতি

এখানে 'অভীবর্ত' সাম দেবাসুরের অন্তরালে প্রকৃতপক্ষে যজমানরূপ শত্রুদের অপমানের নিমিত্ত প্রয়োগের বিধান দেওয়া হয়েছে। তবে 'অভ্যবর্তন্ত' এই ক্রিয়াপদের প্রয়োগ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, অষ্টমাধ্যায়েও 'অভীবর্ত' শব্দের গঠনপ্রক্রিয়া পূর্বেরই অনুরূপ অর্থাৎ 'অভি' উপসর্গপূর্বক √বৃত্ ধাতু (*বৃতু বর্তনে*, ভ্বাদিগণ, ৭৫৮) থেকে 'অভীবর্ত' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। অতএব ব্যাকরণ অনুসারী প্রত্যক্ষ নির্বচনপদ্ধতিতেই 'অভীবর্ত' শব্দের নির্বচন করা হয়েছে।

অরিষ্ট

'অরিষ্ট' একটি সাম। অহিংসা হেতু এই সাম প্রতিপাদিত হয়। এই সাম আলোচনা প্রসঙ্গে *তাণ্ডমহাব্রাহ্মণে* অরিষ্টসংজ্ঞা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। সেটি হল-

> দেবাশ্চ বা অসুরাচাস্পর্ধযন্ত যং দেবানামঘ্নন্ন স সমভবদ্যমসুরাণাং সংসোঽভবত্তে দেবাস্তপোঽতপ্যন্ত ত এতদরিষ্টমপশ্যংস্ততোঽযং দেবানামঘ্নত্ সংসোভবদ্যমসুরাণান্ন সসমভবদনেন নারিষামেতি তদরিষ্টস্যারিষ্টত্বম্।[২০]

দেবতা ও অসুরেরা স্পর্ধা পূর্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে দেবতাদের মধ্যে যাকে অসুরেরা আহত করে সে পুনরায় উত্থিত হয়নি। আবার অসুরদের মধ্যে যাকে দেবতারা আহত করে সে পুনরায় প্রহার প্রতিরোধ করে উত্থিত হয়। এমতাবস্থায় দেবতারা অহিংসা সাধনের উপায় পর্যালোচনা করে তপস্যা শুরু করে। তখন অরিষ্ট সাম দেখতে পায়। তার পরে অসুরদের দ্বারা আহত দেবতা পুনরুত্থিত হলেও দেবতাদের দ্বারা আহত অসুর পুনরুত্থিত হলনা। তখন তাঁরা এই সামের দ্বারা অসুরদের দ্বারা হিংসিত হবনা এটি মনস্থির করেন। এইভাবে অহিংসসাধন হওয়ায় অরিষ্ট (অরিষ্টম্) এই নাম।

নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনটি পর্যালোচনার দ্বারা বোঝা যায় ব্রাহ্মণকার 'অরিষ্ট' শব্দটি নঞ্ সমাস পূর্বক √রিষ্ (*রিষ হিংসায়াম্,* ভ্বাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ৫১৫) ধাতু থেকে নিষ্পন্ন করেছেন অর্থাৎ 'অ (নঞ্) √রিষ্-ধাতু + ক্ত' = অরিষ্ট, তদর্থমেব অরিষ্টম্।

অশ্ব

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে অশ্ব শব্দের নির্বচনটি প্রজাপতি কর্তৃক অশ্বমেধ যাগ অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রজাপতির অক্ষি পতিত হয়ে অশ্ব রূপ লাভ করেছে। নির্বচনটি হল-

> প্রজাপতের্বা অক্ষ্যশ্বযত্তৎপরাপতৎ তদশ্বোঽভবত্তদশ্বস্যাঽশ্বত্বম্।[২১]

অর্থাৎ প্রজাপতির অক্ষি নীচে পতিত হয়, সেই পতিত অক্ষি অশ্ব হয়েছিল। এখানেই অশ্বের অশ্বত্ব।

এই নির্বচন প্রসঙ্গে সায়ণাচার্য বলেছেন-

> প্রজাপতের্লোচনমক্ষি অশ্বযত্ তদশ্বোঽভবত্ তদধঃ পরাপতত্ পতিতং তদক্ষি অশ্বত্বেন অরোচযত্ তদশ্বস্যাশ্বত্বং সম্পন্নম্।[২২]

অর্থাৎ ব্রাহ্মণকার √শ্বি ধাতু (*ট্বো শ্বি গতিবৃদ্ধ্যোঃ,* পাণিনীয়ধাতুপাঠ ৯৯৭) থেকে অশ্ব শব্দ নিষ্পন্ন করেছেন, কারণ প্রজাপতির পরে যাওয়া বা পতিত হওয়া অক্ষি বা চোখই অশ্ব হয়েছে।

ব্যাকরণ অনুসারে ব্যাপ্ত্যর্থক √অশ্ ধাতুর (*অশূঙ্ ব্যাপ্তৌ*) উত্তর 'ক্বন্' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে অশ্ব শব্দ নিষ্পন্ন। সূত্র- "অশুপ্রুষিলটিকণিখটিবিশিভ্যঃ ক্বন্"।[২৩] অতএব *তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে* 'অশ্ব' শব্দের নির্বচনটি পরোক্ষনির্বচন শ্রেণীর অন্তর্গত বলা যায়।

আক্ষার

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে একাদশ অধ্যায়ে 'আক্ষার' শব্দের নির্বচন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

> এভ্যো বৈ লোকেভ্যো রসোঽপাক্রামত্ তং প্রজাপতিরাক্ষারেণাক্ষারযদ্ যদাক্ষারযত্ তদাক্ষারস্যাক্ষারত্বম্।[২৪]

অর্থাৎ এই তিন লোক থেকে ক্ষীরাত্মক রস অপগত হয়েছিল। প্রজাপতি 'আক্ষার' সংজ্ঞক ব্রহ্মসামের দ্বারা সেই রস ক্ষরণ করিয়েছিলেন। যেহেতু এই সামের দ্বারা ক্ষরণ করিয়েছিলেন তাই আক্ষার সামের আক্ষারত্ব।

সায়ণাচার্য 'আক্ষারযত্' শব্দের অর্থ করেছেন- 'আক্ষারযত্ আসমন্তাদাসিক্তবান্'[২৫] অর্থাৎ সমস্তদিক থেকে সিক্ত করেছিলেন।

নির্বচনপদ্ধতি

'আক্ষার' শব্দের নির্বচনটি প্রত্যক্ষবৃত্তি শব্দের নির্বচনের অন্তর্গত। 'আক্ষারযত্' এই ক্রিয়াপদটি শব্দটির উৎস রূপে উল্লেখিত হয়েছে (আক্ষারযত্ > আক্ষার)। অর্থাৎ 'আ' এই উপসর্গপূর্বক √ক্ষর্-ধাতুর (*ক্ষর সঞ্চলনে*, ভ্বাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ৮৫১) উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় যুক্ত করে আক্ষার শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে (আ-√ক্ষর্-ধাতু + ঘঞ্)। ব্যাকরণগত শব্দগঠনপ্রক্রিয়া অনুসারে শব্দটিকে এইভাবেও ব্যুৎপাদিত করা যায়। 'আক্ষারযত্' এই ক্রিয়াপদের সাথে 'আক্ষার' শব্দের ধ্বনিগত ও অর্থগত সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকায় ও ব্যাকরণগত সংস্কারকে অনুসরণ করায় খুব সহজেই শব্দটির প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতি বিষয়ে অবগত হওয়া যায়।

আচ্যাদোহ

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ-এর পনেরোটি খণ্ডবিশিষ্ট একবিংশ অধ্যায়ে চতুরাত্র ও পঞ্চরাত্র বিষয়ে বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়। সেখানেই 'আচ্যাদোহ' সামের আলোচনা প্রসঙ্গে নির্বচন দ্বারা এর প্রশংসা করা হয়েছে। নির্বচনটি হল-

> এতৈর্বৈ সামভিঃ প্রজাপতিরিমান্ লোকান্ সর্বান্ কামান্ দুগ্ধ যদাচ্যা দুগ্ধ তদাচ্যা দোহানামাচ্যাদোহত্বম্।[২৬]

পূর্বে প্রজাপতি এই সামগুলির দ্বারা (পৃথিব্যাদি) লোকসমূহকে অর্থাৎ লোকসমূহে স্থিত প্রজাদের জন্য সকল ভোগ্যবস্তু দোহন করেন। যেহেতু লৌকিক দোগ্ধা আচ্য দোহন করেন, সেহেতু প্রজাপতিও জানুনী করে সোমসমূহের দ্বারা দোহন করেছিলেন। তাই আচ্যাদোহসমূহের আচ্যাদোহ এই নাম হয়েছে।

নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনটির পর্যালোচনার দ্বারা দুটি উপায়ে শব্দটির উৎপত্তি বিষয়ে ধারনা করা যায়। প্রথমত 'আচ্যা' এই শব্দ পূর্বক √দুহ্-ধাতু থেকে 'আচ্যাদোহ' পদ নিষ্পন্ন করা যায় (আচ্যা-√দুহ্ ধাতু = আচ্যাদোহ)। দ্বিতীয়ত 'আচ্যাদুগ্ধ' শব্দ থেকে ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মানুসারে উকারের স্থানে ওকার এই গুণ বর্ণে রূপান্তরিত করে, গকারের লোপ করে এবং ধকারকে হকারে পরিবর্তন করে 'আচ্যাদোহ' পদটি সিদ্ধ করা যায় (আচ্যাদুগ্ধ> আচ্যাদোহ)। অতএব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় নির্বচনপদ্ধতিই এখানে অবলম্বন করা হয়েছে বলা যায়।

আজ্য

'আজ্য' শব্দটি সাধারণ অর্থ ঘৃত। তবে বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত বিভিন্নি যাগযজ্ঞ বিষয়ে আলোচনাকালে 'আজ্য' শব্দটি যৌগিকশব্দ হিসাবেও প্রযুক্ত হয়, যেমন- আজ্যশস্ত্র, আজ্যস্তোত্র ইত্যাদি। সামবেদের অন্তর্গত *তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ*-এর সপ্তমাধ্যায়ে আজ্যস্তোত্রের দেবতা বিষয়ে একটি আখ্যায়িকা বিদ্যমান। সেখানেই 'আজ্য' শব্দের নির্বচনটি দেখা যায়। এটি হল-

> ত (তে) আজিমাযন্যদাজিমাযংস্তদাজ্যানামাজ্যত্বম্।[২৭]

অর্থাৎ তাঁরা দেবতারা 'আজি' অর্থাৎ মর্যাদা (প্রতিযোগিতার জন্য নিশ্চিত সীমা পর্যন্ত) গিয়েছিলেন। যেহেতু 'আজি' অর্থাৎ মর্যাদা পর্যন্ত গিয়েছিলেন তাই 'আজ্য' শব্দের 'আজ্য' এই নাম।

এপ্রসঙ্গে সায়ণাচার্যের মত প্রণিধানযোগ্য-

> আজিং মর্য্যাদামিতো গচ্ছতেতি তদেবাজিমাযন্ অগমযন্ যদ্যস্মাদাজিমান্ তস্মাজাদ্যানামাজ্যত্বম্।[২৮]

নির্বচনপদ্ধতি

'আজ্য' শব্দের নির্বচনে 'আজি' ও 'আযন্' এই দুই পদের বিশেষ গুরুত্ব বিদ্যমন। বলা যায় 'আজি' শব্দপূর্বক √ইণ্ (*ইণ গতৌ*, অদাদিগণ, ১০৪৯) ধাতু থেকে 'আজ্য' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে (আজি + √ইণ্-ধাতু = আজ্য)।

ব্যাকরণানুসারে 'আজ্য' শব্দটি ঘৃত (লেপনীয়) এই সংজ্ঞার বোধক হিসাবে 'আ' এই উপসর্গপূর্বক √অঞ্জ্ ধাতুর উত্তর 'ক্যপ্' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নিষ্পন্ন হয়। প্রাসঙ্গিক পাণিনীয় সূত্রটি হল- "আঙ্ পূর্বাদঞ্জেঃ সংজ্ঞাযামুপসংখ্যানম্"।[২৯]

অর্থাৎ ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তি থেকে 'আজ্য' শব্দের 'ঘৃত' এই অর্থ পাওয়া যায় কিন্তু 'আজ্য' শব্দটি *'তাণ্ডমহাব্রাহ্মণে'* তদ্ভিন্ন অর্থের দ্যোতক হিসাবে নির্বচিত হয়েছে যা ব্যাকরণানুসারে কৃত ব্যুৎপত্তির অনুরূপ নয়। অতএব বলা যায়, এখানে 'আজ্য' শব্দটি যাস্কাচার্যের দ্বিতীয় নির্বচনপদ্ধতি অনুসারে অর্থাৎ পরোক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে ব্যুৎপাদিত হয়েছে।

আমহীয়ব

সপ্তমাধ্যায়ের প্রথমেই গায়ত্র ব্যতিরিক্ত 'আমহীয়ব' প্রভৃতি চারটি সামের স্তুতিকালে প্রথমেই 'আমহীয়ব' নামক সামের আলোচনাকালে এই শব্দের নির্বচন করা হয়েছে-

> প্রজাপতিরকামযত বহুস্যাং প্রজাযেযেতি স শোচন্নমহীযমানোঽতিষ্ঠৎস এতদামহীযবমপশ্যত্তেনেমাঃ প্রজা অসৃজত তাঃ সৃষ্টা অমহীযন্ত যদমহীযন্ত তস্মাদামহীযবম্।[৩০]

অর্থাৎ প্রজাপতি স্ব-ব্যতিরিক্ত সত্তার অভাবে নিজেকে অপূজিত মনে করে (দেবমনুষ্যাদি) প্রজা রূপে বহু হতে চেয়েছিলেন। তখন তিনি আমহীয়ব নামক সাম দেখেছিলেন এবং এই সামের দ্বারাই প্রজা সৃষ্টি করেছিলেন। সেই সৃষ্ট প্রজারা তাঁকে পূজা করেছিলেন। যেহেতু নিজসৃষ্ট প্রজাদের দ্বারা পূজিত (মহীয়মান) হয়েছিলেন তাই আমহীয়ব নাম প্রাপ্ত হয়।

আমহীয়ব শব্দের নির্বচনপ্রসঙ্গে সায়ণাচার্যের বিশেষ উক্তিটি হল- "অমহীযুনা প্রজাপতিনা দৃষ্টত্বাত্ আমহীযবমিতি তন্নাম সম্পন্নমিত্যর্থঃ"।[৩১]

নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনটির পর্যালোচনা দ্বারা দুইরকমভাবে আমহীয়ব শব্দটি সিদ্ধ করা যায়। প্রথমত যেহেতু এই সামের দ্বারাই সৃষ্ট প্রজা কর্তৃক মহীয়মান অর্থাৎ পূজিত হয়েছিলেন তাই 'আ' এই উপসর্গ পূর্বক √মহ্-ধাতু (*মহ পূজাযাম্,* পাণিনীয়ধাতুপাঠ ৭৩০) থেকে 'আমহীয়ব' শব্দের উৎপত্তি বলা যায়। এখানে উপসর্গ সহ মূল ধাতুর সাথে বিকারপ্রাপ্ত শব্দের অর্থানুযায়ী ধ্বনিসাম্য বিদ্যমান। এছাড়াও সায়ণাচার্যের উক্তি অনুসারে 'অমহীযুনা দৃষ্টম্ আমহীয়বম্' এই বিগ্রহ দ্বারা অমহীযু শব্দের সাথে 'অণ্' প্রত্যয় যুক্ত করে 'আমহীয়বম্' পদটি সিদ্ধ করা যায় (অমহীয়ু + 'অণ্' প্রত্যয় = আমহীয়বম্)। অতএব সামগ্রিকভাবে বলা যায় 'আমহীয়ব' শব্দের নির্বচনটি যাস্কাচার্যের প্রথম নির্বচন সিদ্ধান্তের (প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতি) অন্তর্গত।

আয়ু

আয়ু নামক সোমযাগের বর্ণনাকালে *তাণ্ডমহাব্রাহ্মণের* ষোড়শ অধ্যায়ে 'আয়ু' শব্দের নির্বচন করা হয়েছে। নির্বচনটি হল-

> আযুষা বৈ দেবা অসুরানাযুবতাযুতে ভ্রাতৃব্যং য এবং বেদ।[৩২]

অর্থাৎ আয়ু নামক যজ্ঞের দ্বারা দেবতারা অসুরদের সমস্তদিক থেকে (প্রাণ প্রভৃতির দ্বারা) বিযুক্ত করে পৃথক করেছিলেন বা পৃথকভাবে অবস্থান করেছিলেন। যিনি এইরূপে (এই ব্রাহ্মণবাক্য) জানেন তিনি শত্রুকে নিজের থেকে পৃথক করতে পারেন।

সায়ণাচার্যের বক্তব্যটি হল-

"আযুষা বৈ আযুরাখ্যেন এতেন যজ্ঞেন দেবা অসুরানাযুবতা আসমন্তাৎপ্রাণাদিভির্বিযোজযত যৌতিরত্র পৃথক্ভাবে বর্ততে তস্মাদাযুর্বর্তনসাধনত্বাত্ অস্যাযুরিতি সংজ্ঞেত্যর্থঃ, য এবং ব্রাহ্মণবাক্যং বেত্তি অসৌ ভ্রাতৃব্যং শত্রুং আযুতে আত্মনঃ সকাশাত্ পৃথক্করোতি"।[৩৩]

অর্থাৎ আয়ু নামক এই যজ্ঞের দ্বারা দেবতারা অসুরদের সমস্তদিক থেকে প্রাণ প্রভৃতির দ্বারা বিযুক্ত করে পৃথক করেছিলেন বা পৃথকভাবে অবস্থান করেছিলেন। সেহেতু আযুর্বর্তনের সাধন হওয়ায় এর (এই যজ্ঞের) 'আয়ু' এই সংজ্ঞা। যিনি এই ব্রাহ্মণবাক্য জানেন তিনি শত্রুকে নিজের থেকে পৃথক করতে পারেন।

নির্বচনপদ্ধতি

'আয়ু' শব্দের নির্বচনটি একাধিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়। প্রথমত, নির্বচনস্থিত 'আযুবত' ক্রিয়াপদ থেকে 'আয়ু' শব্দটি নিষ্পন্ন করা যায়। 'আ' এই উপসর্গ পূর্বক √যু-ধাতু থেকে 'আয়ু' শব্দটি ব্যুৎপন্ন হয়েছে বলা যায় অথবা 'আযুবত' এই ক্রিয়াপদের প্রথমার্ধাংশ 'আযু'র সাথে 'আয়ু' শব্দের ধ্বনিগত সাদৃশ্যও বিদ্যমান। আবার 'আযুবত' ও 'যৌতি' এই দুই ক্রিয়াপদ থেকে পৃথকভাবে যথাক্রমে 'আ' ও 'যু' এই দুই অক্ষর ও বর্ণগত সাদৃশ্যের ভিত্তিতেও 'আযু' শব্দটি নিষ্পন্ন করা যায়।

ব্যাকরণ অনুসারে 'আয়ু' শব্দটি √ইণ্-ধাতুর উত্তর 'উসি' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে সিদ্ধ হয় (*ইণ গতৌ* + উসি প্রত্যয় = আযুস্)। অতএব আচার্য যাস্কাচার্যের নির্বচনসিদ্ধান্ত অনুসারে 'আয়ু' শব্দের নির্বচনটি অতিপরোক্ষ নির্বচনপদ্ধতির অন্তর্গত বলা যায়।

উপহব্য

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণের অষ্টাদশ অধ্যায়ে প্রথমেই 'উপহব্য' নামক একাহ যাগের বর্ণনাকালে 'উপহব্য' শব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্ত সম্পর্কে যা বলেছেন তা প্রকৃতপক্ষে উক্ত শব্দেরই নির্বচনমাত্র। এই নির্বচনের দ্বারা 'উপহব্য' শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে বিশেষ ধারণা পাওয়া যায়। সেটি হল-

> ইন্দ্রো যতীন্ সালাবৃকেযেভ্য প্রাযচ্ছত্তমশ্লীলা বাগভ্যবদত্ স প্রজাপতিমুপধাবত্ তস্মা এতদুপহব্যং প্রাযচ্ছত্তং বিশ্বেদেবা উপাহ্বযন্ত, যদুপাহ্বযন্ত তস্মাদুপহব্যঃ।[৩৪]

অর্থাৎ ইন্দ্র জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যাগানুষ্ঠান করে প্রকারান্তরে বর্তমান ব্রাহ্মণদের বন্য অশ্বদের দান করেছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ হত্যাকারী ইন্দ্র সকলের দ্বারা নিন্দিত হন। তখন তিনি প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হলে তিনি ইন্দ্রকে এই 'উপহব্য' নামক একাহ যাগ প্রদান করেন। তাঁকে সকল দেবতা এই 'উপহব্যের' দ্বারাই আবার তাঁদের নিকট আহ্বান করেন। যেহেতু নিকটে আহ্বান করেছিলেন (উপাহ্বযন্ত) তাই 'উপহব্য' এই নাম হয়।

নির্বচনপদ্ধতি

পূর্বোক্ত নির্বচনটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় 'উপহব্য' শব্দের উৎপত্তিতে 'উপাহ্বযন্ত' এই ক্রিয়াপদের বিশেষ ভূমিকা বিদ্যমান অর্থাৎ বলা যায় 'উপ' এই উপসর্গ পূর্বক √হ্বে-ধাতু থেকে 'উপহব্য' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে – উপ-√হ্বেঞ্-ধাতু (*হ্বেঞ্ স্পর্ধায়াং শব্দে চ*, ভ্বাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১০০৮) = উপহব্য।

পাণিনীয় ব্যাকরণানুসারে 'উপ' এই উপসর্গ পূর্বক √হু-ধাতুর উত্তর 'যত্' প্রত্যয় যুক্ত করে 'উপহব্য' শব্দটি নিষ্পন্ন হয় (উপ- √হু-ধাতু + 'যত্' = উপহব্য)।

অতএব 'উপহব্য' শব্দের নির্বচনটি যাস্কীয় পরোক্ষনির্বচনপদ্ধতির অন্তর্গত।

কালেয়

তাণ্ডমহাব্রাহ্মণে 'কালেয়' নামক ব্রহ্মসামবিশেষ বর্ণনাকালে নির্বচনপূর্বক এই সামের প্রশংসা করা হয়েছে। নির্বচনটি হল-

> দেবাশ্চ অসুরাশ্চেষু লোকেষ্যস্পর্ধন্ত তে দেবাঃ প্রজাপতিমুপাধাবংস্তেভ্য এতৎসাম প্রযচ্ছদেতেনৈনান্ কালযিষ্যদ্ধমিতি তেনৈনানেভ্যো লোকেভ্যোঽকালযন্ত যদকালযন্ত তস্মাৎকালেযম্।[৩৫]

লোকসমূহে আধিপত্য লাভের জন্য দেবতা ও অসুরদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। দেবতারা প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হলে তাঁর থেকে এই সাম প্রাপ্ত হন। এই সামের দ্বারা অসুরদের লোকসমূহ থেকে বিতাড়িত করেন। যেহেতু বিতাড়িত করেছিলেন তাই 'কালেয়' এই নাম।

নির্বচনপদ্ধতি

'কালেয়' শব্দের নির্বচন থেকে শব্দটির উৎপত্তি বিষয়ে ধারণা পাওয়া যায়। *কলণ্ ক্ষেপে* (চুরাদিগণ, ১৬৯৬) ধাতুটি শব্দটির উৎস হিসাবে সংকেতিত হয়। ব্যাকরণ অনুসারে 'কালেয়' পদটি 'কল' শব্দের সাথে 'ঢক্' এই তদ্ধিতপ্রত্যয় যুক্ত করে নিষ্পন্ন করা যায়। অতএব 'কালেয়' শব্দের নির্বচনটি ব্যাকরণগত সংস্কারানুরূপ না হওয়ায় এবং ধাতুর সাথে শব্দটির অর্থানুসারী ধ্বনিগত সাম্য বিদ্যমান থাকায় এটি পরোক্ষনির্বচন শ্রেণির অন্তর্গত বলা যায়।

গৌঙ্গব

দশরাত্র যাগের অন্তর্গত সপ্তম দিবসে 'গৌঙ্গব' নামক সাম গীত হয়। মূলতঃ অন্ন ভক্ষকদের বা অন্নভোজনকারীকে অবরোধ বা বাধা দেওয়ার জন্য এটি করা হয়। 'গৌঙ্গব' শব্দের নির্বচন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

> অগ্নিরকাময়তান্নাদঃ স্যামিতি স তপোঽতপ্যত স এতদ্ গৌঙ্গবমপশ্যত্ তেনান্নাদোঽভবদ্যদন্নং বিত্বা গর্দ্দদ্যদগঙ্গূষত্তদ্গৌঙ্গবস্য গৌঙ্গবত্বম্।[৩৬]

অর্থাৎ অন্নের অত্তা বা ভক্ষক হওয়ার ইচ্ছায় অগ্নি তপস্যা করেন। তপস্যার মাহাত্ম্যবশত, তিনি এই 'গৌঙ্গব' নামক সাম দেখেছিলেন এবং তার দ্বারা তিনি অন্নের অত্তা বা ভোক্তা হয়েছিলেন। অন্ন লাভ করে তিনি শব্দ করেছিলেন। যেহেতু অব্যক্ত শব্দ করেছিলেন তাই গৌঙ্গব সামের গৌঙ্গবত্ব অর্থাৎ গৌঙ্গব এই নাম হয়েছে।

নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনটির আলোচনা থেকে জানা যায় গৌঙ্গব শব্দের উৎপত্তিতে 'অগর্দত্' ও 'অগঙ্গূষত্' এই দুই ক্রিয়াপদের বিশেষ ভূমিকা বিদ্যমান। সায়ণাচার্যের ভাষ্যে দেখা যায় যে, 'অগর্দযত্' এই ক্রিয়াপদের অর্থ 'শব্দমকরোত্' অর্থাৎ 'গর্দ শব্দে' (গর্দ শব্দে ভ্বাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ৫৭) ধাতুটি এই ক্রিয়াপদের মূলস্বরূপ। একইরকমভাবে 'অগঙ্গূষত্' ক্রিয়াপদের মূল '*গঙ্গ অব্যক্তে শব্দে*। অতএব এই দুই ধাতু থেকেই 'গৌঙ্গব' শব্দের উৎপত্তি বলা যায়। 'গর্দ' ধাতুর সাথে 'গৌঙ্গব' শব্দের 'গ' এই ব্যঞ্জনগত সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকায় বলা যায় এটি একটি 'অতিপরোক্ষ শ্রেণীর নির্বচন'।

চ্যাবন

'চ্যাবন' নামক তৃচ সমন্বিত সামের আলোচনাকালে 'চ্যাবন' শব্দের নির্বচন করা হয়েছে। বৃষ্টি ক্ষরণের হেতুভূত হওয়ায় 'চ্যাবন' এই সংজ্ঞা। নির্বচনটি হল-

এভ্যো বৈ লোকেভ্যো বৃষ্টিরপাক্রামত্তাং প্রজাপতিশ্চ্যাবনেনাচ্যাবযদ্যদচ্যাবযত্তচ্চ্যাবনস্য চ্যাবনত্বম্।[৩৭]

প্রাচীনকালে এই তিন লোক থেকে বৃষ্টি চলে যায় বা বর্ষণ বন্ধ হয়ে যায়। সেই অপগত বৃষ্টিকে প্রজাপতি এই সামের দ্বারা বর্ষণ করিয়েছিলেন। তাই এই সামের নাম চ্যাবন।

সায়ণাচার্যের প্রাসঙ্গিক উক্তিটি হল- "প্রজাপতিশ্চ্যাবনেন সাম্না অচ্যাবযত্ অক্ষারযত্ সর্বতঃ প্রাবর্ষত্"।[৩৮]

নির্বচনপদ্ধতি

যেহেতু এর দ্বারা প্রজাপতি বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলেন তাই বলা যায় √চ্যু ধাতুর (চ্যুঙ্ গতৌ ভ্বাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠঃ ৯৫৫) উত্তর 'ণিচ্' প্রত্যয় যুক্ত করে 'চ্যাবয্' রূপটি পাওয়া যায় এবং পরবর্তীকালে 'ল্যুট্' প্রত্যয় যুক্ত করে প্রাপ্ত 'চ্যাবযন' শব্দের যকারের লোপ ঘটিয়ে 'চ্যাবন' পদটি নিষ্পন্ন করা যায় (√চ্যু ধাতু + ণিচ্ + ল্যুট্ = চ্যাবযন > চ্যাবন)।

নির্বচনটি বিশ্লেষণের দ্বারা অনুমান করা যায় 'চ্যাবন' শব্দটি সামের (স্তোমের) বাচক। শব্দটির নিষ্পত্তিতে ব্যাকরণগত শব্দগঠন প্রক্রিয়াই যথেষ্ট নয়, এর সাথে 'বর্ণলোপ' এই ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়মের বিশেষ প্রয়োগও লক্ষ্য করা যায়। অতএব বলা যায় নির্বচনটি যাস্কীয় পরোক্ষনির্বচনপদ্ধতির অন্তর্গত।

ত্রিককুভ্

তাণ্ড্যব্রাহ্মণে পশু কামনায় ব্রাহ্মণাচ্ছংসি সাম রূপে ত্রিককুভাখ্য সাম বিহিত হয়েছে। বিধানকালে সামটি নির্বচন দ্বারা প্রশংসা করা হয়েছে। নির্বচনটি হল-

ইন্দ্রো যতীন্ সালাবৃকেভ্যঃ প্রাযচ্ছত্তেষাং এয উদশিষ্যন্ত রাযো বাজো বৃহদ্দিারিঃ পৃথুরশ্মি-স্তেঽব্রুবন্ কো নঃ পুত্রান্ ভরিষ্যতী-ত্যহমিতীন্দ্রোঽব্রবীত্তাংস্ত্রিককুধিনিধাযাচরৎস এতৎসামা-পশ্যদ্যৎত্রিককুবপশ্যত্তস্মাত্রৈককুভম্।[৩৯]

(পূর্বে) ইন্দ্র বেদবিরুদ্ধ নিয়মগ্রহণকারীদের বধের জন্য বন্য অশ্বদের উদ্দেশ্যে দান করেন। তাদের মধ্যে রায়, বাজ প্রভৃতি তিনজন সেখান থেকে পালিয়ে শিষ্ট হয়ে বলেছিলেন কোন মহান ব্যক্তি আমাদের পুত্রের মত রক্ষা করবেন। তখন ইন্দ্র বলেন তিনি রক্ষা করবেন। তিনি অবশিষ্ট তিনজনকে 'ত্রিককুপ্' নামক উচ্ছ্রিত প্রদেশে স্থাপন করেন। তখন তিনি এই সাম দেখতে পান। যেহেতু 'ত্রিককুপ্' অবস্থায় দেখেছিলেন তাই 'ত্রিককুভ্' নাম সম্পন্ন হয়।

নির্বচনপদ্ধতি

"যত্ ত্রিককুপ্ সন্নপশ্যত্তস্মাদেতত্ সংজ্ঞকমভবত্"[৪০]- সায়ণাচার্যের এই উক্তি থেকে বলা যায় 'ত্রিককুপ্' শব্দ থেকে 'ত্রিককুভ্' শব্দের উৎপত্তি। এখানে 'ত্রিককুপ্' শব্দস্থিত 'প্' এই বর্গের প্রথম বর্ণটি 'ভ্' এই তৃতীয় বর্ণে রূপান্তরিত হয়ে 'ত্রিককুভ্' এই পদটি সিদ্ধ হয়েছে অর্থাৎ ত্রিককুপ্ > ত্রিককুভ্। অতএব নির্বচনটি পরোক্ষনির্বচন শ্রেণির অন্তর্গত।

ত্রৈশোক

দীর্ঘমেয়াদি রোগ থেকে মুক্তির জন্য 'ত্রৈশোক' নামক সাম প্রয়োগের বিধান দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থে 'ত্রৈশোক' শব্দটি নির্বচন উল্লেখের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে। নির্বচনটি হল-

ইমে বৈ লোকাঃ সহাসংস্তেঽশোচংস্তেষামিন্দ্র এতেন সাম্না শুচমপহন্যৎত্রযাণাং শোচতামপাহংস্তস্মাৎত্রৈশোকম্।[৪১]

অর্থাৎ পূর্বে (পৃথিব্যাদি) তিন লোক একসাথেই অবস্থিত ছিল। তারা (হবির্লাভ, বৃষ্টি প্রদান প্রভৃতি পরস্পর উপকার সাধনের দ্বারা) শোকমুক্ত ছিলেন। ইন্দ্র এই 'ত্রৈশোক' সামের দ্বারা তাদের দুঃখ দূর করেন। যেহেতু শোকত্রয় দূর করেছিলেন তাই 'ত্রৈশোক' এই সংজ্ঞা লাভ করে।

নির্বচনপদ্ধতি

সায়ণাচার্যের মতানুসারে "শোকত্রযাপনোদেন ত্রৈশোকসংজ্ঞামলভত"[৪২] অর্থাৎ 'ত্রৈশোক' শব্দের নির্বচন থেকে সহজেই অনুমান করা যায় 'ত্রি' এই সংখ্যাবাচক শব্দের সাথে 'শুচ্ ধাতু' যুক্ত হয়ে 'ত্রৈশোক' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে অর্থাৎ 'ত্রি-√শুচ্ ধাতু+ঘঞ্ = ত্রৈশোক'। 'ত্রৈশোক' শব্দের নির্বচন অনুসারী ব্যুৎপত্তি ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তিরই অনুরূপ। অতএব নির্বচনটি প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতির অন্তর্গত।

দ্যৌঃ (দ্যুলোক)

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণস্থিত 'দ্যৌঃ' শব্দের নির্বচনটি যথা-

> হো ইতি তৃতীযমূর্দ্ধমুদাস্যত্ তত্ দ্যৌরভবদদ্যুতদিব বা অদইতি তদ্দিবো দিবত্বম্।[৪৩]

ভূমি ও অন্তরীক্ষবাচক শব্দদুটি নির্মাণ করে বাক্-এর তৃতীয়ভাগ 'হো' (হ) এই শব্দ উচ্চারণ করেন। সেই উচ্চারিত 'হো' (হ) এই শব্দ ঊর্ধদেশবাচক হয়ে 'দ্যৌঃ' হয়েছিল। (তখন প্রজাপতি এইরূপ চিন্তা করলেন আহা! দ্যুলোকরূপ বস্তু) চন্দ্রসূর্যাদি আলোর ন্যায় দ্যোতমান হচ্ছে। যেহেতু দ্যোতমান বা আলোকময় হয়েছিল তাই দ্যুলোকের দিবত্ব বা দ্যুলোকত্ব, দ্যুলোক এই নাম সম্পাদিত হয়।

নির্বচনপদ্ধতি

'দ্যৌঃ' শব্দের নির্বচনটি পর্যালোচনার দ্বারা বোঝা যায় যে, শব্দটির ব্যুৎপত্তিতে 'অদ্যুতত্' এই ক্রিয়াপদের বিশেষ ভূমিকা বিদ্যমান। আচার্য সায়ণ বলেছেন- "অদ্যুতদিব চন্দ্রসূর্যাদিপ্রকাশো দ্যোতমানমেবেতি যস্মাদেবং তস্মাত্ দ্যুলোকস্য দিবত্বং দ্যুনামকত্বং সম্পন্নম্"।[৪৪] অতএব এটি অনুমেয় যে, √দ্যুত্-ধাতু (*দ্যুত দীপ্তৌ*, ভ্বাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ৭৪১) থেকে 'দ্যৌঃ' শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে। ধ্বন্যাত্মক আধারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এটি পরোক্ষনির্বচনপদ্ধতির অন্তর্গত।

পর

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে পঞ্চমাধ্যায়ে 'পর' নামক স্বরসামের নির্বচনটি হেতুকথনের দ্বারা উল্লিখিত হয়েছে। নির্বচনটি হল-

> পরৈর্বৈ দেবা আদিত্যং স্বর্গং লোকমপারযন্, যদপারযংস্তত্ পরাণাং পরত্বম্।[৪৫]

অর্থাৎ 'পর' শব্দের দ্বারা অভিহিত সামের দ্বারা দেবতারা আদিত্যকে স্বর্গলোকে পৌঁছে দিয়েছিলেন। যেহেতু প্রাপ্ত করিয়েছিলেন তাই 'পর' শব্দের পরত্ব।

নির্বচনপদ্ধতি

'পর' শব্দ √পৃ-ধাতু (*পৃ পূরণে*, চুরাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১৫৪৮) নিষ্পন্ন বলা যায় কারণ এর দ্বারাই দেবতারা আদিত্যকে স্বর্গ প্রাপ্ত করিয়েছিলেন। শব্দটির ব্যুৎপত্তি হল- √পৃ + অচ্ = পর। নির্বচনটি ব্যাকরণগত শব্দগঠন প্রক্রিয়ার অনুরূপ এবং ক্রিয়ার সাথে মূল শব্দের অর্থানুসারী ধ্বনিসাম্যও বর্তমান। তাই এটি একটি যাস্কীয় প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতির উদাহরণ।

পরাক্

তাণ্ডমহাব্রাহ্মণ- এর একবিংশ অধ্যায়ের অষ্টম খণ্ডে 'পরাক্' নামক স্বর্গের সাধক ষষ্ঠ ত্রিরাত্র বর্ণনার অবসরে নির্বচন দ্বারা 'পরাক্' সাম প্রশংসিতও হয়েছে। নির্বচনটি হল-

> যদ্বা এতস্যাকন্তদস্য পরাক্ তত্ পরাক্তস্য পরাক্ত্বম্।[৪৬]

যেহেতু এই ভূলোকের অর্থাৎ ভূলোকস্থিত পুরুষের (ত্রিরাত্রানুষ্ঠানের দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তির ফলে) দুঃখ পরাগভূত হয়েছিল অতএব এটিই পরাকের পরাক্ত্ব সিদ্ধ করে।

নির্বচনপদ্ধতি

সায়ণাচার্যের মতে "পরাগভূতমকন্দুঃখং ত্রিরাত্রেণ ভবতি পরাগিত্যুৎপত্তিঃ"।[৪৭] এখানে 'অকম্' শব্দের অর্থ 'দুঃখ'। এই সামের দ্বারা পুরুষের দুঃখ পরাগভূত হয় বা কম হয়। অতএব বলা যায়, 'পরাগভূতম্ অকম্ যেন তৎ' এই বিগ্রহ দ্বারা পরাককম্' শব্দ পাওয়া যায় তারপর 'পরাককম্' শব্দ বর্ণলোপের দ্বারা 'পরাক্' শব্দে রূপান্তরিত হয়। ধ্বনিপরিবর্তনের নিয়ম লক্ষিত হওয়ায়, অনুমান করা যায় এটি যাস্কীয় পরোক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে কৃত নির্বচন।

বৃহৎ

'বৃহৎ একটি সাম'। এই সামের বর্ণনাকালে 'বৃহৎ' শব্দের উৎপত্তি নির্বচনসহ প্রদর্শিত হয়েছে। নির্বচনটি হল-

> ততো বৃহদনু প্রাজাযত বৃহন্মর্যা ইদং স জ্যোগন্তরভূদিতি তদ্বৃহতো বৃহত্বম্।[৪৮]

অর্থাৎ তারপর রথন্তরসাম সৃষ্টির পর 'বৃহৎসাম' জাত হয়েছিল, (ইন্দ্র বলেছিলেন) হে মর্য! এই বৃহৎসাম চিরকাল অর্থাৎ রথন্তরসাম উৎপত্তির অনন্তরকাল পর্যন্ত প্রজাপতির মনে বিদ্যমান ছিল। এখানেই বৃহৎসামের বৃহত্বম্।

নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনস্থিত 'জ্যোক্' শব্দের সায়ণাচার্য অর্থ করেছেন "চিরকালম্ রথন্তরোৎপত্ত্যনন্তরকালপর্যন্তম্"[৪৯] অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান সময়ের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। অতএব 'বৃহ বৃদ্ধৌ' (*বৃহ বৃদ্ধৌ* ভ্বাদিগণ পাণিনীয়ধাতুপাঠ ৭৩৫) ধাতু থেকে 'বৃহত্' শব্দের উৎপত্তি বলা যায়। শব্দটির উৎপত্তি ব্যাকরণসম্মত এবং 'বৃহত্' শব্দের সাথে √বৃহ্ ধাতুর অর্থগত ও ধ্বনিগত উভয় সাম্যই বিদ্যমান। অতএব প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে নির্বচনটি প্রদর্শিত হয়েছে।

ভাস

'ভাস' নামক সাম "পবস্ব দেব..." ইত্যাদি তৃচে গাওয়া হয়। এই সামের দ্বারা স্তুতবান ব্যক্তি যশোযুক্ত হয়। *তাণ্ডমহাব্রাহ্মণে* এই 'ভাস' নামক সামের বিধানকালে শব্দটির নির্বচন করা হয়েছে। সেটি হল-

> স্বর্ভানুর্বা আসুর আদিত্যং তমসাবিধ্যত্ স ন ব্যরোচত তস্যাত্রির্ভাসেন তমোঽপাহন্ স ব্যরোচত যদ্বৈ তদ্ভা অভবত্তদ্ভাসস্য ভাসত্বম্।[৫০]

অর্থাৎ অসুর বংশে জাত স্বর্ভাণু নামক অসুর সূর্যকে অন্ধকারে আচ্ছাদিত করেছিল। তখন সূর্য দীপ্যমান হতে পারছিলনা। অত্রি নামক ঋষি এই 'ভাস' সামের দ্বারা অন্ধকার দূর করেছিলেন। তারপর সূর্য ভাস্বর বা দীপ্যমান হয়। ভাসসাধনত্ব হেতু 'ভাস' নামক সামের ভাসত্ব।

নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনটি বিশ্লেষণ থেকে 'ভাস' শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে একাধিক অনুমান করা যায়। প্রথমত নির্বচনের অন্তিমাংশে বলা হয়েছে- 'যদ্বৈ তদ্ভা অভবত্তদ্ভাসস্য ভাসত্বম্'। এখানে উল্লিখিত 'ভা' এই শব্দ থেকে 'ভাস' শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে অনুমান করা যায়। √ভা-ধাতুর অন্তর্গত 'ভা' এর সাথে 'ভাস' শব্দের আদ্যংশের বর্ণাক্ষরগত সাদৃশ্য বিদ্যমান। অতএব এটি অতিপরোক্ষ নির্বচন শ্রেণির অন্তর্গত। দ্বিতীয়ত, নির্বচনের পূর্বাংশে স্থিত 'ব্যরোচত' ক্রিয়াপদের অর্থ করা হয়েছে 'অদীপ্যত' ও 'বিশেষেণ দীপ্তো অভবত্'। √ভাস্-ধাতুর অর্থও দীপ্ত হওয়া। তাই ক্রিয়াপদের সাথে অর্থগত সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকায় ধাতুটি (*ভাসৃ দীপ্তৌ* ভ্বাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ৬২৪) 'ভাস' শব্দের উৎপত্তির কারণ বলা যায়। এক্ষেত্রে ধ্বনিগত ও অর্থগত উভয় সাম্যই বজায় থাকে। এর দ্বারা নির্বচনটি পরোক্ষনির্বচনপদ্ধতির অন্তর্গত হিসাবে প্রতিপন্ন হয়।

ভূমি

বাক্ এর অন্তর্গত অক্ষরত্রয় দ্বারা লোকত্রয় সৃষ্টির বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রথমেই ভূমির উৎপত্তি নির্বচন সহকারে বর্ণিত হয়েছে, নির্বচনটি হল-

> তৃতীযমচ্ছিনত্তদ্ভূমিরভবদভূদিব বা ইদমিতি তদ্ভূমের্ভূমিত্বম্।[৫১]

(বেদশাস্ত্র ও লৌকিকভাষারূপী বাক্ থেকে বক্তাদের গান অংশরূপ ভাগের অপেক্ষা না করেই) প্রজাপতি (অকাররূপ) তৃতীয়ভাগটি পৃথক্ করলেন। সেটিই (বাক্যার্থরূপ) ভূমি হয়েছিল। (সেটিই প্রজাপতির কল্পনা দ্বারা) পূর্বে অবিদ্যমান ছিল, এখন বিদ্যমান আছে এরকম পৃথিবীরূপ 'ভূমি' হয়েছিল। এখানেই 'ভূমি' শব্দের ভূমিত্ব।

নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনটি পর্যালোচনার দ্বারা জানা যায় 'ভূমি' শব্দের উৎপত্তিতে 'অভূত্' এই ক্রিয়াপদের বিশেষ ভূমিকা বিদ্যমান। সায়ণাচার্যের মতে- "অস্যা ভূমেরভূদিতি ব্যুৎপত্ত্যা ভূমি নাম সম্পন্নম্" [৫২]। অতএব এখানে √ভূ-ধাতু (*ভূ সত্তাযাম্*, ভ্বাদিগণ ১) 'ভূমি' শব্দের উৎস অর্থাৎ 'ভূ সত্তাযাম্' ধাতুর উত্তর 'মি' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'ভূমি' পদটি সিদ্ধ হয় (√ভূ-ধাতু + মি-প্রত্যয় = ভূমি)। লক্ষণশাস্ত্র অনুসারেও 'ভূমি' শব্দটি পূর্বোক্ত উপায়েই নিষ্পন্ন করা যায়। এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক উণাদি সূত্রটি হল- 'ভুবঃ কিত্' (উণাদিসূত্র ৪/৪৬)। অতএব প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে 'ভূমি' শব্দটি নির্বচিত হয়েছে।

মহাব্রত

এই ব্রাহ্মণগ্রন্থে 'মহাব্রত' শব্দের নির্বচনটি আখ্যায়িকা সহযোগে বর্ণিত হয়েছে। গবাময়ন যাগের উপান্ত্য দিবস মহাব্রত নামে পরিচিত। এই দিনের অনুষ্ঠেয় বর্ণনাকালেই শব্দটির একাধিক নির্বচন করা হয়েছে। সেগুলি যথা-

> প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত সোঽরিচ্যত সোঽপদ্যত তং দেবা অভিসমগচ্ছন্ত তেঽব্রুবন্মহদস্মৈ ব্রতং সংভরাম যদিমন্ধিনবদিতি তস্মৈ যৎসংবৎসরমন্নং পচ্যতে তৎসমভরংস্তদস্মৈ প্রাযচ্ছংস্তদব্রজযত্তদেনমধিনোন্মহন্মর্যা ব্রতং যদিমমধিন্বীদিতি তন্মহাব্রতস্য মহাব্রতত্বম্।[৫৩]
>
> প্রজাপতির্বাব মহাংস্তস্যৈতদ্ব্রতমন্নমেব।[৫৪]

অর্থাৎ প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করে ক্ষীণ ও ক্লান্ত হয়ে যান। তখন দেবতারা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন এই (ক্ষীণ ও ক্লান্ত) প্রজাপতির জন্য মহৎ ব্রতরূপ অন্ন ধারণ করা হোক। এই বলে সংবৎসরাখ্য অন্ন পাক করা হয় এবং প্রজাপতির উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হলে তিনি তা ভক্ষণ করেন। ভক্ষিত সেই অন্ন প্রজাপতিকে

তর্পণ করে, (তারপর দেবতারা বলেন) হে মর্যা, যেহেতু প্রজাপতিকে এই মহান ব্রত(অন্ন) তর্পণ করা হয়েছিল তাই এটি 'মহাব্রত', এখানেই মহাব্রতের মহাব্রতত্ব।

এছাড়াও দ্বিতীয় নির্বচনে বলা হয়েছে প্রজাপতি (সকলের থেকে) মহান, অন্নই অন্নবৎ তৃপ্তিকারকই তাঁর এই ব্রত অর্থাৎ কর্ম, (তাই মহাব্রত)।

নির্বচনপদ্ধতি

উভয় নির্বচনে যথাক্রমে 'মহদ্ব্রতম্' ও 'মহতোঃ (মহান্ তস্য) সম্বন্ধি ব্রতম্' থেকে জ্ঞাত হওয়া যায় যে 'মহত্' ও 'ব্রত' এই দুই শব্দ মিলিত হয়ে 'মহাব্রত' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। উভয় নির্বচনেই যথাক্রমে 'মহদ্ ব্রতম্ যত্ তত্' এবং 'মহতঃ ব্রতম্' এইভাবে বহুব্রীহি ও ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসরূপ ব্যাকরণ প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। অতএব নির্বচনটি প্রত্যক্ষনির্বচন শ্রেণির অন্তর্গত।

যৌধাজয়

তাণ্ডমহাব্রাহ্মণ-এর সপ্তমাধ্যায়ে বিভিন্ন সাম সম্পর্কে আলোচনাকালে 'যৌধাজয়' সামের বিবরণ দেখা যায়। সেখানেই ইন্দ্রের সাথে 'যৌধাজয়' সামের সম্বন্ধ আলোচনার পর শব্দটি নির্বচন দ্বারা প্রশংসা করা হয়। এক্ষেত্রে দুটি নির্বচন প্রদর্শিত হয়েছে। প্রথমটি হল-

> ইন্দ্রো বৈ যুধাজিত্তস্যৈতদ্যৌধাজযম্।[৫৫]

অর্থাৎ ইন্দ্র যুধাজিৎ অর্থাৎ তিনি যুদ্ধের দ্বারা শত্রুদের জয় করেন, তাঁর সাথে সম্বন্ধযুক্ত সাম যৌধাজয় নামে পরিচিত।

দ্বিতীয়নির্বচনটি হল-

> যুধা মর্যা অজৈষ্মেতি তস্মাদ্যৌধাজযম্।[৫৬]

অর্থাৎ (ইন্দ্র বলেছিলেন), হে মর্ত্যবাসী! যুদ্ধের দ্বারা আমরা অসুরদের জয় করেছিলাম। তাই 'যৌধাজয়' এই নাম হয়েছে।

নির্বচনপদ্ধতি

উভয় নির্বচন থেকেই অবগত হওয়া যায় যে, 'যুধা' শব্দের সাথে √জি-ধাতুর (*জি জযে,* ভ্বাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ৫৬১) যোগে 'যৌধাজয়' পদটি সিদ্ধ হয়েছে। 'যুধা' শব্দপূর্বক জি-ধাতুর উত্তর 'অচ্'-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে পদটি সৃষ্টি হয়। পুনরায় এই শব্দের সাথে 'অণ্' প্রত্যয় যুক্ত করে 'যৌধাজয়' পদটি নিষ্পন্ন হয় (যুধাজয় + অণ্ > যৌধাজয়)। নির্বচনটি ব্যাকরণসম্মত উপায়ে প্রদর্শিত হয়েছে। অতএব বলা যায়, নির্বচনটি প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতির অন্তর্গত।

রথন্তর

'রথন্তর' সামের বর্ণনা *তাণ্ডমহাব্রাহ্মণ* গ্রন্থে পাওয়া যায়। প্রজাপতি বাক্ সৃষ্টির পর 'রথন্তর' সাম সৃষ্টি করেন। এই রথন্তর শব্দের নির্বচন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

> রথম্মর্যাঃ ক্ষেপ্লাতারীদিতি তদ্রথন্তরস্য রথন্তরত্বম্।[৫৭]

অর্থাৎ (ইন্দ্র বলেছিলেন), হে মর্য! দেবতাদের (রথ) বাহকভূত বাক্ বা বাণীর পশ্চাৎ এই সাম অতি শীঘ্র গমন করেছিল। এইভাবেই ইন্দ্রের এই প্রকার উক্তির দ্বারাই রথন্তরের রথন্তরত্ব সম্পন্ন হয়।

নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনটি বিশ্লেষণের দ্বারা 'রথম্ তরতি ইতি রথন্তর' এইরূপ বিগ্রহ দ্বারা 'রথ' শব্দ পূর্বক √তৃ-ধাতু (*তৃ প্লবনতরণয়োঃ*, ভ্বাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ৬৯৬) থেকে 'রথন্তর' পদটি ব্যুৎপন্ন করা যায়। ব্যাকরণানুসারে শব্দটির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হওয়ায় এটি প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতির অন্তর্গত বলা যায়।

রৌরব

রৌরব সামের স্তুতি প্রসঙ্গে প্রথমেই 'রৌরব' শব্দের সাথে অগ্নির সম্বন্ধ নিরূপণ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে- "অগ্নির্বৈরূরস্তস্যৈতদ্রৌরবম্"।[৫৮]

অগ্নিই রূর, রূরু শব্দ করতে করতে দহন করেন বলে এই নাম। অগ্নির সাথে সম্বন্ধবশাৎ রৌরব সাম। এখানে 'রূর' শব্দের সাথে 'অণ্' প্রত্যয় যুক্ত করে 'রৌরব' পদটি সিদ্ধ করতে পারি (রূর + অণ্ = রৌরব)।

তারপর প্রকারান্তরে নির্বচন দ্বারা স্তুতি করা হয়েছে। সেটি হল-

> অসুরা বৈ দেবান্ পর্যযতন্ত তত এতাবগ্নীরূপো বিষ্বঞ্চৌ স্তোভাবপশ্যত্তাভ্যামেনান্ প্রত্যৌষত্তে প্রত্যুষ্যমাণা অরবন্ত যদরবন্ত তস্মাদ্রৌরবম্।[৫৯]

অর্থাৎ অসুর ও দেবতারা যুদ্ধ করছিলেন। তখন অগ্নির এই দুই 'রূ' ও 'রূ' সর্বদিকে ব্যাপ্ত হয়ে স্তোভদ্বয়কে দেখতে পান এবং তাদের দ্বারা এদের দহন করেন। দগ্ধ অবস্থায় তারা শব্দ করছিল। যেহেতু শব্দ করেছিল তাই 'রৌরব' এই নাম প্রাপ্ত হয়।

নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনটি বিশ্লেষণ করে শব্দার্থক √রু-ধাতু থেকে (*রু শব্দে*, অদাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১০৩৪) 'রৌরব' শব্দটি সিদ্ধ করা যায়। সায়ণাচার্যের মতে- "রূরূরবযোরুভয়ত্র রেফসাম্যাৎ রূরসম্বন্ধাৎ রবসম্বন্ধাচ্চ রৌরবমিতি নাম ভবতি"[৬০] অর্থাৎ এখানে অতিপরোক্ষনির্বচনপদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

বাজজিৎ

তাণ্ডমহাব্রাহ্মণে বাজজিৎ-সামের বিধান প্রসঙ্গে 'বাজজিৎ' শব্দের নির্বচন করা হয়েছে, নির্বচনটি হল-

> বাজজিদ্ভবতি সর্বস্যাপ্তৈ সর্বস্য জিত্যৈ সর্বং বা এতে বাজং জযন্তি যে ষষ্ঠমহরাগচ্ছন্তি।[৬১]

অর্থাৎ 'বাজজিৎ' সাম হল সেই সাম যা সমস্তকিছু (অন্নসমূহ) প্রাপ্তির জন্য, যা কিছু জয় করার যোগ্য তা সমস্তই জয় করার জন্য হয়েছিল বা যে যজমান দশরাত্রের অন্তর্গত ষষ্ঠ অহকে প্রাপ্ত হয়, সে এই সব কিছু অন্ন ও জেয় বস্তু জয় করতে পারে।

সায়ণাচার্য 'সর্বস্য' শব্দের দ্বারা 'অন্ন' এবং 'জেতব্য' দুটি অর্থই গ্রহণ করেছেন। তবে তাঁর বিশেষ উক্তিটি হল-"বাজমন্নং জযত্যনেনেতি বাজজিৎ"।[৬২]

নির্বচনপদ্ধতি

'বাজজিৎ' শব্দের নির্বচনটি যাস্কানুসারি ব্যাকরণপ্রক্রিয়ানুগত প্রত্যক্ষ-নির্বচন শ্রেণির অন্তর্গত বলা যায় কারণ এখানে 'বাজজিৎ' শব্দটি বাজ শব্দপূর্বক √জি-ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নিষ্পন্ন হয়েছে। ব্যাকরণগত নিয়মানুসারেও 'বাজজিৎ' শব্দটি বিভাজন করলে পূর্বের অনুরূপ ব্যুৎপত্তিই দৃষ্ট হয় অর্থাৎ 'বাজ' শব্দপূর্বক

√জি-ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্' প্রত্যয় যুক্ত হয় "সৎসূদ্বিষদ্রুহযুজবিদভিদচ্ছিদজিনীরাজামুপসর্গেঽপি ক্বিপ্"[৬৩] এই সূত্রাণুসারে এবং "হ্রস্বস্য পিতি কৃতি তুক্"[৬৪] সূত্রাণুসারে 'তুক্' আগম হয়ে 'বাজজিৎ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়।

বাজপেয়

'বাজপেয়' শব্দের নির্বচনটি উক্ত ব্রাহ্মণগ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ের সপ্তম খণ্ডে প্রথমেই প্রদর্শিত হয়েছে। শুধু তা নয়, বাজপেয়র অধিকারী বিষয়েও দিক্দর্শন করায় এই নির্বচন। এটি হল-

> প্রজাপতিরকাময়ত বাজমাপ্নুয়াং স্বর্গং লোকমিতি স এতং বাজপেয়মপশ্যদ্বাজপেয়ো বা এষ বাজমেবৈতেন স্বর্গং লোকমাপ্নোতি।[৬৫]

অর্থাৎ পেয় দ্রব্যাত্মক বাজ নামক স্বর্গ কামনাকারী প্রজাপতি এই বাজপেয় যাগ দেখেছিলেন। বাজপেয় হল সেই যজ্ঞ যার দ্বারা স্বর্গলোক লাভ করেছিলেন।

নির্বচনপদ্ধতি

'বাজপেয়' শব্দের নির্বচন থেকে অনুমান করা যায় যে, 'বাজ' শব্দ পূর্বক √আপ্-ধাতু থেকে 'বাজপেয়' শব্দটি ব্যুৎপন্ন হয়েছে। তবে ব্যাকরণ অনুসারে শব্দটি 'বাজ' শব্দপূর্বক √পা-ধাতুর উত্তর 'যত্'-প্রত্যয় সংযুক্ত করে ব্যুৎপন্ন হয় (বাজ – √পা-ধাতু + 'যত্' = বাজপেয়)। অতএব বলা যায় 'বাজপেয়' শব্দটির যাস্কীয় পরোক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে নির্বচন করা হয়েছে।

বিঘন

ঊনবিংশ অধ্যায়ে 'বিঘন' নামক দ্বিতীয় নিধনকারী যজ্ঞের বিধানকালে প্রথমেই 'বিঘন' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হয়েছে-

> ইন্দ্রমদেব্যো মায়া অসচন্ত স প্রজাপতিমুপাধাবত্তস্মা এতং বিঘনং প্রাযচ্ছত্তেন সর্বামৃধো ব্যহত যদ্ব্যহত তদ্বিঘনস্য বিঘনত্বম্।[৬৬]

অর্থাৎ অদেব্য মায়া পরিহারের জন্য ইন্দ্র প্রজাপতির নিকট গমন করেন। তিনি তাঁকে এই বিঘন নামক ক্রতু বা যজ্ঞ প্রদান করেন। সেই ক্রতুর দ্বারা ইন্দ্র সকল শত্রুকে হত্যা করেন। যেহেতু এই ক্রতুর দ্বারা হত্যা করেছিলেন তাই 'বিঘন' এই নাম প্রাপ্ত হয়।

এছাড়াও এই অধ্যায়ের অষ্টাদশ খণ্ডে 'বিঘন' ক্রতুর বিধানকালে 'বিঘন' নামের নিমিত্ত সূচিত হয়েছে, সেটি হল-

> ইন্দ্রোঽকাময়ত পাপ্মানং ভ্রাতৃব্যং বিহন্যামিতি স এতং বিঘনমপশ্যত্তেন পাপ্মানং ভ্রাতৃব্যং ব্যহন্।[৬৭]

অর্থাৎ পূর্বে ইন্দ্র পাপরূপ শত্রুকে হত্যা করার কামনা করেছিলেন। (তখন) তিনি এই বিঘনকে (নামক ক্রতুকে) দর্শন করেন। তার দ্বারাই তিনি পাপরূপ শত্রুকে হত্যা করেছিলেন।

নির্বচনপদ্ধতি

উভয় নির্বচনেই 'ব্যহত' এই ক্রিয়াপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভাষ্যকার 'ব্যহত' শব্দের অর্থ করেছেন 'বিশেষেণ হতবান্'। অতএব 'বি' এই উপসর্গ পূর্বক √হন্-ধাতু থেকে বিঘন শব্দের উৎপত্তি হয়েছে (বি–√হন্-ধাতু > বিঘন)। আবার দ্বিতীয় নির্বচনে ভাষ্যকার সায়ণ বলেছেন- "বিহননহেতুত্বাদস্য বিঘননামকত্বম্"।[৬৮] অতএব 'বিহন > বিঘন' এইভাবেও শব্দটি সিদ্ধ করা যায় অর্থাৎ 'হ'-কার 'ঘ'-কারে রূপান্তরিত হয়ে বর্ণবিকার রূপ

ভাষাগত নিয়মের দ্বারা 'বিঘন' পদটি নির্বচিত হয়েছে। অতএব নির্বচনটিতে পরোক্ষনির্বচনপদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

বিলম্বসৌপর্ণ

'বিলম্বসৌপর্ণ' একটি সামের নাম। উক্ত ব্রাহ্মণ গ্রন্থের চতুর্দশ অধ্যায়ে সামটির সংজ্ঞা নিরূপণপূর্বক স্তুতি করা হয়েছে, সেটি হল-

> আত্মা বা এষ সৌপর্ণানাং যদষ্টমেঽহনি পক্ষাবেতাবভিতো ভবতো যে সপ্তমনবমযোর্বীব বা অন্তরাত্মা পক্ষৌ লম্বতে যদন্তরাত্মা পক্ষৌ বিলম্বতে তস্মাদ্বিলম্বসৌপর্ণম্।[৬৯]

অর্থাৎ সৌপর্ণসামসমূহের মধ্যে এই সাম (বিলম্বসৌপর্ণসাম) আত্মাস্বরূপ। মধ্যদেহস্থানীয় এই সাম সপ্তম ও নবম দিনের মধ্যবর্তী অষ্টম দিনে বিনিযুক্ত হয়। পক্ষভূত সৌপর্ণদ্বয়ের মধ্যে আত্মভূত এই সৌপর্ণ বিলম্বিত বা বিশেষরূপে লম্বমান হয়। যেহেতু সৌপর্ণদ্বয়ের মধ্যে আত্মভূত এই সৌপর্ণ বিলম্বিত হয় সেহেতু এই সামের নাম 'বিলম্বসৌপর্ণ'।

নির্বচনপদ্ধতি

উক্ত নির্বচন অনুসারে 'বিলম্বসৌপর্ণ' শব্দটিকে 'বিলম্বমানম্ সৌপর্ণম্ যত্ তত্ = বিলম্বসৌপর্ণম্' এইরূপে বিগ্রহ দ্বারা সমাসান্ত হিসাবে নিষ্পন্ন করা যায়। এছাড়াও 'বিলম্ব' শব্দটিকে 'বি' এই উপসর্গ পূর্বক √লম্ব্-ধাতু থেকে নিষ্পন্ন করা যায়। অতএব অনুমান করা যায় শব্দটি ব্যাকরণগত শব্দগঠন প্রক্রিয়া অনুসারেই নির্বচন করা হয়েছে।

বিশ্বজিৎ

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে একাধিক স্থানে 'বিশ্বজিৎ' শব্দের নির্বচন দৃষ্ট হয়। ষোড়শ অধ্যায়ে বিশ্বজিৎ যাগের প্রয়োজন উল্লেখের দ্বারা শব্দটির নির্বচন করেছেন-

> ততো বা ইদমিন্দ্রো বিশ্বমজযদ্যদ্বিশ্বমজযত্তস্মাদ্বিশ্বজিৎ।[৭০]

অর্থাৎ তারপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভের পর দেবরাজ ইন্দ্র (স্রগ্রূপে অবস্থিত এই যজ্ঞের দ্বারা) জগৎ জয় করেন। যেহেতু জগৎ জয় করেছিলেন তাই এই যজ্ঞের নাম 'বিশ্বজিৎ'।

আবারা বাইসতম অধ্যায়ে বলা হয়েছে-

> বিশ্বজিতা বিশ্বমজযন্।[৭১]

অর্থাৎ 'বিশ্বজিৎ' যাগের দ্বারা বিশ্বকে জয় করেছিলেন।

নির্বচনপদ্ধতি

উভয় ক্ষেত্রেই 'বিশ্বজিৎ' শব্দের নির্বচন থেকে শব্দটির ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে সহজেই জ্ঞান লাভ করা যায়। উভয় ক্ষেত্রেই বিগ্রহরূপে 'বিশ্বমজযদ্' ও 'বিশ্বমজযন্' এই দুই বাক্যাংশ পাওয়া যায়। অতএব বলা যায় 'বিশ্ব' শব্দ পূর্বক '*জি জযে*' ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'বিশ্বজিৎ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। এখানে ব্যাকরণগত শব্দগঠন প্রক্রিয়া অনুসারেই নির্বচনটি করা হয়েছে। কারণ ব্যাকরণগত নিয়মানুসারেও 'বিশ্বজিৎ' শব্দটি বিভাজন করলে পূর্বের অনুরূপ ব্যুৎপত্তিই দৃষ্ট হয় অর্থাৎ 'বিশ্ব' শব্দপূর্বক √জি ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্' প্রত্যয় যুক্ত হয় এবং 'তুক্' আগম হয়ে 'বিশ্বজিৎ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়।

বিশ্বসৃজ্

তাণ্ডমহাব্রাহ্মণ গ্রন্থের অন্তিম অধ্যায়ে 'বিশ্বসৃজ্' নামক সহস্রসংবৎসর সাধ্য সত্রযাগের বর্ণনাকালে এই যাগের অধিকারিনিরূপণ স্বরূপ শব্দটির উৎপত্তি প্রদর্শিত হয়েছে। সেটি হল-

> এতেন বৈ বিশ্বসৃজ ইদং বিশ্বমসৃজন্ত যদ্বিশ্বমসৃজন্ত তস্মাদ্বিশ্বসৃজঃ।[৭২]

অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে এই যাগের অনুষ্ঠানের দ্বারা (সহস্রসংবৎসরসত্রের দ্বারা) দেবতারা বিশ্ব সৃষ্টি করেন। যেহেতু বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন তাই তাঁরা 'বিশ্বসৃজ' এই সংজ্ঞা লাভ করেন।

নির্বচনপদ্ধতি

বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন তাই দেবতারা বিশ্বের স্রষ্টা অর্থাৎ 'বিশ্বসৃজ'। আলোচ্য নির্বচন থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে 'বিশ্ব' শব্দ পূর্বক √সৃজ্-ধাতু' (*সৃজ বিসর্গে,* রুধাদিগণ ১৪১৪) থেকে 'বিশ্বসৃজ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। নির্বচনটি যথার্থ রূপেই ব্যাকরণ সম্মত। অতএব শব্দটি প্রত্যক্ষবৃত্তি শব্দের অন্তর্গত এবং নির্বচনটি যাস্কীয় প্রথমশ্রেণিরনির্বচন পদ্ধতির অন্তর্গত।

শক্করী, সিমা ও মহানাম্ন্য

তাণ্ডমহাব্রাহ্মণ-এর ত্রয়োদশ অধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ডের প্রথমেই হোতার পৃষ্ঠস্তোত্র নিবর্ত্তক 'শক্করী' 'সাম' ও তদ্গত 'সিমা', 'মহানাম্ন্য' সাম নির্বচনসহ বিহিত হয়েছে। নির্বচনগুলি যথাক্রমে-

> ইন্দ্রঃ প্রজাপতিমুপাধাবদ্বৃত্রং হনানীতি তস্মা এতচ্ছন্দোভ্য ইন্দ্রিযং বীর্যং নির্মায প্রাযচ্ছদেতেন শক্নুহীতি তচ্ছক্করীণাং শক্করীত্বম্। সীমানমভিনত্তৎসমা। মহ্ন্যামকরোত্তন্মহ্ন্যা মহান্ ঘোষ আসীৎ তন্মহানাম্ন্যঃ।[৭৩]

অর্থাৎ বৃত্র নামক অসুরকে বধ করব এই বলে ইন্দ্র প্রজাপতির নিকট গিয়েছিলেন। তিনি গায়ত্র্যাদি ছন্দ থেকে সারভূত, বৃত্র হননে সক্ষম সামর্থ্য গ্রহণ করে ইন্দ্রকে দান করেন। এই বলের বা বীর্যের দ্বারা বৃত্রকে হত্যা করতে পারবে এই কথা বলেছিলেন। তাই শক্করীসামসমূহের শক্করীত্ব।

ইন্দ্র বৃত্রাসুরের শিরোমধ্যে বা মাথার মধ্যদেশ বিদীর্ণ করেন। তাই সিমা এই নাম। এই প্রসঙ্গে সায়ণাচার্যের উক্তিটি হল- "তস্মাৎসীন্নোভেদকত্বাত্ সিমা ইতি"।[৭৪] প্রচণ্ড শব্দ করেছিলেন তাই মহানাম্ন্য এই নাম হয়েছিল। সায়ণাচার্য বলেছেন- "মহ্ন্যেত্যনুকরণশব্দোওযং এবং রূপং শব্দমকরোত্ তস্মাদেতাসাং মহ্ন্যা ইতি নাম"।[৭৫]

নির্বচনপদ্ধতি

শক্করী শব্দের নির্বচন প্রসঙ্গে সায়ণাচার্যের উক্তিটি হল- "শক্ন্যুৎপাদকত্বাত্ শক্বর্য্য ইতি নাম"- অর্থাৎ √শক্ ধাতু থেকে 'শক্করী' শব্দের উৎপত্তি। √শক্ ধাতুর সাথে 'শক্করী' শব্দের আদ্যক্ষর শকারের বর্ণগত সাম্য থাকায় এটি অতিপরোক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে কৃত নির্বচন বলা যায়। অনুরূপভাবে সীমন্ > সিমা এবং মহ্ন্যা > মহানাম্ন্য উভয়ত্রই অতিপরোক্ষনির্বচনপদ্ধতি বিদ্যমান।

শ্যৈত

> প্রজাপতি পশূনসৃজত তেঽস্মান্ সৃষ্টা অপাক্রামংস্তানেতেন সান্নাভিব্যাহরত্তেস্মা অতিষ্ঠন্ত তে শেত্যা অভবন্ যচ্ছেত্যা অভবংস্তস্মাচ্ছ্যৈতং পশবো বৈ শ্যৈতম্।[৭৬]

অর্থাৎ প্রজাপতি পশুদের সৃষ্টি করেছিলেন। সৃষ্ট পশুরা সেখান থেকে চলে গিয়েছিল। তাদের এই শ্যৈত সামের দ্বারাই নিজ অভিমুখে আহ্বান করেন। তারপর তারা ব্যাপ্ত হয়। যেহেতু ব্যাপ্ত হয়েছিলেন তাই 'শ্যৈত' এই নাম হয়েছিল। পশুরাই শ্যৈত।

নির্বচনপদ্ধতি

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে অনুমান করা যায় যে, 'শেত্যা' শব্দ থেকে 'শ্যৈত' শব্দ বর্ণবিপর্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়েছে (শেত্যা > শ্যৈত)। অতএব এটি পরোক্ষনির্বচনপদ্ধতির অন্তর্গত।

সফ

গাতব্য সামের বিধানকালে প্রথমেই 'সফ' নামক সামের বর্ণনায় নির্বচন দর্শিত হয়, যেখানে 'সফ' এই নামের কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, সেটি হল-

> সফেন বৈ দেবা ইমান্ লোকান্ সমাপ্লুবন্ যত্যমাপ্লুবংস্তৎসফস্য সফত্বম্।[৭৭]

অর্থাৎ দেবতারা 'সফ' নামক সামের দ্বারাই পৃথিব্যাদি তিন লোক সম্যকভাবে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যেহেতু সম্যকরূপে পেয়েছিলেন, তাই 'সফ' নামক সামের 'সফ' এই সংজ্ঞা।

নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনটির বিশ্লেষণের দ্বারা বলা যায়, 'সম্' এই উপসর্গ পূর্বক √আপ্-ধাতু (*আপ্৯ ব্যাপ্তৌ,* স্বাদিগণ ১২৬০) থেকে 'সফ' শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে (সম্-√আপ্ ধাতু)। অতএব এটি অতিপরোক্ষনির্বচন শ্রেণির অন্তর্গত বলা যায়।

সংকৃতি

সংকৃতি সামের দ্বারা নবমাহের সংস্কার বর্ণনা প্রসঙ্গে 'সংকৃতি' শব্দের নামকরণ প্রদর্শিত হয়েছে। সেটি হল-

> অহর্বা এতদহ্লীযত তদ্দেবা দেবস্থানে তিষ্ঠন্তঃ সংকৃতিনা সমস্কুর্বংস্তত্ সংকৃতেঃ সংকৃতিত্বম্।[৭৮]

এই নবমাহ (যাগ) হিংসা শুরু করলে দেবতারা দেবস্থানে আধারভূত সামে অবস্থান করে এটিকে সংকৃতি সামের দ্বারা সংস্কার করেন। এইজন্য অর্থাৎ সংস্কার সাধনের হেতু হওয়ায় সংকৃতি সামের সংকৃতিত্ব বা সংকৃতি নাম সম্পন্ন হয়।

নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনস্থিত 'সমস্কুর্বন্' এই ক্রিয়াপদ দ্বারা 'সংকৃতি' শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে ধারণা পাওয়া যায়। নির্বচিত শব্দটি 'সম্' এই উপসর্গ পূর্বক √কৃ-ধাতু থেকে ব্যুৎপন্ন করা যায় (সম্-√কৃ ধাতু + 'ক্তিন্' = সংকৃতি)। অতএব ব্যাকরণশাস্ত্রানুমোদিত প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতির অবলম্বনে শব্দটি নির্বচিত হয়েছে।

সঞ্জয়

'সঞ্জয়' সাম পশুপ্রাপ্তির সহায়ক। এই সামের সংজ্ঞাটি আখ্যায়িকা দ্বারা নির্বচিত হয়েছে। সেটি হল-

> দেবাশ্চ অসুরাশ্চ সমদধত যতরে নঃ সঞ্জযাং স্তেষান্নঃ পশবোঽসানিতি তে দেবা অসুরান্ সঞ্জযেন সমজযন্ যৎসমজযংস্তস্মাৎসঞ্জয়ম্।[৭৯]

অর্থাৎ দেবতা এবং অসুররা পশুপ্রাপ্তির আশায় সন্ধি করেন তাদের মধ্যে যারা সম্যকভাবে জয়লাভ করবে তারাই গো প্রভৃতি সমস্ত গবাদি পশুর অধিকারী হবে। এই সন্ধি করে তারা যুদ্ধ শুরু করেন। দেবতারা সঞ্জয় নামক সামের দ্বারা অসুরদের সম্পূর্ণভাবে জয়লাভ করেন বা পরাজিত করেন। যেহেতু এই সামের দ্বারাই জয়লাভ করেছিলেন তাই এই সাম সঞ্জয় নামে অভিহিত হয়েছে।

নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনস্থিত 'সমজয়ন্' এই ক্রিয়াপদ থেকে অনুমান করা যায় যে, 'সম্' উপসর্গ পূর্বক √জি-ধাতু থেকে 'সঞ্জয়' পদটি সিদ্ধ হয় (সম্-*জি জয়ে* ধাতু, ভ্বাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ৯৪৬)। নির্বচনটি ব্যাকরণগত শব্দগঠন প্রক্রিয়ারই অনুরূপ। অতএব বলা যায় 'সঞ্জয়' শব্দটি প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে নির্বচন প্রাপ্ত হয়েছে।

সংহিত

দেবাঃ সংহিতেন সমদধুর্যৎসমদধুস্তস্মাৎসংহিতম্।[৮০]

সংহিতের দ্বারা দেবতারা সম্যকভাবে স্থাপন করেন। যেহেতু সম্যকভাবে স্থাপন করেন তাই সংহিত এই নাম।

নির্বচনপদ্ধতি

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে অনুমান করা যায় যে, 'সম্' উপসর্গ পূর্বক 'ধা' ধাতু থেকে 'সংহিত' পদটি নিষ্পন্ন হয়েছে (সম্-√ধা-ধাতু+ক্ত = সংহিত)। ব্যাকরণগত শব্দগঠন প্রক্রিয়ার অনুরূপ হওয়ায় নির্বচনটি প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতি প্রদর্শিত হয়েছে বলা যায়।

সীদন্তীয়

তাণ্ডমহাব্রাহ্মণ অনুসারে 'সীদন্তীয়সাম' পৃথিব্যাদিলোকত্রয় প্রাপ্তির হেতু স্বরূপ। ব্রহ্মবাদিদের মতে শঙ্কুসাম সীদন্তীয়সাম বাচ্য হয়। এই সাম বাচক শব্দের নির্বচনটি হল-

তদু সীদন্তীযমিত্যাহুরেতেন বৈ প্রজাপতিরূর্ধ ইমান্ লোকানসীদদ্যদসীদত্তৎসীদন্তীযস্য সীদন্তীযত্বম্।[৮১]

অর্থাৎ 'শঙ্কুসাম' সীদন্তীয়সাম নামে অভিহিত হয়, এই সামের দ্বারা প্রজাপতি উর্ধে উত্থিত হয়ে এই দৃশ্যমান পৃথিব্যাদি তিন লোকে গমন করেছিলেন। যেহেতু এই সামের দ্বারাই গমন করেছিলেন সেহেতু 'সীদন্তীয়' সামের 'সীদন্তীয়ত্ব নাম সার্থক হয়েছে।

নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনটির পর্যালোচনার দ্বারা নির্বচনস্থিত 'অসীদত্' এই ক্রিয়াপদ থেকে অনুমান করা যায় যে সীদন্তীয় শব্দটির মূলে অবস্থিত √সদ্-ধাতু (*ষদৃ৯ বিশরণগত্যবসাদনেষু*, ভ্বাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ৮৫৪)। সায়ণাচার্য 'সীদন্ত্যনেনেতি' এই ব্যুৎপত্তির দ্বারা 'সীদন্তীয়ম্' পদটি সিদ্ধ করেছেন। অতএব বলা যায় পদটি প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে নির্বচিত হয়েছে।

সৌভর

তাণ্ডমহাব্রাহ্মণ-এর অষ্টমাধ্যায়ের অষ্টম খণ্ডে অতিরাত্র প্রভৃতিতে সৌভর সামের বিধান আলোচিত হয়েছে। সেখানেই 'সৌভর' শব্দটি নির্বচন দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে, সেটি হল-

তা অব্রুবন্ সভৃতন্নোওভার্ষীরিতি তস্মাৎসৌভরম্।[৮২]

অর্থাৎ অন্ন দ্বারা সমৃদ্ধ প্রজারা (প্রজাপতিকে) বলেন যেহেতু তারা অন্নসমূহের সুষ্ঠু ভরণকারী বা ধারক হয়েছেন। সেহেতু সৌভর এই নাম হয়েছে। (প্রজাপতি বৃষ্টি দ্বারা প্রজাদের অন্ন প্রদান করেছেন। তাই প্রজাপতির উদ্দেশ্যে প্রজাদের এই উক্তি)।

নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনে বিদ্যমান 'সুভৃত' এই ক্রিয়াপদ থেকে অনুমান করা যায় 'সু' উপসর্গ পূর্বক √ভৃ-ধাতু (*ভৃঞ্ ভরণে*, ভ্বাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ৮৯৮) থেকে 'সৌভর' পদটি নিষ্পন্ন হয়েছে (সু- √ভৃ-ধাতু + 'অণ্' = সৌভর)। অতএব শব্দটি প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতির অবলম্বনে নির্বচিত হয়েছে।

২.৬.২. *জৈমিনীয়ব্রাহ্মণে* প্রাপ্ত নির্বচনপদ্ধতি

অন্তরিক্ষ

জৈমিনীয়ব্রাহ্মণে অন্তরিক্ষ শব্দটি একাধিক স্থানে একাধিকভাবে নির্বচন হয়েছে, যেমন দ্বিতীয় কাণ্ডে বলা হয়েছে, পুরুষই প্রজাপতি, প্রজাপতি আবার সংবৎসর। এই পুরুষই আবার অন্তরিক্ষ রূপ আকাশ। এই অন্তরিক্ষকেই আবার বায়ু ও বাত শব্দ দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে এবং সেখানেই অন্তরিক্ষের অন্তরিক্ষত্ব, বায়ুর বায়ুত্ব, ও বাত শব্দের বাতত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্তরিক্ষ শব্দের নির্বচনটি হল-

> যদস্মিন্ সর্বস্মিন্ অন্তরীক্ষতে তস্মাদন্তরিক্ষম্।[৮৩]

অর্থাৎ এখানে (আকাশে) যেহেতু সবকিছুর অন্তঃ ঈক্ষিত হয় বা দৃষ্ট হয় তাই অন্তরিক্ষ এই নামে অভিহিত হয়।

দ্বিতীয় কাণ্ডেই আবার অন্যত্র দেখা যায়, প্রজাপতি ত্রিলোক সৃষ্টির সময় একাক্ষরবিশিষ্ট বাক্-কে তিন ভাগে ভাগ করে যথাক্রমে ভূলোক, অন্তরিক্ষলোক ও দ্যুলোক সৃষ্টি করেন। দ্বিতীয় ভাগটি হল অন্তরিক্ষ। এই অন্তরিক্ষের অন্তরিক্ষত্ব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

> অন্তরেব বা ইদমুভযম্ অভূদিতি। তদন্তরিক্ষস্যান্তরিক্ষত্বম্।[৮৪]

অর্থাৎ এই লোক (অন্তরিক্ষ) উভয়ের অন্তঃ বা মধ্যবর্তী হয়েছিল। এটিই অন্তরিক্ষের অন্তরিক্ষত্ব।

তৃতীয় কাণ্ডেও ত্রিলোক সৃষ্টি প্রসঙ্গেই অন্তরিক্ষলোকের বর্ণনা দেখা যায়। পৃথিবীলোক ও দ্যুলোকের অন্তঃ বা মধ্যবর্তী হওয়ায় এটি অন্তরিক্ষ-

> অথ যদন্তরাসীত্, তদন্তরিক্ষম্।[৮৫]

অনন্তর যেটি অন্তঃ অর্থাৎ মাঝে অবস্থিত সেটি অন্তরিক্ষ হয়।

নির্বচনপদ্ধতি

তিনটি নির্বচনেই দেখা যায়, 'অন্তরিক্ষ' শব্দের উৎপত্তিতে 'অন্তঃ' শব্দের বিশেষ ভূমিকা বিদ্যমান। সর্বত্রই 'অন্তঃ' বা মধ্যবর্তী হওয়ায় অন্তরিক্ষ নামকরণের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ বলা যায় 'অন্তঃ' শব্দ থেকেই 'অন্তরিক্ষ' শব্দের উৎপত্তি সিদ্ধ করা হয়েছে (অন্তর্ > অন্তরিক্ষ)। 'অন্তরিক্ষ' শব্দের আদ্য ভাগ 'অন্তর্' এর সাথে 'অন্তর্' শব্দের বর্ণাক্ষরগত সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকায় অনুমান করা যায়, এটি যাস্কীয় অতিপরোক্ষনির্বচন শ্রেণির অন্তর্গত।

অপূর্ব

'অপূর্ব' যাগ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, প্রজাপতি প্রজা ও পশু দ্বারা বহু হওয়ার কামনায় এই 'অপূর্ব' যাগের দ্বারা যজন করেন এবং ফলস্বরূপ প্রজা ও পশুরূপে বহু হন। তারপর মনই প্রজাপতি হিসাবে 'অপূর্ব' শব্দের নির্বচন প্রদর্শিত হয়েছে, যথা-

অথো মনো বৈ প্রজাপতিঃ। নো বৈ মনসোঽন্যত্ কিঞ্চন পূর্বমস্তি। তস্মাদ্ উ এবাপূর্বঃ।[৮৬]

অর্থাৎ মনই প্রজাপতি। মনের পূর্বে কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই। সেহেতু মনই অপূর্ব।

নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনটি বিশ্লেষণের দ্বারা জানা যায়, 'অপূর্ব' শব্দটি 'ন বিদ্যমানম্' অর্থাৎ 'অবিদ্যমানং পূর্বম্ যস্য সঃ' এই বিগ্রহ দ্বারা নঞ্-বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন হিসাবে সিদ্ধ করা যায়। মনের পূর্বে কোনো কিছুই বিদ্যমান না থাকায়, মনকে অপূর্ব বলা হয়েছে। অতএব ব্যাকরণজনিত শব্দগঠন প্রক্রিয়া অনুসারে নির্বচনটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এটি যাস্কীয় প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অভিজিৎ

জৈমিনীয়ব্রাহ্মণে 'অভিজিৎ' শব্দের একাধিক নির্বচন পাওয়া যায়। যেমন, প্রথম কাণ্ডেই 'আগ্নেয়-আজ্য' বিষয়ে আলোচনাকালে বলা হয়েছে-

স হ সোঽভিজিদেব স্তোমঃ, অগ্নিরেব সঃ। স হীদং সর্বমভ্যজযত্।[৮৭]

সেটিই সেই অভিজিৎ নামক স্তোম, অগ্নিই সেই অভিজিৎ (স্তোমঃ), যেহেতু তিনি এই সবকিছু জয় করেছিলেন সেহেতু অভিজিৎ এই নাম হয়েছে।

আবার দ্বিতীয় কাণ্ডে 'অভিজিৎ' শব্দটির আখ্যান অভিমুখে নির্বচন করা হয়েছে। দেবতারা অসুরদের ও পৃথিব্যাদি তিন লোক জয় করতে চেয়েছিলেন। তারপর 'অভিজিৎ' নামক যজ্ঞের সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং এই যজ্ঞের দ্বারা যজন করেন। সেই যজ্ঞের দ্বারাই লোকসমূহ জয় করেন এবং শত্রু অসুরদের পরাজিত করেন। যেহেতু এই লোকসমূহের অভিমুখে গমন করে জয় করেন তাই এখানেই অভিজিৎ-এর অভিজিৎ এই সংজ্ঞা। নির্বচনটি হল-

তেনেমান্ লোকান্ অভ্যজযন্যজযন্ স্পর্ধাং ভ্রাতৃব্যানসুরান্। তদ্যদিমান্ লোকান্ অভ্যজযংস্তদভিজিতোঽভিজিত্বম্।[৮৮]

অর্থাৎ তার দ্বারা (অভিজিৎ যজ্ঞের দ্বারা) এই পৃথিব্যাদি লোকসমূহের অভিমুখী হয়ে জয় করেন, অসুরদের স্পর্ধাকে জয় করেন। যেহেতু এই লোকসমূহের অভিমুখে গমন করে জয় করেন তাই এখানেই অভিজিৎ-এর অভিজিতত্ব।

নির্বচনপদ্ধতি

'অভিজিৎ' শব্দটি স্তোম ও যজ্ঞ অর্থে একাধিকভাবে নির্বচিন প্রাপ্ত হলেও দুটি নির্বচনেই 'অভিজিৎ' শব্দটি 'অভ্যজযৎ' ও তার বহুবচন 'অভ্যজযন্' এই ক্রিয়াপদের নিরিখে প্রদর্শিত হয়েছে অর্থাৎ 'অভি' এই উপসর্গ পূর্বক *জি জযে* ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে অভিজিৎ পদটি নিষ্পন্ন হয়েছে। পাণিনি ব্যাকরণানুসারে 'অভিজিৎ' শব্দটির ব্যুৎপত্তি হল- 'অভিমুখীভূয জযতি (শত্রূন্)' এই অর্থে অভি এই উপসর্গ পূর্বক *জি জযে* ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'অভিজিৎ' পদটি নিষ্পন্ন হয়েছে (অভি -*জি জযে* + 'ক্বিপ্')। পাণিনি ব্যাকরণেও 'অভিজিৎ' শব্দটি অভিমুখীকৃত হয়ে জয় করা অর্থে, জয়ার্থক √জি-ধাতু থেকেই নিষ্পন্ন হয়েছে। তাই বলা যায়, বৈয়াকরণ শব্দগঠনপ্রক্রিয়া অনুসারেই 'অভিজিৎ' শব্দের নির্বচনগুলি সিদ্ধান্তিত হয়েছে।

'অভিজিৎ' এই মূল শব্দের সাথে উৎস স্বরূপ ধাতু (√জি-ধাতু) বা ক্রিয়াপদের (অভ্যজযত্) ধ্বনি ও অর্থগত সাদৃশ্য বিদ্যমান। অতএব ব্যাকরণের সহজ-সরল প্রয়োগ দ্বারাই নির্বচনটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় যাস্কাচার্যের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী *জৈমিনীয়ব্রাহ্মণে* উল্লেখিত 'অভিজিৎ' শব্দের নির্বচনটি প্রত্যক্ষবৃত্তি শব্দের নির্বচন বা প্রত্যক্ষনির্বচন শ্রেণীর অন্তর্গত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

অভীবর্ত

> অভীবর্তেন বৈ দেবা ইমান্ লোকানভ্যবর্তন্ত। যদভ্যবর্তন্ত তদভীবর্তস্যাভীবর্তত্বম্।[৮৯]

অর্থাৎ 'অভীবর্ত' দ্বারা দেবতারা এই (পৃথিব্যাদি) লোকে বা লোকসমূহের অভিমুখে অবস্থান করেছিলেন। যেহেতু এর দ্বারাই (লোকসমূহের) অভিমুখে অবস্থান করেছিলেন অতএব এখানেই অভিবর্তের অভিবর্তত্ব (প্রতিষ্ঠিত হয়)।

> তে দেবা অকাময়ন্তাভীমান্ সুরান্ ভবেমেতি। ত এতমভীবর্তমপশ্যন্। তেনাসুরান্ অভ্যবর্তন্ত। যদভ্যবর্তন্ত তদভীবর্তস্যাভীবর্তত্বম্।[৯০]

অর্থাৎ সেই দেবতারা অসুরদের অভিমুখে অবস্থান করতে হবে বা করা উচিত এইরকম কামনা করেছিলেন। তাঁরা এই 'অভীবর্ত' সামের দেখা পান। তার দ্বারা অসুরদের অভিমুখী হন। যেহেতু এই সামের দ্বারাই অসুরদের অভিমুখে অবস্থান করেন তাই অভিবর্তের অভিবর্তত্ব সিদ্ধ হয়।

নির্বচনপদ্ধতি

এখানে 'অভীবর্ত' সাম দেবাসুরের অন্তরালে প্রকৃতপক্ষে যজমানরূপ শত্রুদের অপমানের নিমিত্ত প্রয়োগের বিধান দেওয়া হয়েছে। তবে 'অভ্যবর্তন্ত' এই ক্রিয়াপদের প্রয়োগ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, 'অভীবর্ত' শব্দের গঠনপ্রক্রিয়া ব্যাকরণগত সংস্কারের অনুরূপ অর্থাৎ অভি উপসর্গপূর্বক √বৃত্-ধাতু (বৃতু বর্তনে ভ্বাদিগণ, ৭৫৮) থেকে 'অভীবর্ত' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। অতএব ব্যাকরণ অনুসারী প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতিতেই 'অভীবর্ত' শব্দের নির্বচন করা হয়েছে।

আঙ্গিরস

জৈমিনীয়ব্রাহ্মণে প্রাপ্ত 'আঙ্গিরস' শব্দের নির্বচনটি হল-

> অতো হীমান্যঙ্গানি রসং লভন্তে তস্মাদাঙ্গিরসঃ।[৯১]

অর্থাৎ যেহেতু অঙ্গসমূহ রস লাভ করে তাই আঙ্গিরস এই নামে অভিহিত হয়।

নির্বচনপদ্ধতি

আঙ্গিরস শব্দের ব্যাকরণগত অর্থ পাওয়া যায় অঙ্গিরস ঋষির পুত্র। 'অঙ্গিরস্' শব্দের সাথে অপত্যর্থে 'অণ্' প্রত্যয় যুক্ত করে 'আঙ্গিরস' শব্দ নিষ্পন্ন হয় (অঙ্গিরস্ + অণ্ = আঙ্গিরস)। কিন্তু আলোচ্য নির্বচনে অঙ্গসমূহ দ্বারা লব্ধ রস এই অর্থে 'আঙ্গিরস' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে অর্থাৎ 'অঙ্গ' এবং 'রস' এই সুবন্ত শব্দদুটি যুক্ত হয়ে 'আঙ্গিরস' শব্দ উৎপন্ন হয়েছে (অঙ্গ + রস = আঙ্গিরস)। অতএব পরোক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে শব্দটি নির্বচিত হয়েছে বলা যায়।

আয়ু

জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ-এর দ্বিতীয় কাণ্ডে গবাময়ন সত্র যজ্ঞের আলোচনাকালে অন্তিম খণ্ডে 'আয়ু' শব্দের নির্বচনস্বরূপ বলা হয়েছে-

> যদাযুষৈবাযুবত তদ্ আযুষঃ আযুষ্টম্।[৯২]

যেহেতু আয়ুর দ্বারা সম্যকভাবে যুক্ত হয় সেহেতু আয়ুর আয়ুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

নির্বচনপদ্ধতি

'আয়ু' শব্দের নির্বচনটি একাধিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়। প্রথমত, নির্বচনস্থিত 'আযুবত' ক্রিয়াপদ থেকে 'আয়ু' শব্দটি নিষ্পন্ন করা যায়। 'আ' এই উপসর্গ পূর্বক √যু-ধাতু থেকে আয়ু শব্দটি ব্যুৎপন্ন হয়েছে বলা যায় অথবা 'আযুবত' এই ক্রিয়াপদের প্রথমার্ধাংশ 'আযু'র সাথে 'আয়ু' শব্দের ধ্বনিগত সাদৃশ্যও বিদ্যমান। অতএব 'আযুবত' ক্রিয়াপদ থেকে ভাষাগত নিয়মানুসারেও শব্দটি সৃষ্ট হয়।

ব্যাকরণ অনুসারে 'আয়ু' শব্দটি √ইণ্-ধাতুর উত্তর 'উসি' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে সিদ্ধ হয় (*ইণ গতৌ* + উসি প্রত্যয় = আয়ুস্)। অতএব আচার্য যাস্কাচার্যের নির্বচনসিদ্ধান্ত অনুসারে 'আয়ু' শব্দের নির্বচনটি পরোক্ষনির্বচনপদ্ধতির অন্তর্গত বলা যায়।

উদ্গীথ

তৃতীয়কাণ্ডে দ্বাদশাহ যজ্ঞের বর্ণনার অবকাশে প্রাণকে উদ্গীথের সাথের তুলনা করে শব্দটির উৎপত্তি বর্ণিত হয়েছে, সেটি হল-

> স যদ্ উদ্ ইত্যনেন হীদং সর্বং উত্তব্ধম্। অথ যদ্ গীত্যেষ হীদং সর্বং গিরতি। অথ যত্ থ ইত্যন্নমেবাস্যৈ তত্। তস্মাদেষ এবোদ্গীথঃ।[৯৩]

নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনটির বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়, উদ্, 'গৃ'-ধাতু নিষ্পন্ন 'গী' এবং 'থ' পরস্পর যুক্ত হয়ে 'উদ্গীথ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে (উদ্+গী+থ = উদ্গীথ)। অতএব অনুমান করা যায় অতিপরোক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে শব্দটি নির্বচিত হয়েছে।

ঋক্

গ্রন্থের অন্তিম খণ্ডে প্রাণকে 'ঋক্'-এর সাথে তুলনা করে 'ঊর্ঘ' এই শব্দ থেকে 'ঋক্' নামের নিষ্পত্তি বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে-

> ঊর্ঘ বৈ নামৈষ। তমৃগিতি পরোক্ষমাচক্ষতে। তস্মাদেষ এবর্ক্।[৯৪]

অর্থাৎ ঊর্ঘ এই নাম। সেটি 'ঋক্' এই পরোক্ষ নামে অভিহিত করা হয়। অতএব এটিই (ঊর্ঘ) ঋক্।

নির্বচনপদ্ধতি

'ঋক্' শব্দের নির্বচনটিতে দেখা যায়, 'ঊর্ঘ' শব্দটিকে পরোক্ষভাবে 'ঋক্' বলা হয়েছে। এখানে যাস্কাচার্য কর্তৃক উল্লেখিত ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়মের দ্বারাই 'ঊর্ঘ' শব্দ থেকে 'ঋক্' শব্দের উৎপত্তি (ঊর্ঘ > ঋক্, ঊকারের লোপ, রেফের স্থানে ঋকার এবং ঘকারের স্থানে ককার হয়েছে) হয়েছে বলা যায়। অতএব অনুমান করা যায়, নির্বচনটি পরোক্ষনির্বচনপদ্ধতির অন্তর্গত।

চ্যাবন

তৃতীয়কাণ্ডে 'চ্যাবন' সামের আলোচনাকালে 'চ্যবন' ঋষির প্রসঙ্গ এবং 'চ্যাবন' শব্দের নিরুক্তি আখ্যানপূর্বক প্রদর্শিত হয়েছে। নির্বচনটি যথা-

> এতদ্বৈ চ্যবনো ভার্গব এতেন সাম্না স্তুত্বা পুনর্যুবাঽভবত্...যদু চ্যবনো ভার্গবোঽপশ্যত্ তস্মাচ্চ্যাবনমিত্যাখ্যাযতে।[৯৫]

এই ভৃগুপুত্র চ্যবন ঋষি এই সামের (চ্যাবনসাম) দ্বারা স্তুতি করে পুনরায় যুবকে পরিণত হয়েছিলেন বা যৌবন প্রাপ্ত হয়েছিলেন.....যেহেতু ভার্গব চ্যবন ঋষি দেখেছিলেন সেহেতু চ্যাবন-সাম এই আখ্যায় আখ্যায়িত হয়।

নির্বচনপদ্ধতি

'চ্যবন' ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট হওয়ায় সামটি তাঁর নামানুসারে 'চ্যাবন' এই অভিধা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নির্বচনটির দ্বারা 'চ্যবন' শব্দ থেকে 'চ্যাবন' শব্দের উৎপত্তি সিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। 'চ্যবন' শব্দের সাথে 'অণ্' এই তদ্ধিতপ্রত্যয় যুক্ত করে, আদি বৃদ্ধি ঘটিয়ে 'চ্যাবন' রূপটি পাওয়া যায় এবং এটি ব্যাকরণসম্মত (চ্যবন + অণ্ প্রত্যয় = চ্যাবন)। অতএব বলা যায় 'চ্যাবন' শব্দটি প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে নির্বচিত হয়েছে।

ছন্দস্

জৈমিনীয়ব্রাহ্মণে দেখা যায়, দেবতাদের সৃষ্টির পর প্রজাপতি কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে দেবতারা সাতটি মূল ছন্দ ও অতিচ্ছন্দে প্রবেশ করে নিজেদের আচ্ছাদিত করে পাপ এবং মৃত্যু থেকে রক্ষা করেন। ছন্দের ছন্দত্ব প্রতিপাদনস্বরূপ এই কারণটিই গুরুত্ব পেয়েছে। বলা হয়েছে-

> ছন্দাংসি বাব তান্ মৃত্যোঃ পাপ্মনোঽছাদযন্। তদ্যদ্ এনান্ ছন্দাংসি মৃত্যোঃ পাপ্মনোঽছাদযংস্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বম্।[৯৬]

ছন্দসমূহ তাঁদের (দেবতাদের) মৃত্যু ও পাপ থেকে আচ্ছাদিত করেছিল। যেহেতু এনাদের ছন্দসমূহ মৃত্যু ও পাপ থেকে আচ্ছাদিত করেছিল তাই এর দ্বারাই ছন্দের ছন্দত্ব প্রতিপন্ন হয়।

নির্বচনপদ্ধতি

ছন্দের নামকরণের কারণস্বরূপ উল্লিখিত 'ছাদযন্' ক্রিয়াপদ থেকে আবরণার্থক √ছদ্-ধাতু থেকে 'ছন্দ' শব্দের ব্যুৎপত্তি করা যায়। অতএব বলা যায় ছদি সংবরণে বা ছদ অপবারণে ধাতুর সাথে উণাদি 'অসুন্' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'ছন্দস্' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। পাণিনীয়ব্যাকরণ অনুযায়ী 'চন্দেরাদেশ্চ ছঃ' (উণাদিসূত্র ৪/২২০/২১৯) সূত্র দ্বারা 'চদি আহ্লাদনে' ধাতুর উত্তর 'অসুন্' প্রত্যয় যোগ করে 'চন্দস্' থেকে 'ছন্দস্' পদ সিদ্ধ হয় (√চদ্-ধাতু + 'অসুন্' প্রত্যয় = চন্দস্ > ছন্দস্)। অতএব এটি পরোক্ষনির্বচনপদ্ধতির উদাহরণ।

ধূম

সামবেদীয় এই ব্রাহ্মণগ্রন্থের প্রথম অধ্যায়েই মৃত শরীরকে চিতায় রাখার পর করণীয় কর্মসমূহ বর্ণনাকালে 'ধূম' শব্দের বিশেষ প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। সেখানে বলা হয়েছে-

> ধূম এব শরীরং ধুনোতি। স যদ্ ধুনোতি তস্মাদ্ ধুনঃ। ধুনো হ বৈ নামৈষঃ। তং ধূম ইতি পরোক্ষমাচক্ষতে পরোক্ষেণৈব। পরোক্ষপ্রিযা ইব হি দেবাঃ।[৯৭]

অর্থাৎ ধূমই শরীরকে (মৃতদেহকে) সঞ্চালিত করে। কম্পিত করে বা এটি যেহেতু কম্পিত করে (সঞ্চালিত করে)। তাই ধুন এই সংজ্ঞা। প্রকৃতই ধুন এই নাম। পরোক্ষভাবে ধূম এই পরোক্ষ নামে অভিহিত হয়, যেহেতু দেবতারা পরোক্ষপ্রিয় হন।

নির্বচনপদ্ধতি

'ধুনোতি' ক্রিয়াপদটি √ধূ-ধাতু নিষ্পন্ন, যার অর্থ কম্পিত করা। 'ধুন' শব্দটিই 'ধূম' এই রূপে পর্যবসিত হয়েছে অর্থাৎ এই শব্দে ধ্বনিপরিবর্তনের দ্বারা 'ধু' এর হ্রস্ব-উকারের দীর্ঘত্ব প্রাপ্তি হয়েছে এবং ত-বর্গীয় পঞ্চমবর্ণ নকারের স্থানে ট-বর্গীয় পঞ্চম বর্ণ ণকার হয়ে ধূম শব্দটি সিদ্ধ হয়েছে (ধুন > ধূম, হ্রস্ব-উকারের স্থানে দীর্ঘ-ঊকার এবং 'ন্'-এর সাথে 'ণ্')। উণাদিসূত্র 'ইষিযুধীন্ধিদসিশ্যাধূসূভ্যো মক্' (উণাদিসূত্র ১/১৪৫) দ্বারা √ধূ-ধাতুর (*ধূঞ্ কম্পনে*, ক্র্যাদিগণ, ১৪৮৭ পাণিনীয়ধাতুপাঠ) সাথে 'মক্' প্রত্যয় সংযুক্ত করে 'ধূম' পদটি উৎপন্ন হয় (√ধূ ধাতু + মক্ প্রত্যয় = ধূম)। অতএব বলা যায় 'ধুন' শব্দের ধূমে রূপান্তর যাস্কীয় পরোক্ষনির্বচনপদ্ধতির পরিচয় বহন করে।

নভঃ

জৈমিনীয়ব্রাহ্মণে অগ্নিহোত্র হোম সম্পাদনে ফললাভ বর্ণনাকালে অন্তরিক্ষ বাচক নভোলোক প্রাপ্তির বিষয় উল্লেখ করা হয় এবং নভোলোকের 'নভঃ' এই নামকরণের কারণ হিসাবে বলা হয়েছে-

> তদ্যদ্বৈ তন্নভো নামাভীর্বৈ সা। ন হি তৎপ্রাপ্য কস্মাচ্চন বিভেতি। তস্মাত্তন্নভঃ।[৯৮]

সেইটি যেটি নভো (লোক) নামে পরিচিত, সেটি 'অভী' অর্থাৎ ভয়হীন বা নির্ভয় (স্থান) হয়। কারণ ওই লোক প্রাপ্ত হয়ে কেউই কোনও কিছুর ভয় পায়না। সেইজন্য এটি নভঃ (নভস্)।

নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনস্থিত 'অভী' এবং 'ন বিভেতি' এই বাক্যাংশদ্বয় থেকে অনুমান করা যায় নঞর্থক 'ন' এবং √ভী-ধাতু উভয়ের সাথেই সম্বন্ধযুক্ত। ন (নঞর্থক) + √ভী-ধাতু > অ-ভী > অভী। পুনরায়, ন (নঞর্থক) + √ভী-ধাতু > ন বিভেতি। অতএব 'নভঃ' শব্দটি 'ন' + √ভী-ধাতু (*ঞিভী ভয়ে*, জুহোত্যাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১০৮৪) ধাতু থেকে নিষ্পন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই নির্বচনে 'নভস্' শব্দের সাথে নেতিবাচক 'ন' এর 'ন' এবং √ভী- ধাতুর অন্তর্গত 'ভ্' এর বর্ণাক্ষরগত সাম্য লক্ষিত হয়। কিন্তু 'নহের্দিবি ভশ্চ' (উণাদিসূত্র ৪/২১২) এই পাণিনীয় উণাদিসূত্র অনুসারে 'নহ বন্ধনে' ধাতুর সাথে 'অসুন্' প্রত্যয় সংযোগ করে এবং ভাদেশ ঘটিয়ে 'নভস্' বা 'নভঃ' শব্দ ব্যুৎপন্ন হয়। অতএব অনুমান করা যায়, এটি যাস্কীয় অতিপরোক্ষনির্বচন শ্রেণির অন্তর্গত।

পুরোহিত

জৈমিনীয়ব্রাহ্মণে 'পুরোহিত' শব্দের নির্বচনটি তথাকথিত অন্য নির্বচনগুলির মত সম্পূর্ণভাবে উল্লেখ না থাকলেও শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। নির্বচনটি হল-

> প্রথমঃ পুরোহিতমিতি পুর এব বা এনমেতদ্ দধতে।[৯৯]

অর্থাৎ সংহিতার প্রথমেই বা দুটি কোশের মধ্যে প্রথমেই (অগ্নিকে) পুরোহিত বলা হয়েছে (পুরোহিতম্ ইতি), তাঁকে পুরঃ অর্থাৎ অগ্রভাগে ধারণ বা স্থাপন করা হয় (অতএব এতেই পুরোহিত নামের স্বার্থকতা)।

নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনে বিদ্যমান 'পুর দধতে' শব্দদ্বয় থেকে জানা যায় 'পুরস্' এই উপসর্গপূর্বক √ধা-ধাতু থেকে 'পুরোহিত' শব্দটির উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে। ব্যাকরণগত শব্দগঠন প্রক্রিয়া দ্বারাও 'পুরস্' অব্যয় পূর্বক √ধা-ধাতুর (*ডুধাঞ্ ধারণপোষণযোঃ*, জুহোত্যাদিগণ, ১০৬২) সাথে 'ক্ত'-প্রত্যয় যুক্ত করে 'পুরোহিত' শব্দটি সিদ্ধ হয়

(পুরস্-√ধা-ধাতু + 'ক্ত' প্রত্যয় = পুরোহিত)। অতএব ব্যাকরণপ্রক্রিয়ার অনুরূপ হওয়ায় নির্বচনটি প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতির অন্তর্গত বলা যায়।

পৃথিবী

জৈমিনীয়ব্রাহ্মণে 'পৃথিবী' শব্দের নির্বচনেও পৃথিবী সৃষ্টিতে প্রজাপতির ভূমিকা প্রদর্শিত হয়েছে। নির্বচনটি হল-

> ইদমগ্রে মহত্ সলিলমাসীত্। তস্মিন্ প্রজাপতিঃ প্রতিষ্ঠামৈচ্ছত্। স এব বৈশ্বানরং প্রাযণীযমতিরাত্রমপশ্যত্। তমুপাদধাত্। ইমমেব লোকমস্মিন্ সলিলেঽধি অপ্রথযত্। যদপ্রথযত্ তস্মাত্ পৃথিবী।[১০০]

সর্বপ্রথম বা সৃষ্টির পূর্বে (শুধুমাত্র) বিশাল জলভাগ ছিল। প্রজাপতি সেই জলভাগে প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। তিনিই বৈশ্বানর প্রাযণীয় অতিরাত্রকে দেখেন এবং তাকে ধারণ করেন। এই লোককেই (পৃথিবীকে) সলিলে বিস্তারিত করেন, যেহেতু বিস্তারিত করেছিলেন তাই পৃথিবী।

নির্বচনপদ্ধতি

'অপ্রথযত্' ক্রিয়াপদের উপস্থিতি থেকে অনুমান করা করা যায় 'প্রথ বিস্তারে' ধাতু থেকে 'পৃথিবী' শব্দের নিষ্পত্তির চেষ্টা করা হয়েছে, যেটি পানিণীয় ব্যাকরণসম্মত। 'প্রথে ষিবন্ ষবন্ধনঃ সংপ্রসারণং চ' (উণাদিসূত্র ১/১৫০) এই উণাদিসূত্র দ্বারা √প্রথ্-ধাতুর (*প্রথ বিস্তারে)* উত্তর 'ষিবন্' প্রত্যয় যুক্ত করে, 'র্' এর সম্প্রসারণ 'ঋ' হয় এবং 'ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ' সূত্র দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গে 'ঙীষ্' প্রত্যয় যুক্ত করে 'পৃথিবী' শব্দটি সিদ্ধ হয় (√প্রথ্-ধাতু + 'ষিবন্' প্রত্যয় > পৃথিব ('র্' এর সম্প্রসারণ 'ঋ') + 'ঙীষ্' প্রত্যয় (ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ) > পৃথিবী)। অতএব সিদ্ধান্তে আসা যায়, 'পৃথিবী' শব্দটি ব্যাকরণ অনুসারি প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে নির্বচিত হয়েছে।

প্রায়ণীয়োদয়নীয়

দ্বাদশাহের বর্ণনাকালে প্রাণ ও উদান বায়ু উল্লেখিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এই দুই বায়ুই পরোক্ষভাবে 'প্রায়ণীয়োদয়নীয়' নামে পরিচিত। নির্বচনটি হল-

> প্রাণ এব পূর্বোঽতিরাত্র উদান উত্তরঃ। তৌ প্রাযণীযোদযনীযাবিতি পরোক্ষমাচক্ষতে।[১০১]

প্রাণই পূর্ব-অতিরাত্র (এবং) উদান উত্তর-অতিরাত্র। এই প্রাণ এবং উদান উভয়কে পরোক্ষভাবে একত্রাবস্থায় প্রায়ণীয়োদয়নীয় বলা হয়।

নির্বচনপদ্ধতি

প্রায়ণীয়োদয়নীয় শব্দের নির্বচন থেকে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, শব্দটির উৎপত্তিতে 'প্রাণ' এবং 'উদান' এই দুইয়ের ভূমিকা বিদ্যমান। 'প্রাণ' শব্দ থেকে 'প্রায়ণীয়' শব্দে 'প্রা' ও 'ণ' এবং 'উদান' থেকে 'উদয়নীয়' শব্দে 'উ', 'দ-কার' ও 'ন-কার' (ণত্ববিধান দ্বারা 'ন'-কার 'ণ'-কার হয়েছে) গৃহীত হয়েছে। যেহেতু 'প্রাণ' শব্দ থেকে 'প্রায়ণীয়' এবং 'উদান' শব্দ থেকে 'উদয়নীয়' শব্দ বর্ণাক্ষর সাম্য দ্বারা সিদ্ধ হয়েছে এবং সন্ধিবদ্ধ হয়ে প্রায়ণীয়োদয়নীয় রূপটি প্রাপ্ত হয়েছে (প্রাণ> প্রায়ণীয়, উদান > উদয়নীয়, প্রায়ণীয়+উদয়নীয়> প্রায়ণীয়োদয়নীয়) সেহেতু বলা যায়, যাস্কীয় অতিপরোক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে শব্দটি নির্বচিত হয়েছে।

ব্রহ্ম

তৃতীয়কাণ্ডে পুরুষ সম্পর্কে বিভিন্ন উপমা প্রয়োগকালে তাঁকে 'ব্রহ্ম'ও বলা হয়েছে। পুরুষের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদক নির্বচনটি হল-

এষ হীদং সর্বং বিভর্তি। তস্মাদেষ এব ব্রহ্ম। ভর্ম হ বৈ নামৈষঃ। তদ্ ব্রহ্মেতি পরোক্ষমাচক্ষতে।[১০২]

যেহেতু এই পুরুষ দৃশ্যমান সমস্ত বিষয়কে ধারণ করেন সেহেতু তিনিই 'ব্রহ্ম'। প্রকৃতপক্ষে তিনি 'ভর্ম', পরোক্ষভাবে 'ব্রহ্ম' এই নামে অভিহিত হয়।

নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনটির আলোচনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, ধারণার্থক √ভৃ-ধাতুর উত্তর 'মনিন্' প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন 'ভর্মন্' বা 'ভর্ম' শব্দটিই ধ্বনিপরিবর্তনের দ্বারা 'ব্রহ্মন্' বা 'ব্রহ্ম' এই শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে। ভর্ > ভ্র, হকার আগম এবং মকার যুক্ত হয়ে 'ভর্ম' থেকে 'ব্রহ্ম' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে (√ভৃ-ধাতু = ভর্ম > ব্রহ্ম)। অতএব শব্দটি পরোক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে নির্বচিত হয়েছে।

মহাব্রত

জৈমিনীয়ব্রাহ্মণের দ্বিতীয়কাণ্ডে গবাময়ন সত্রযাগের বিধানকালে প্রসঙ্গানুসারে প্রজাসৃষ্টি ও প্রাণোৎপত্তি বর্ণনাকালে 'মহাব্রত' যাগের বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং শব্দটির উৎপত্তি ও অর্থ বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। নির্বচনটি হল-

তা যদব্রুবন্ মহতে ব্রতং হরাম ইতি তন্মহাব্রতস্য মহাব্রতত্বম্।[১০৩]

(প্রজাপতি দ্বারা সৃষ্ট প্রজা প্রাণ এবং অপান দ্বারা সংবৎসরের স্তুতি করলে, তুষ্ট দেবতারা বেদসমূহ, অন্ন ইত্যাদির রস গ্রহণ করে বলেন মহৎ ব্রত হরণ করি 'মহতে ব্রতং হরাম') তাঁরা (সকল দেবতা) যেহেতু বলেছিলেন 'মহতে ব্রতং হরাম' সেইজন্য মহাব্রত যাগের 'মহাব্রত' নাম হয় বা মহাব্রতত্ব প্রাপ্ত হয়।

নির্বচনপদ্ধতি

উভয় নির্বচনে যথাক্রমে 'মহদ্ব্রতম্' ও 'মহতোঃ (মহান্ তস্য) সম্বন্ধম্ ব্রতম্' থেকে জ্ঞাত হওয়া যায় যে 'মহত্' ও 'ব্রত' এই দুই শব্দ মিলিত হয়ে 'মহাব্রত' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। উভয় নির্বচনেই যথাক্রমে 'মহদ্ ব্রতম্ যত্ তত্' এবং 'মহতঃ ব্রতম্' এইভাবে বহুব্রীহি ও ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসরূপ ব্যাকরণ প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। অতএব নির্বচনটি প্রত্যক্ষ নির্বচন শ্রেণির অন্তর্গত।

মানুষ

জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ-এ 'মানুষ' শব্দের নির্বচন 'প্রজাপতি-দুহিতা' আখ্যানে বর্ণিত হয়েছে। মানুষের মানুষত্ব এই কারণেই যে, প্রজাপতির রেতঃ বা বীর্য মানুষের মধ্যে সুরক্ষিত থাকে, নষ্ট হয়না। নির্বচনস্বরূপ বলা হয়েছে-

তদ্ দেবাশ্চর্ষয়শ্চোপসমেত্যাব্রুবন্, মেদং দুষদিতি। যদব্রুবন্ মেদং দুষদিতি তন্মাদুষস্য মাদুষত্বম্। মাদুষং হ বৈ নামৈতত্। তন্মানুষমিত্যাখ্যায়তে।[১০৪]

অর্থাৎ (প্রজাপতির রেতঃ পতিত হলে সেটি যাতে নষ্ট না হয়), সেইজন্য দেবগণ ও ঋষিরা নিকটে উপস্থিত হয়ে বলেন- 'মেদং দুষদিতি' অর্থাৎ 'এটি দূষিত বা নষ্ট না হোক'। যেহেতু বলেছিলেন 'মেদং দুষদ্' (এটি দূষিত না হোক) তাই এর দ্বারাই মাদুষের মাদুষত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদুষ-ই প্রকৃত নাম, সেটি 'মানুষ' এই নামে আখ্যায়িত হয়।

নির্বচনপদ্ধতি

পূর্বোক্ত নির্বচনটিতে দেখা যায় 'মাদুষ' শব্দটি 'মা ও দুষত্' (দূষিত না হোক) যুক্ত হয়ে এবং 'ত্' লোপ করে উৎপন্ন হয়। পুনরায় 'মাদুষ' শব্দের 'দ'কার 'ন'কারে পরিণত হয়ে 'মানুষ' শব্দটি পাওয়া যায় অর্থাৎ অন্ত্যবর্ণলোপ ও বর্ণবিকারের দ্বারা 'মা দুষত্' থেকে 'মাদুষ' এবং 'মানুষ' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে- মা দুষত্ > মাদুষ, ('ত্' লোপ) > মানুষ, (দ্ এর স্থানে ন্)। অতএব এটি যাস্কীয় পরোক্ষনির্বচনপদ্ধতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

রুদ্র

দ্বিতীয়কাণ্ডে শাকল্য ও যাজ্ঞবল্ক্য মুনির কথোপকথনের সময় দেবতাদের সংখ্যা আলোচনাকালে জানা যায় তেত্রিশ প্রকার দেবতা। কাদের সম্মিলিত অবস্থানে তেত্রিশটি দেবতা এই বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে এবং সেখানেই একাদশ রুদ্রদেবতার প্রসঙ্গ ও রুদ্র শব্দের নির্বচন করা হয়েছে। সেটি হল-

> দশ পুরুষে প্রাণা ইতি হোবাচ। আত্মৈকাদশঃ। তে যদোতক্রামন্তো যন্ত্যথ রোদযন্তি, তস্মাদ্রুদ্রা ইতি।[১০৫]

অর্থাৎ পুরুষের দশ প্রাণ এবং আত্মা নিয়ে একাদশ রুদ্র। যখন তাঁরা (পুরুষের দেহ থেকে) উৎক্রান্ত হয়ে গমন করেন তখন সকলকে রোদন করান। তাই তাঁরা রুদ্র নামে পরিচিত।

নির্বচনপদ্ধতি

'রোদযন্তি' ক্রিয়াপদ থেকে রুদ্র শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায়। ণিজন্ত √রুদ্-ধাতু (*রুদির্ অশ্রুবিমোচনে,* অদাদিগণ, ১০৬৭) থেকে 'রুদ্র' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে (√রুদ্-ধাতু + ণিচ্ + রক্ = রুদ্র)। উক্ত ব্যুৎপত্তি ব্যাকরণগত শব্দগঠন প্রক্রিয়ার অনুরূপ। 'রোদের্ণিলুক্ চ' (উণাদিসূত্র ২/২২) এই উণাদিসূত্র দ্বারা শব্দটি গঠিত হয়। অতএব শব্দটি ব্যাকরণ অনুসারী প্রত্যক্ষনির্বচন-পদ্ধতির অন্তর্গত বলা যায়।

রৌরব

জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ-এর প্রথম কাণ্ডে 'রৌরব' সামের বর্ণনার সময় 'রৌরব' নামের কারণস্বরূপ বলা হয়েছে-

> যদগ্নী রূরুরেততসামাপশ্যত্ তস্মাদেব রৌরবমিত্যাখ্যায়তে।[১০৬]

যেহেতু 'অগ্নি' (যার অপর নাম) রূরু, (তিনি) এই সাম দর্শন করেছিলেন, সেহেতু তিনি 'রৌরব' নামে আখ্যায়িত হন।

এছাড়াও বলা হয়েছে-

> যদু রূর ইতি বৃধ্রোঽপশ্যত্ তস্মাদ্বেব রৌরবমিত্যাখ্যায়তে।[১০৭]

অর্থাৎ রূর নামক বৃধ্র পশু কামনা করে তপস্যা শুরু করে এবং এই সাম দেখতে পান। এই সামের দ্বারা স্তুতি করে তার কামনা সিদ্ধ হয়। যেহেতু রূর নামক বৃধ্র দেখেছিলেন তাই রৌরব এই আখ্যায় আখ্যায়িত হয়েছে।

নির্বচনপদ্ধতি

প্রথম নির্বচন অনুসারে 'রূরু' শব্দের সাথে 'অণ্' প্রত্যয় যুক্ত করে 'রৌরব' পদটি সিদ্ধ করা যায় (রূর + অণ্ = রৌরব)। অতএব এটি প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে নির্বচিত হয়েছে পরন্তু দ্বিতীয় নির্বচনে বিদ্যমান রূর শব্দের সাথে রৌরব শব্দের রেফের সাম্য হেতু বলা যায় নির্বচনটি যাস্কাচার্যের অতিপরোক্ষ নির্বচনের অন্তর্গত (রূর > রৌরব)।

বাত

জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ-এর দ্বিতীয় কাণ্ডে বলা হয়েছে পুরুষই প্রজাপতি, প্রজাপতি আবার সংবৎসর। এই পুরুষই আবার অন্তরিক্ষ রূপ আকাশ। এই অন্তরিক্ষকেই আবার বায়ু ও বাত শব্দ দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে এবং সেখানেই অন্তরিক্ষের অন্তরিক্ষত্ব, বায়ুর বায়ুত্ব, ও বাত শব্দের বাতত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'বাত' শব্দের সংজ্ঞাস্বরূপ বলা হয়েছে-

যদিদং সর্বং বাতি তস্মাদবাতঃ।[১০৮]

যেহেতু অন্তরিক্ষ বা আকাশে দৃশ্যমান সমস্তই প্রবাহিত হয় বা গমন করে তাই 'বাত' এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছে।

নির্বচনপদ্ধতি

'বাত' শব্দের নির্বচন থেকে জ্ঞাত হওয়া যায়, গত্যর্থক √বা-ধাতু থেকে 'বাত' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। কর্তৃবাচ্যে গত্যর্থক √বা-ধাতুর (*বা গতিগন্ধনয়োঃ*, অদাদিগণ, ১০৫০) উত্তর 'ক্ত' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'বাত' শব্দটি ব্যুৎপন্ন হয় (√বা-ধাতু + ক্ত প্রত্যয় = বাত)। এখানে প্রাসঙ্গিক সূত্রটি হল- 'গত্যর্থাকর্মকশ্লিষশীঙ্স্থাসবসজনরুহজীর্যতিভ্যশ্চ'।[১০৯] এছাড়াও 'হসিমৃগ্রিণ্বামিদমিলূপূধূর্বিভ্যস্তত্'[১১০] এই উণাদি সূত্র দ্বারাও গত্যর্থক √বা-ধাতুর (*বা গতিগন্ধনয়োঃ*, অদাদিগণ, ১০৫০) সাথে 'তন্'-প্রত্যয় যুক্ত করে 'বাত' শব্দ সিদ্ধ হয় (√বা-ধাতু + তন্-প্রত্যয় = বাত)। অতএব এটি প্রত্যক্ষনির্বচন শ্রেণীর অন্তর্গত।

বায়ু

জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ-এর দ্বিতীয় কাণ্ডে বলা হয়েছে পুরুষই প্রজাপতি, প্রজাপতি আবার সংবৎসর। এই পুরুষই আবার অন্তরিক্ষ রূপ আকাশ। এই অন্তরিক্ষকেই আবার বায়ু ও বাত শব্দ দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে এবং সেখানেই অন্তরিক্ষের অন্তরিক্ষত্ব, বায়ুর বায়ুত্ব, ও বাত শব্দের বাতত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'বায়ু' শব্দটি যেভাবে নির্বচিত হয়েছে তা হল-

যদিদং সর্বং যুতে তস্মাদ্ বায়ুঃ।[১১১]

অর্থাৎ যেহেতু এই অন্তরিক্ষ সবকিছুকে যুক্ত করে, তাই এটি বায়ু নামে পরিচিত।

নির্বচনপদ্ধতি

'বায়ু' শব্দের নির্বচনে 'যুতে' এই ক্রিয়াপদ থেকে অনুমান করা যায়, √যু-ধাতু থেকে 'বায়ু' শব্দের উৎপত্তি সিদ্ধ করা হয়েছে। ব্যাকরণ অনুসারে 'বায়ু' শব্দটি 'কৃবাপাজিমিস্বদিসাধ্যশূভ্য উণ্' (উণাদিসূত্র ১/১) সূত্র দ্বারা 'বা'-ধাতুর সাথে 'উণ্' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে উৎপন্ন হয় (√বা-ধাতু + উণ্ প্রত্যয় = বায়ু)। এখানে উল্লেখ্য যে √যু-ধাতুর সাথে 'বায়ু' শব্দের অন্ত্যবর্ণ 'যু' এর বর্ণাক্ষরগত সাম্য লক্ষ্য করা যায় (√যু-ধাতু > বায়ু)। অতএব বলা যায়, বায়ু শব্দের নির্বচনটি যাস্কীয় অতিপরোক্ষনির্বচন শ্রেণির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণস্বরূপ।

বৈখানস

জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ-এ 'বৈখানস' সামের আলোচনাকালে 'বৈখানস' শব্দের নির্বচন প্রদর্শিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে-

তদিন্দ্রো হ বৈ বিখানাঃ। স যদ্ ইন্দ্র এতৎসামাপশ্যত্, তস্মাদ্ বৈখানসম্ ইত্যাখ্যায়তে।[১১২]

অর্থাৎ সেই ইন্দ্রই হলেন বিখানস্, যেহেতু তিনি এই সাম দর্শন করেছিলেন তাই তাঁর নামানুসারে এটি সাম) বৈখানস এই নামে আখ্যায়িত হয়।

নির্বচনপদ্ধতি

পূর্বোক্ত নির্বচনটি থেকে জানা যায় 'বিখানস্' অর্থাৎ ইন্দ্র দ্বারা দৃষ্ট সামই হল 'বৈখানস'। অতএব, 'তেন প্রোক্তম্' এই অর্থে 'বিখানস্' শব্দের সাথে 'অণ্' এই প্রত্যয় যুক্ত করে 'বৈখানস' শব্দটি সিদ্ধ হয় (বিখানস্ + অণ্ = বৈখানস)। অনুমান করা যায় শব্দটি যাস্কীয়প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে নির্বচিত হয়েছে।

সঞ্জয়

'সঞ্জয়' নামক সামের আলোচনাকালে 'সঞ্জয়' শব্দের নির্বচনটি আখ্যায়িকা সহযোগে বর্ণিত হয়েছে। সেটি হল-

> দেবা অকাময়ন্ত সম্ ইমান্ লোকান্ জয়েম জয়েমাসুরান্ স্পর্ধাং ভ্রাতৃব্যান্ ইতি। ত এতত্ সামাপশ্যন্। তেনাস্তুবত। তেনেমান্ লোকান্ সমজয়ন্, অজয়ন্ স্পর্ধাং ভ্রাতৃব্যান্ অসুরান্। তদ্ যদ্ ইমান্ লোকান্ সমজয়ংস্তত্ সঞ্জয়স্য সঞ্জয়ত্বম্।[১১৩]

অর্থাৎ দেবতারা এই লোকসমূহকে সম্পূর্ণভাবে জয় করতে চেয়েছিলেন এবং শত্রু অসুরদের স্পর্ধাকে জয় করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা এই সাম দেখতে পান বা লাভ করেন। তার দ্বারা স্তুতি করেন। ফলস্বরূপ এই লোকসমূহ সম্যকভাবে জয় করেন এবং অসুরদের স্পর্ধাও জয় করেন। যেহেতু এই লোকসমূহ সম্যকভাবে জয় করেন, তাই এতেই সঞ্জয়ের সঞ্জয়ত্ব।

নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনস্থিত 'সমজয়ন্' এই ক্রিয়াপদ থেকে অনুমান করা যায় যে, 'সম্' উপসর্গ পূর্বক √জি-ধাতু থেকে 'সঞ্জয়' পদটি সিদ্ধ হয় (সম্- *জি জয়ে* ধাতু, ভ্বাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ৫৬১)। নির্বচনটি ব্যাকরণগত শব্দগঠন প্রক্রিয়ারই অনুরূপ। অতএব বলা যায় 'সঞ্জয়' শব্দটি প্রত্যক্ষনির্বচন পদ্ধতিতে নির্বচিত হয়েছে।

সাম

'সাম' শব্দের নির্বচনটি *জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ*-এর তৃতীয় অধ্যায়ে লক্ষ্য করা যায়। দ্বাদশাহ যাগের বর্ণনাকালে পুরুষের প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র ও বাক্ কে সপ্তমাহ থেকে দ্বাদশাহ রূপে কল্পনা করে সেই পুরুষকেই 'সাম' হিসাবে উপমিত করে 'সাম' শব্দের নির্বচন প্রদর্শিত হয়েছে। সেটি হল-

> স এষ এব সাম। এতং হ তং হীদং সর্বং সমেতম্। তস্মাদেষ এব সাম।[১১৪]

এই সেই পুরুষই সাম। কারণ এই সব ইন্দ্রিয়গুলি তাঁর সাথেই সম্যকভাবে গমন করে।

নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনে উপলব্ধ 'সমেতম্' ক্রিয়াপদ থেকে অনুমান করা যায় 'সম্' এই উপসর্গ পূর্বক গত্যর্থক √ইণ্-ধাতু (*ইণ গতৌ*) থেকে 'সাম' শব্দটি নিষ্পন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে (সম্-√ইণ্- ধাতু > সাম)। অতএব এটি অতিপরোক্ষনির্বচনপদ্ধতির অন্তর্গত।

সূর্য

জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ-এ তৃতীয় কাণ্ডে 'সূর্য' শব্দের নির্বচন প্রদর্শিত হয়েছে। নির্বচনটি হল-

> তং সর্বাণি ভূতানি সোঽর্যঃ সোঽর্য ইত্যাযন্। তত্ সৌর্যস্য সৌর্যত্বম্। সৌর্যো হ বৈ নামৈষ, তং সূর্য ইতি পরোক্ষমাচক্ষতে।[১১৫]

তাঁকে (আদিত্যকে) সকল প্রাণি বা ভূতসমূহ 'সোঽর্য' অর্থাৎ তিনি প্রভু বা স্বামী এইরূপ মনে করে গমন করেন। এখানেই সৌর্যের সৌর্যত্ব। সৌর্যই প্রকৃত নাম। তাঁকে পরোক্ষভাবে সূর্য এই নামে অভিহিত করা হয়।

নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনটির বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্টতই অনুমান করা যায় যথাক্রমে 'সোঽর্য' শব্দ থেকে 'সৌর্য' শব্দ উৎপন্ন হয়েছে এবং 'সৌর্য' শব্দই 'সূর্য' এই পরোক্ষ নাম প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সৌর্যের 'ঔ'-কারের স্থানে 'ঊ'-কার করে 'সূর্য' রূপ নিষ্পন্ন হয়। অতএব এটি পরোক্ষনির্বচনপদ্ধতির একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন (সোঽর্য > সৌর্য > সূর্য)।

হরি

'হরি' শব্দের নির্বচন *জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ*-এ প্রথম কাণ্ডে দৃষ্ট হয়। অহো-রাত্রি এবং প্রাণ-অপান এগুলি হরি বা হরী শব্দ দ্বারা অভিহিত হয়েছে। এদের হরিত্ব প্রতিপাদনরূপে বলা হয়েছে-

> অহোরাত্রৌ বা অস্য হরী। তৌ হীদং সর্বং হর্তারৌ হরতঃ।[১১৬]
>
> প্রাণাপানৌ বা অস্য হরী। তৌ হীদং সর্বং হর্তারৌ হরতঃ।[১১৭]

অর্থাৎ অহো ও রাত্রি এবং প্রাণ ও অপান কে হরি বলা হয় কারণ তাঁরা হরণকারী রূপে এই দৃশ্যমান সবকিছুই হরণ করেন।

নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনে প্রযুক্ত 'হর্তারৌ' এবং 'হরতঃ' এই পদগুলি থেকে সহজেই অনুমান করা যায় 'হৃঞ্ হরণে' (ভ্বাদিগণ পাণিনীয়ধাতুপাঠ ৮৯৯,) ধাতুই হরি শব্দের উৎস। '*হৃঞ্ হরণে*' ধাতুর সাথে 'ইন্' প্রত্যয় যুক্ত করে 'হরি' শব্দ নিষ্পন্ন করা যায় (*হৃঞ্ হরণে* ধাতু + 'ইন্' প্রত্যয় = হরি)। এখানে প্রাসঙ্গিক উণাদি সূত্রটি হল- হৃপিষিরুহিবৃতিবিদিছিদিকীত্তিভ্যশ্চ (উণাদিসূত্র ১/৯৭)।

২.৬.৩. *জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ*-এ প্রাপ্ত নির্বচনপদ্ধতি

এই সামবেদীয় ব্রাহ্মণগ্রন্থটিতে প্রদর্শিত ১৪টি শব্দের নির্বচন যাস্কাচার্যের নির্বচনপদ্ধতি অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা হল-

অক্ষর

জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ-এর প্রথমাধ্যায়ের আকাশ থেকে বাক্, পৃথিব্যাদি সৃষ্টি বর্ণনাকালে 'ওম্' এই 'অক্ষর' উৎপত্তির কথাও বলা হয়েছে। 'ওম্' কে 'অক্ষর' বলার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে-

> তদক্ষরদেব। যদক্ষরদেব তস্মাদক্ষরম্। যদ্বেবাক্ষরং নাক্ষীযত তস্মাদক্ষযম্। অক্ষযং হ বৈ নামৈতত্। তদক্ষরমিতি পরোক্ষমাচক্ষতে।[১১৮]

অর্থাৎ সেটি ক্ষরিতই হয়েছিল। যেহেতু ক্ষরিত হয়েছিল তাই অক্ষর। অথবা যা অক্ষর অর্থাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়না তাই অক্ষয়। অক্ষয়-ই নাম, সেটি পরোক্ষভাবে অক্ষর নামে অভিহিত হয়।

নির্বচনপদ্ধতি

অক্ষর শব্দের নির্বচনে নামরণের দুটি হেতুর কথা বলা হয়েছে। প্রথমত ক্ষরণার্থক √ক্ষর্–ধাতু থেকে 'অক্ষর' শব্দটি উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, 'নঞ্' পূর্বক '*ক্ষি ক্ষযে*' ধাতু থেকে 'অক্ষর' শব্দের উৎপত্তি

উক্ত হয়েছে ('নঞ্'- *ক্ষি ক্ষয়ে* >অক্ষয়> অক্ষর) কিন্তু পাণিনীয় উণাদিসূত্র 'অশেঃ সরন্' (উণাদিসূত্র ৩/৭০) অনুসারে *অশূঙ্ ব্যাপ্তৌ* ধাতুর সাথে 'সরন্' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'অক্ষর' শব্দটি ব্যুৎপন্ন হয়েছে (√অশ্ + সরন্)। অতএব পরোক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে শব্দটি নির্বচিত হয়েছে।

অন্তরিক্ষ

বিংশতিকাণ্ডের প্রথমেই 'অন্তরিক্ষ' বিষয়ে আলোচনাকালে শব্দটির নির্বচন করা হয়েছে, সেটি হল-

> তস্মিন্নিদং সর্বমন্তঃ। তদ্যদস্মিন্নিদং সর্বমন্তস্তস্মাদন্তর্যক্ষম্। অন্তর্যক্ষং হ বৈ নামৈতত্। তদন্তরিক্ষমিতি পরোক্ষমাচক্ষতে।[১১৯]

অর্থাৎ সেখানে এই লোক সবকিছুর অন্তর্বর্তী। যেহেতু এই লোক সবকিছুর অন্তঃ বা মধ্যে অবস্থিত তাই 'অন্তর্যক্ষ' এই সংজ্ঞা। অন্তর্যক্ষই নাম, সেটি পরোক্ষভাবে 'অন্তরিক্ষ' নামে অভিহিত হয়।

নির্বচনপদ্ধতি

শব্দটির নির্বচন থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে এখানে শব্দটি পরোক্ষনির্বচনপদ্ধতিতেই নির্বচিত হয়েছে। 'অন্তর্যক্ষ' শব্দ থেকে 'অন্তরিক্ষ' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে অর্থাৎ অন্তর্ যক্ষ > অন্তরিক্ষ (যকারের স্থানে ইকার হয়েছে ধ্বনিপরিবর্তনের মাধ্যমে)।

অযাস্য

প্রাণাপানাদির দ্বারা দেবমনুষ্যাদিলোকে দেবতা, মনুষ্য প্রভৃতিদের স্থাপন প্রসঙ্গে অযাস্য শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং শব্দটি নির্বচিতও হয়েছে। নির্বচনটি হল-

> তেঽব্রুবন্নযং বা আস্য ইতি। যদব্রুবন্নযং বা আস্য ইতি তস্মাদযমাস্যঃ। অযমাস্যো হ বৈ নামৈষঃ। তমযাস্য ইতি পরোক্ষমাচক্ষতে।[১২০]

অর্থাৎ তারা (অসুরগণ) বললেন এটি আস্য। যেহেতু বলেছিলেন 'অযম্ আস্য' অর্থাৎ এটি আস্য বা মুখ তাই 'অযমাস্য' এই নামকরণ হয়। প্রকৃতপক্ষে এটি 'অযমাস্য'ই কিন্তু 'অযাস্য' এই পরোক্ষ নামেই পরিচিত।

নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অযমাস্য শব্দই অযাস্য শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে (অযমাস্য > অযাস্য)। অতএব অযম্ শব্দের মকার লোপ হয়ে অয (ম্ লোপ) + আস্য = অযাস্য রূপটি সিদ্ধ হয়েছে। এটিও পরোক্ষনির্বচনপদ্ধতির অন্তর্গত বলা যায়।

অসুর

জৈমিনীয়োপনিষদব্রাহ্মণে 'অসুর' শব্দের নির্বচন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

> মনো বা অসুরম্। তদ্ধ্যসুষু রমতে।[১২১]

মনই অসুর, কারণ তা অসু অর্থাৎ প্রানে রমন করে।

নির্বচনপদ্ধতি

এখানে 'অসুর' শব্দটি 'অসু' শব্দের সাথে √রম্-ধাতু যুক্ত হয়েই নিষ্পন্ন হয়েছে। √রম্ ধাতু নিষ্পন্ন রমতে ক্রিয়াপদ থেকে রকার গৃহীত হয়েছে এবং তা অসু শব্দের সাথে সংযোগ স্থাপনের দ্বারাই পদটি সিদ্ধ হয়েছে। অতএব অনুমান করা যায় এখানে পরোক্ষনির্বচনপদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

আঙ্গিরস

সামবেদীয় এই উপনিষদে অগ্নি, আদিত্য, চন্দ্রাদি সৃষ্টি বর্ণনাকালে অযাস্য আঙ্গিরসের উল্লেখ নির্বচন সহযোগে পাওয়া যায়, সেটি হল-

> স এষ এব আঙ্গিরসঃ। অতো হীমান্যঙ্গানি রসং লভন্তে। তস্মাদাঙ্গিরসঃ। যদ্বৈবৈষামঙ্গানাং রসস্তস্মাদ্বৈবাঙ্গিরসঃ।[১২২]

অর্থাৎ এই তিনিই (অযাস্য) আঙ্গিরস। যেহেতু এই অঙ্গসমূহ রস লাভ করে সেহেতু আঙ্গিরস। অথবা যেহেতু এইসব অঙ্গসমূহের রসস্বরূপ তাই 'আঙ্গিরস' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

নির্বচনপদ্ধতি

'আঙ্গিরস' শব্দের ব্যাকরণগত অর্থ পাওয়া যায় অঙ্গিরস ঋষির পুত্র। 'অঙ্গিরস্' শব্দের সাথে অপত্যর্থে 'অণ্' প্রত্যয় যুক্ত করে 'আঙ্গিরস' শব্দ নিষ্পন্ন হয় (অঙ্গিরস্ + অণ্ = আঙ্গিরস)। কিন্তু আলোচ্য নির্বচনে 'আঙ্গিরস' বলা হয়েছে কারণ যা অঙ্গসমূহের রস বা সারস্বরূপ, অথবা অঙ্গসমূহ দ্বারা লব্ধ রস এই বিগ্রহ স্বরূপ। অর্থাৎ 'অঙ্গ' এবং 'রস' এই সুবন্ত শব্দদুটি যুক্ত হয়ে 'আঙ্গিরস' শব্দ উৎপন্ন হয়েছে (অঙ্গ + রস = আঙ্গিরস)। অতএব পরোক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে শব্দটি নির্বচিত হয়েছে বলা যায়।

আদিত্য

প্রাণসমূহকে 'আদিত্য' সংজ্ঞা দেওয়ার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে-

> প্রাণা বা আদিত্যাঃ। প্রাণা হীদং সর্বমাদদতে।[১২৩]

অর্থাৎ প্রাণসমূহই আদিত্য কারণ প্রাণসমূহই এই সবকিছু আদান বা গ্রহণ করেন।

নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনটির বিশ্লেষণ থেকে অনুমান করা যায় যে, 'আদদতে' ক্রিয়াপদটি 'আদিত্য' শব্দের উৎপত্তির কারণ। অর্থাৎ 'আ' এই উপসর্গ √দা-ধাতু থেকে 'আদিত্য' শব্দ ব্যুৎপন্ন হয়েছে। সবকিছু আদান বা গ্রহণ করেন বলেই আদিত্য। যদিও ব্যাকরণ অনুসারে 'অদিতির পুত্র' এই অর্থে 'অদিতেঞ্য্' সূত্র দ্বারা 'অদিতি' শব্দের সাথে 'ঞ্য' প্রত্যয় যুক্ত করে 'আদিত্য' শব্দটি গঠিত হয়। অতএব অনুমান করা যায় পরোক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে আদিত্য শব্দটির নির্বচন করা হয়েছে।

আবর্ত

'আবর্ত' শব্দের নির্বচন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

> স এষ ব্রাহ্মণ আবর্তঃ। স য এবমেতদ্ব্রহ্মণ আবর্তং বেদাঽভ্যেনম্প্রজাঃ পশব আবর্তন্তে সর্বমায়ুরেতি।[১২৪]

অর্থাৎ এই সেই ব্রাহ্মণ আবর্তস্বরূপ (কারণ) তিনি এইরূপে ব্রহ্মের আবর্ত জানেন যে, সকল প্রজা, পশু এই ব্রহ্মের অভিমুখে আবর্তিত হয় বা গমন করে, সকলের আয়ু গমন করে (ব্রহ্মের অভিমুখে)।

নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনস্থিত 'আবর্তন্তে' ক্রিয়াপদ থেকে 'আবর্ত' শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে অনুমান করা যায় অর্থাৎ 'আ' এই উপসর্গ পূর্বক √বৃত্-ধাতু (*বৃতু বর্তনে)* থেকে 'আবর্ত' শব্দের উৎপত্তি বলা যায়। অতএব এটি প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতির অন্তর্গত বলা যায়।

ঋচ্

জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ অনুসারে 'ঋচ্' শব্দের নির্বচনটিহল-

> অথেমানি প্রজাপতিররৃকপদানি শরীরাণি সঞ্চিত্যাভ্যর্চত্। যদভ্যর্চত্তা এবর্চোঽভবন্।[১২৫]

অর্থাৎ অনন্তর, প্রজাপতি এই ঋক্ পদগুলি এবং শরীরসমূহ সঞ্চয় করে অভ্যর্চনা করেন। যেহেতু সেগুলি অভ্যর্চিত হয়েছিল তাই সেগুলিই 'ঋচ্' হয়েছিল।

নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনস্থিত 'অর্চত্' এই ক্রিয়াপদ থেকে জানা যায় 'অর্চ পূজাযাম্' ধাতু থেকে 'ঋচ্' শব্দ ব্যুৎপন্ন হয়েছে (√অর্চ্ > ঋচ্)। অতএব পরোক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে শব্দটি নির্বচিত হয়।

গাযত্র

> তমেতদেব সাম গাযন্নত্রাযত। যদ্গাযন্নত্রাযত তদ্গাযত্রস্য গাযত্রত্বম্।[১২৬]

অর্থাৎ তাঁকে (প্রজাপতিকে) এই সাম গান করেই রক্ষা করেছিলেন। যেহেতু গান করতে করতে রক্ষা করেছিলেন তাই 'গায়ত্র' শব্দের 'গায়ত্রত্ব' সিদ্ধ হয়।

নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনে উল্লিখিত 'গাযন্নত্রাযত' এই ক্রিয়াপদ থেকে গায়ত্র শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। √গৈ-ধাতু নিষ্পন্ন 'গায়ন্' থেকে 'গায়' অংশ এবং √ত্রৈ-ধাতু থেকে জাত 'অত্রায়ত' থেকে 'ত্র' গৃহীত হয়ে 'গায়ত্র' শব্দ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ (√গৈ-ধাতু + √ত্রৈ-ধাতু > গায়ত্র)। অতএব নির্বচনটি অতিপরোক্ষপদ্ধতির নির্বচন বলা যায়।

রুদ্র

রুদ্রের রুদ্রত্ব প্রতিপাদন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

> প্রাণা বৈ রুদ্রাঃ। প্রাণা হীদং সর্বং রোদযন্তি।[১২৭]

অর্থাৎ প্রাণসমূহই রুদ্র কারণ তাঁরাই এই সবকিছুকে বা সবাইকে রোদন করান।

নির্বচনপদ্ধতি

'রোদযন্তি' ক্রিয়াপদ থেকে রুদ্র শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায়। ণিজন্ত রুদ্ ধাতু (*রুদির্ অশ্রুবিমোচনে,* অদাদিগণ, ১০৬৭) থেকে রুদ্র শব্দের উৎপত্তি হয়েছে (√রুদ্-ধাতু + ণিচ্ + রক্ = রুদ্র)। উক্ত ব্যুৎপত্তি ব্যাকরণগত শব্দগঠন প্রক্রিয়ার অনুরূপ। 'রোদের্ণিলুক্ চ' (উণাদিসূত্র ২/২২) এই উণাদিসূত্র দ্বারা শব্দটি গঠিত হয়। অতএব শব্দটি ব্যাকরণ অনুসারী প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতির অন্তর্গত বলা যায়।

বৈশ্বামিত্র

তৃতীয় অধ্যায়ে 'বৈশ্বামিত্র' উক্থেরও বর্ণনা করা হয়েছে। এই শব্দের নির্বচনস্বরূপ বলা হয়েছে-

> তদেতদ্বৈশ্বামিত্রমুক্থম্। তদন্নং বৈ বিশ্বম্প্রাণো মিত্রম্।[১২৮]

এটিই বৈশ্বামিত্র উক্থ, যেখানে অন্নই বিশ্ব এবং প্রাণকে মিত্র হিসাবে গণ্য করা হয়।

নির্বচনপদ্ধতি

অন্নরূপ 'বিশ্ব' এবং প্রাণরূপ 'মিত্র' একত্রে অবস্থান করেই বিশ্বামিত্রের উৎপত্তি। অতএব 'বিশ্ব + মিত্র = বিশ্বামিত্র', তৎ সম্পর্কিত উক্থ হয়ায় 'বিশ্বামিত্র' শব্দের উত্তর 'অণ্'-প্রত্যয় সংযুক্ত হয়ে 'বৈশ্বামিত্র' শব্দের উৎপত্তি সিদ্ধ হয়। শব্দটি ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হলেও শব্দগঠন প্রক্রিয়াকে অনুসরণ করায় এটি প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতির অন্তর্গত।

সমুদ্র

জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ-এ অবস্থিত 'সমুদ্র' শব্দের নির্বচনটি আদিত্যের বর্ণনাকালে উল্লেখিত হয়েছে। আদিত্য সমুদ্র দ্বারা গৃহীত হলে সেটি মৃত্যুস্বরূপ এবং তার ঠিক অন্য অবস্থা হল অমৃতাবস্থা। সমুদ্রের সমুদ্রত্ব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

> এষ এব স সমুদ্রঃ। এতং হি সংদ্রবন্তং সর্বাণি ভূতান্যনুসংদ্রবন্তি।[১২৯]

অর্থাৎ এই সেই সমুদ্র, সম্যকভাবে দ্রবীভূত এই সমুদ্রেই সকল ভূত বা জাত বস্তু সম্পূর্ণভাবে দ্রবীভূত হয়।

নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনস্থিত 'সংদ্রবন্তি' এই ক্রিয়াপদ থেকে সমুদ্র শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে সঙ্কেত পাওয়া যায়। 'সম্' এই উপসর্গপূর্বক √দ্রু-ধাতুর প্রথম পুরুষ একবচনের রূপ 'সংদ্রবন্তি'। সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হয় বা সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত করে তাই সমুদ্র এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সম্ উপসর্গ ও √দ্রু ধাতু থেকে সমুদ্র শব্দের উৎপত্তি (সম্- √দ্রু-ধাতু > সমুদ্র)। পরন্তু ব্যাকরণ অনুসারে 'সম্' উপসর্গপূর্বক √উন্দ্-ধাতুর উত্তর 'রক্' প্রত্যয় যুক্ত করে 'সমুদ্র' পদটি সিদ্ধ হয় (সম্- √উন্দ্ ধাতু + রক্ প্রত্যয় = সমুদ্র, উণাদিসূত্র ২/১৩)। অতএব ব্যাকরণগত সংস্কারের অনুরূপ না হওয়ায় নির্বচনটি পরোক্ষনির্বচনপদ্ধতির অন্তর্গত বলা যায়।

সিন্ধু

জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বিষয়ে আলোচনাকালে 'সিন্ধু' শব্দের নিরুক্তি করা হয়েছে। নির্বচনটি হল-

> সপ্তহ্যেতেসিন্ধবঃ। তৈরিদং সর্বং সিতম্। তদ্যদেতৈরিদং সর্বং সিতং তস্মাৎসিন্ধবঃ।[১৩০]

এই সিন্ধু সাতটি। তাদের দ্বারাই সবকিছু সিত হয়। যেহেতু এগুলির দ্বারা সবকিছু সিত হয় তাই এগুলি 'সিন্ধু' নামে পরিচিত।

নির্বচনপদ্ধতি-

'*ষিঞ্ বন্ধনে*' ধাতু + 'ক্ত' = সিত 'অঞ্জিঘৃসিভ্যঃ ক্তঃ' (উণাদিসূত্র ৩/৮৯)। অতএব 'ষি' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন 'সিতম্' এই ক্রিয়াপদ থেকে 'সিন্ধু' শব্দের উৎপত্তি (সিতম্ > সিন্ধু) সি এই আদ্যংশের বর্ণাক্ষরগত সাম্য লক্ষিত হওয়ায় এটি অতিপরোক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে নির্বচিত হয়েছে। 'সিন্ধু' শব্দের ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তি হল- √স্যন্দ্-ধাতু + 'উ' প্রত্যয় = সিন্ধু (দকারের স্থানে ধকার হয়)। প্রাসঙ্গিক উণাদি সূত্রটি হল- 'স্যন্দেঃ সম্প্রসারণং ধশ্চ' (উণাদিসূত্র ১/১১)।

হরি

সহস্রং হ্যৈত আদিত্যস্য রশ্ময়ঃ। তেঽস্য (রশ্ময়ঃ) যুক্তাস্তৈরিদং সর্বং হরন্তি। তদ্যদেতৈরিদং সর্বং হরতি তস্মাদ্ধরয়ঃ।[১৩১]

অর্থাৎ আদিত্যের সহস্রসংখ্যক রশ্মি। এই রশ্মিসমূহ (সর্বদা) যুক্ত থাকে, ওই রশ্মিগুলির দ্বারাই সূর্য সবকিছু হরণ করে। যেহেতু এগুলির দ্বারাই সমস্ত কিছু হরণ করেন তাই রশ্মিসমূহকে 'হরি' নামে অভিহিত করা হয়।

নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনটির বিশ্লেষণ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, সব কিছু হরণ করেন বলেই তিনি 'হরি' অর্থাৎ শব্দটি √হৃ-ধাতু থেকে উৎপন্ন (√হৃ ধাতু + ইন্ প্রত্যয় = হরি)। ব্যাকরণগত সংস্কারকে অনুসরণ করেই নির্বচিত হয়েছে কারণ 'হৃপিষিরুহিবৃতিবিদিছিদিকীত্তিভ্যশ্চ' (উণাদিসূত্র ১/৯৭) এই উণাদি সূত্র অনুসারে √হৃ ধাতুর সাথে 'ইন্' প্রত্যয় যুক্ত করেই 'হরি' শব্দটি উৎপন্ন হয়। অতএব অনুমান করা যায়, বর্তমান নির্বচনটি প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে নির্বচিত হয়েছে।

২.৬.৪. *কেনোপনিষদ্-এ* প্রাপ্ত নির্বচনপদ্ধতি

কেনোপনিষদ্ সামবেদীয় ব্রাহ্মণসাহিত্যের অন্তর্গত একটি উপনিষদ্ গ্রন্থ। গ্রন্থটি চারটি খণ্ডে বিভক্ত। *জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ*-এর সপ্তম অধ্যায় বা *উপনিষদ্ব্রাহ্মণ*-এর চতুর্থ অধ্যায়ের অষ্টাদশ থেকে একবিংশ খণ্ড পর্যন্ত অংশ নিয়ে বিরাজিত। এখানে ব্রহ্ম বিষয়ে বিবৃতি প্রদান ও তাঁকে লাভ করার উপায় বর্ণনাকালে তিনি 'তদ্বনম্' এই অভিধায় ভূষিত হয়েছেন।

এই উপনিষদে কেবলমাত্র 'তদ্বনম্' বা 'তদ্বন' শব্দের নির্বচন লক্ষ্য করা যায়, সেটি হল-

তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যং স য এতদেবং বেদাঽভিহৈনং সর্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি।[১৩২]

অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম অবশ্যই প্রাণিবর্গের সম্ভজনীয় (তদ্বন) এই নামধারী, অতএব প্রাণিগণ কর্তৃক সম্ভজনীয়রূপেই উপাস্য। যে কেউ এই ব্রহ্মকে এইরূপে উপাসনা করেন তাঁকে সকল ভূতবর্গ অবশ্যই পার্থনা করে থাকেন।

নির্বচনপদ্ধতি

'তদ্বনম্' শব্দের নির্বচন প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য বলেছেন – "তদ্ ব্রহ্ম হ কিল তদ্বন নাম তস্য বনং তদ্বনং তস্য প্রাণিজাতস্য প্রত্যগাত্মভূতত্বাদ্বনং বননীযং সম্ভজনীযম্। অতঃ তদ্বং নাম"।[১৩৩]

অতএব বলা যায় 'তদ্বন' শব্দের উৎপত্তি ব্যাকরণ অনুসারেই সিদ্ধ হয়েছে। 'তস্য বনম্ তদ্বনম্'- এইরূপ বিগ্রহবাক্য দ্বারা পদটি সিদ্ধ হয়। তাই বলা যায় প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে নিরুক্তি করা হয়েছে।

২.৬.৫. *ছান্দোগ্যোপনিষদ্*-এ প্রাপ্ত নির্বচনপদ্ধতি

ছান্দোগ্যোপনিষদ্-এ বিবিধ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আলোচনাবসরে অর্থবোধের সহায়করূপে প্রাসঙ্গিক শব্দসমূহের নিরুক্তি প্রদর্শিত হয়েছে। এই উপনিষদে প্রাপ্ত ১৭ টি শব্দের নির্বচনপদ্ধতির অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া যাক-

আঙ্গিরস

ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ডে মুখ্য প্রাণের বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রাণকে 'আঙ্গিরস' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তার হেতুস্বরূপ নির্বচনটি প্রদর্শিত হয়েছে-

তং হাঙ্গিরা উদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রে এতমু এবাঙ্গিরসং মন্যন্তেঽঙ্গাণাং যদ্রসঃ।[১৩৪]

তাঁকে (সেই মুখ্য প্রাণকে) ঋষি অঙ্গিরা উদ্গাতারূপে উপাসনা করেছিলেন। এই প্রাণকেই আঙ্গিরস মনে করা হয় যেহেতু প্রাণ সমগ্র অঙ্গের রসস্থানীয়।

নির্বচনপদ্ধতি

'আঙ্গিরস' শব্দের ব্যাকরণগত অর্থ পাওয়া যায় অঙ্গিরস ঋষির পুত্র। 'অঙ্গিরস্' শব্দের সাথে অপত্যর্থে 'অণ্' প্রত্যয় যুক্ত করে 'আঙ্গিরস' শব্দ নিষ্পন্ন হয় (অঙ্গিরস্ + অণ্ = আঙ্গিরস)। কিন্তু আলোচ্য নির্বচনে প্রাণকে 'আঙ্গিরস' বলা হয়েছে কারণ প্রাণই অঙ্গসমূহের রস বা সারস্বরূপ, প্রাণ শরীর থেকে নির্গত হলে শরীর শুষ্ক হয়ে যায়। অর্থাৎ 'অঙ্গ' এবং 'রস' এই সুবন্ত শব্দদুটি যুক্ত হয়ে 'আঙ্গিরস' শব্দ উৎপন্ন হয়েছে (অঙ্গ + রস = আঙ্গিরস)। অতএব পরোক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে শব্দটি নির্বচিত হয়েছে বলা যায়।

আদিত্য

ছান্দোগ্যোপনিষদ্-এ পুরুষকে স্বয়ং যজ্ঞরূপে উপাসনার কথা বলা হয়েছে এবং সেখানেই প্রসঙ্গক্রমে 'আদিত্য' এই শব্দের নামকরণের কারণ প্রদর্শিত হয়েছে-

> প্রাণা বাবাদিত্যা এতে হিদং সর্বমাদদতে।[১৩৫]

অর্থাৎ প্রাণসমূহই আদিত্য, কারণ এরাই ভূতবর্গকে আদান বা গ্রহণ করে থাকে।

নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনটির বিশ্লেষণ থেকে অনুমান করা যায় যে, 'আদদতে' ক্রিয়াপদটি 'আদিত্য' শব্দের উৎপত্তির কারণ। অর্থাৎ 'আ' এই উপসর্গ √দা-ধাতু থেকে 'আদিত্য' শব্দ ব্যুৎপন্ন হয়েছে। সবকিছু আদান বা গ্রহণ করেন বলেই আদিত্য। যদিও ব্যাকরণ অনুসারে 'অদিতির পুত্র' এই অর্থে 'অদিতেঞ্ঞ্য' সূত্র দ্বারা 'অদিতি' শব্দের সাথে 'ঞ্য' প্রত্যয় যুক্ত করে 'আদিত্য' শব্দটি গঠিত হয়। অতএব অনুমান করা যায় পরোক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে আদিত্য শব্দটির নির্বচন করা হয়েছে।

আযাস্য

ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ডে মুখ্য প্রাণের বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রাণকে 'আযাস্য' বলা হয়েছে। এই নামকরণের হেতু হিসাবে বলা হয়েছে-

> তেন তং হাযাস্য উদ্গীথমুপাসাংচক্র এতমু এবাযাস্যং মন্যন্ত আস্যাদ্ যদযতে।[১৩৬]

আযাস্য তাঁকে (প্রাণকে) উদ্গীথকর্তারূপে উপাসনা করেছিলেন, একে (এই প্রাণকে ঋষিরা) আযাস্য মনে করেন যেহেতু আস্য হতেই এটির অয়ন বা গমন হয়ে থাকে।

নির্বচনপদ্ধতি

'আযাস্য' শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে নির্বচনস্থিত 'আস্যাদযতে' অংশটি বিশেষ গুরুত্ব বাহক। আস্য শব্দ এবং √ইণ্-ধাতু নিষ্পন্ন অযন শব্দ বর্ণবিপর্যয়ের দ্বারা আযাস্য রূপটি পাওয়া যায় (আস্য + অয>যঅ> যা। আস্য +যা = আযাস্য)। অতএব পরোক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে শব্দটি নিরুক্তি করা হয়েছে।

উদ্গীথ

ব্যানরূপে উদ্গীথের উপাসনা বর্ণনার পর উদ্গীথের অক্ষরসমূহের উপাসনার কথা বলা হয়েছে। সেখানে প্রাণ, বাক্য ইত্যাদি রূপে বর্ণিত হয়েছে। এখানেই নির্বচনটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে। সেটি হল-

অথ খলূদ্গীথাক্ষরাণ্যুপাসীতোদ্গীথ ইতি প্রাণ এবোৎপ্রাণেন হ্যুতিষ্ঠতি বাগ্গীর্বাচো হ গির ইত্যাচক্ষতেঽন্নং থমন্নে হীদং সর্বং স্থিতম্।[১৩৭]

তারপর উদ্গীথের নামের অক্ষরসকলকে অর্থাৎ 'উত্', 'গী' ও 'থ' এই অক্ষরতিনটিকে উপাসনা করবে। প্রাণই 'উত্' কারণ প্রাণসহায়েই লোক উত্থিত হয়। বাক্যই 'গী' কারণ বাক্যসমূহকে 'গী' নামে অভিহিত করা হয়। অন্নই 'থ' কারণ অন্নাবলম্বনেই এই সমস্ত স্থিতি লাভ করে।

নির্বচনপদ্ধতি

উদ্গীথ শব্দের অন্তর্গত 'উৎ', 'গী' এবং 'থ' এই অংশগুলি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে। যেমন উৎ এই আদ্যংশটি উত্তিষ্ঠতি এই ক্রিয়াপদ থেকে নেওয়া হয়েছে, 'গী' এই মধ্যাংশটি 'গির' শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে এবং 'থ' এই অন্তিমাংশ 'স্থিত' অর্থাৎ 'স্থা' ধাতু থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। অবশেষে এগুলি সংযুক্ত হয়ে উদ্গীথ শব্দ উৎপন্ন হয়। অতএব অতিপরোক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে নির্বচন করা হয়েছে।

দৌরেবোদন্তরিক্ষং গীঃ পৃথিবী থমাদিত্য এবোদ্বায়ুর্গীরগ্নিস্থম্য সামবেদ এবোদ্যজুর্বেদো গী ঋগ্বেদোস্থং দুগ্ধেঽস্মৈ বাগ্দোহং যো বাচো দোহো...।[১৩৮]

অর্থাৎ দ্যুলোক হল 'উত্', অন্তরিক্ষ 'গী', পৃথিবীই 'থম্', আদিত্যই 'উত্', বায়ুই 'গী', এবং অগ্নিই 'থম্', সামবেদ ''উত্, যজুর্বেদ 'গী', ঋগ্বেদ 'থম্'।

নির্বচনপদ্ধতি

শঙ্করাচার্যের উক্তি অনুযায়ী এখানেও উদ্গীথ শব্দের 'উৎ' যথাক্রমে 'উচ্চৈঃ' এবং 'ঊর্ধ্ব' শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে, 'গী' অংশটি তিনটি ক্ষেত্রেই √গৃ-ধাতু নিষ্পন্ন 'গিরণ' ক্রিয়াপদ থেকে এবং 'থ' √স্থা-ধাতু থেকে নেওয়া হয়েছে। অতএব এখানেও উদ্গীথ শব্দটি অতিপরোক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে নির্বচিত হয়েছে।

উপদ্রব

ছান্দোগ্যোপনিষদে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আদিত্য বিষয়ক সাতপ্রকার সামের বর্ণনাকালে 'উপদ্রব' নামক সামটির বর্ণনায় শব্দটির অর্থ ও উৎপত্তি বিষয়ে ধারণা দেওয়া হয়েছে, সেটি হল-

যদূর্ধমপরাহ্ণাৎপ্রাগস্তমযাৎস উপদ্রবস্তদস্যারণ্যা অন্বাযত্তাস্তস্মাত্তে পুরুষং দৃষ্ট্বা কক্ষং শ্বভ্রমিত্যুপদ্রবন্ত্যুপদ্রবভাজিনো হ্যেতস্য সান্নঃ।[১৩৯]

অতঃপর অপরাহ্ণের পরবর্তী এবং অস্তগমনের পূর্ববর্তী আদিত্যের যে স্বরূপ তাকে বলা হয় উপদ্রব। বন্যপশুরা আদিত্য নামক সামের ওই রূপের অনুগমন করে। তাই তারা (তারা আদিত্যাখ্য সামের ওই উপদ্রবাবয়বের ভজনা করে বলেই) মানুষ দেখা মাত্রই ভয়ভীত হয়ে অরণ্য ও গুহাকে ভয়হীন মনে করে সেইদিকেই উপদ্রুত হয় (ধাবিত হয়)।

নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনস্থিত উপদ্রবন্তি এই ক্রিয়াপদ থেকে উপদ্রব শব্দের নিষ্পত্তি সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। 'উপ' উপসর্গ পূর্বক √দ্রু-ধাতু থেকে নিষ্পন্ন 'উপদ্রবন্তি' ক্রিয়াপদটি। অতএব সামের বাচক 'উপদ্রব' শব্দের মূলে রয়েছে 'উপ' এই উপসর্গ পূর্বক √দ্রু-ধাতুর (*দ্রু গতৌ*, ভ্বাদিগণ, ৯৪৫) সাথে সংযুক্ত 'অপ্' প্রত্যয় (উপ-√দ্রুধাতু + অপ্ = উপদ্রব)। সম্পূর্ণভাবে ব্যাকরণগত শব্দগঠন প্রক্রিয়ায় নির্বচিত হওয়ায় এটি প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতির অন্তর্গত।

গায়ত্রী

গায়ত্রী ছন্দ দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা বর্ণনাকালে 'গায়ত্রী' শব্দের উৎপত্তি বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে-

> গাযত্রী বা ইদং সর্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ বাগ্বৈ গাযত্রী বাগ্বা ইদং সর্বং ভূতং গাযতি চ ত্রাযতে চ।[১৪০]

এই যা কিছু (স্থাবর ও জঙ্গম) প্রাণিবর্গ (আছে) এই সমস্ত অবশ্যই 'গায়ত্রী'। বাক্ প্রাণিবর্গের গান করে এবং ভয় দুর করে অথবা ত্রাণ করে বলে বাক্ই গাযত্রী।

নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনটি পর্যালোচনার দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায় যে 'গায়তি' ও 'ত্রায়তে' এই দুই ক্রিয়াপদ থেকে 'গায়ত্রী' শব্দের উৎপত্তি। √গৈ-ধাতু নিষ্পন্ন 'গায়তি' থেকে 'গায়' অংশ এবং √ত্রৈ-ধাতু থেকে জাত 'ত্রায়তে' থেকে 'ত্র' গৃহীত হয়ে 'গায়ত্র' শব্দ উৎপন্ন হয়। তারপর অন্ত্যস্বর অকারের দীর্ঘ-ঈকারে পরিবর্তন করে 'গায়ত্রী' রূপটি পাওযা যায় (√গৈ-ধাতু + √ত্রৈ-ধাতু > গায়ত্র > গায়ত্রী)। অতএব নির্বচনটি অতিপরোক্ষপদ্ধতির নির্বচন বলা যায়।

নিধন

ছান্দোগ্যোপনিষদে 'নিধন' নামক আদিত্যাখ্য সামের বর্ণনায় শব্দটির উৎপত্তি বা অর্থ প্রসঙ্গে বিশেষ ধারণা পাওয়া যায়, সেটি হল-

> অথ যৎপ্রথমাস্তমিতে তন্নিধনং তদস্য পিতরোঽন্বাযত্তাস্তস্মাত্তান্নিদধতি নিধনভাজিনো হ্যেতস্য সান্নঃ।[১৪১]

অতঃপর, সূর্যাস্তের পূর্বে আদিত্যের যে রূপ, সেটি 'নিধন' নামে পরিচিত। পিতৃপুরুষগণ তাঁর এইরূপের অনুগত। তাই তাঁদের (শ্রাদ্ধকালে কুশের ওপর) নিহিত বা স্থাপিত করা হয়, যেহেতু আদিত্যাখ্য সামের 'নিধন' নামক অংশের ভজনা করেন।

নির্বচনপদ্ধতি

'নিধন' শব্দের উৎপত্তিতে নিহিত বা স্থাপিত ক্রিয়াপদের অর্থ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নির্বচনে অবস্থিত 'নিদধতি' ক্রিয়াপদটি 'নি' পূর্বক √ধা-ধাতু থেকে জাত। কুশের ওপর নিহিত হয় বলেই আদিত্যাখ্য সাম নিধন নাম প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নি-ধা-ধাতু নিষ্পন্ন নিধন এই শব্দটি। তবে নিধন শব্দটি ব্যাকরণগত প্রক্রিয়া অনুসারে ধনহীন, বিনাশ, মৃত্যু ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত হয়, যেমন 'নিবৃত্তং ধনং যস্য সঃ' এইরূপ বহুব্রীহিসমাস নিষ্পন্ন বিগ্রহ দ্বারা ধনহীন অর্থ পাওয়া যায়। অতএব বলা যায় 'নিধন' শব্দটির ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তি অর্থের অনুরূপ নয়। তাই অনুমান করা যায়, পরোক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে শব্দটি নির্বচিত হয়েছে।

প্রতিহার

সামবেদীয় এই উপনিষদে আদিত্য বিষয়ক সাতপ্রকার সামের উপাসনার বর্ণনা প্রসঙ্গে 'প্রতিহার' নামক সামেরও বিধান লক্ষ্য করা যায়। এখানেই 'প্রতিহার' শব্দের অর্থ নির্বচন দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে-

> অথ যদূর্ধ্বং মধ্যন্দিনাৎপ্রাগপরাহ্ণাৎস প্রতিহারস্তদস্য গর্ভা অন্বাযত্তাস্তস্মাত্তে প্রতিহৃতা নাবপদ্যন্তে প্রতিহারভাজিনো হ্যেতস্য সান্নঃ।[১৪২]

তারপর মধ্যাহ্নের পরে এবং অপরাহ্নের পূর্বে আদিত্যের যে রূপ সেটিই প্রতিহার, গর্ভস্থিত সন্তান সেই আদিত্য নামক সামের ওই রূপের অনুগমন করে। তারা আদিত্যাখ্য সামের ওই প্রতিহাররূপ অবয়বের ভজনা করে বলেই (জরায়ুর মধ্যে) আকর্ষিত হয় অর্থাৎ পতন হতে প্রতিহৃত হয়ে থাকে, নিম্নে পতিত হয়না।

নির্বচনপদ্ধতি

'প্রতিহার' শব্দের নির্বচনে 'প্রতিহৃতা' ক্রিয়াপদের উপস্থিতি থেকে শব্দটির উৎপত্তি বিষয়ে সংকেত পাওয়া যায়। বলা যায়, 'প্রতি' এই উপসর্গ পূর্বক √হৃ-ধাতুর সাথে 'ঘঞ্' প্রত্যয় যুক্ত করে 'প্রতিহার' শব্দটি নিষ্পাদিত হয়েছে এবং এটি ব্যাকরণগত শব্দগঠন প্রক্রিয়া অবলম্বনেই গঠিত হয়েছে। অতএব শব্দটি প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে নির্বচিত হয়েছে।

বৃহস্পতি

ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ডে মুখ্য প্রাণের বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রাণকে 'বৃহস্পতি' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তার হেতুস্বরূপ নির্বচনটি প্রদর্শিত হয়েছে-

> তেন তংহ বৃহস্পতিরুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রে এতমু এব বৃহস্পতিং মন্যন্তে বাগ্ঘি বৃহতী তস্যা এষ পতিঃ।[১৪৩]

'বৃহস্পতি' তাঁকে (প্রাণকে) উদ্গীথকর্তারূপে উপাসনা করেছিলেন, যেহেতু 'বাক্' 'বৃহতী' এবং 'প্রাণ' তার 'পতি', অতএব ঋষিগণ প্রাণকেই 'বৃহস্পতি' মনে করে থাকেন।

নির্বচনপদ্ধতি

'বৃহস্পতি' শব্দের নির্বচন থেকে 'বৃহত্যাঃ পতিঃ বৃহস্পতিঃ' এইরূপ বিগ্রহ পাওয়া যায়। অতএব শব্দটি ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস দ্বারা নিষ্পন্ন বলা যায়। সুতরাং অনুমান করা যায় যে শব্দটি প্রত্যক্ষনির্বচন পদ্ধতিতেই নির্বচিত হয়েছে।

ভামনী

চতুর্থ অধ্যায়ে ব্রহ্মবেত্তার গতি আলোচনাকালেই 'ভামনী' শব্দের উৎপত্তি বর্ণিত হয়েছে-

> এষ উ ভামনীরেষ হি সর্বেষু লোকেষু ভাতি। সর্বেষু লোকেষু ভাতি য এবং বেদ।[১৪৪]

এই ব্রহ্মই ভামনী, কারণ ইনি সকল লোকে প্রকাশ পান, যিনি এরূপ জানেন তিনি সকল লোকে দীপ্তিমান হন।

নির্বচনপদ্ধতি

ভামনী শব্দের উৎপত্তি প্রসঙ্গে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্যের মত প্রণিধানযোগ্য। তাঁর উক্তিটি হল- "অতো ভামানি নযতীতি ভামনীঃ"।[১৪৫] ব্রহ্ম প্রকাশিত হলেই সবকিছু প্রকাশ পায়। অর্থাৎ তিনি দীপ্তি বা প্রকাশ নিয়ে আসেন। তাঁর মতানুসারে 'ভাম' + √নী-ধাতু (*ণীঞ্ প্রাপণে*) থেকে 'ভামনী' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। ব্যুৎপত্তিটি ব্যাকরণসম্মত। তাই অনুমান করা যায় যে, প্রত্যক্ষ-নির্বচনপদ্ধতিতে নির্বচন করা হয়েছে। তবে নির্বচনস্থিত 'ভাতি' ক্রিয়াপদকে 'ভামনী' শব্দের হেতুস্বরূপ মনে করা হলে 'ভাতি' ক্রিয়াপদের 'ভা' এর সাথে 'ভামনী'র আদ্যক্ষর 'ভা' এই সাদৃশ্য থাকায় শব্দটি অতিপরোক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে নির্বচিত হয়েছে- এই সংকেত পাওয়া যায়।

রুদ্র

আত্মযজ্ঞোপাসনা বর্ণনাকালে পুরুষের চব্বিশ বছরের পরবর্তী চব্বিশ বছরকে মাধ্যন্দিন সবনের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এখানেই ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের অনুগত হিসাবে 'রুদ্র' শব্দের উল্লেখ ও রুদ্রের রুদ্রত্ব সম্পাদিত হয়েছে-

প্রাণা বাব রুদ্রা এতে হীদং সর্বং রোদযন্তি।[১৪৬]

অর্থাৎ প্রাণসমূহই রুদ্রগণ, কারণ এরাই ভূতবর্গকে রোদন করায়।

নির্বচনপদ্ধতি

'রোদযন্তি' ক্রিয়াপদ থেকে রুদ্র শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায়। ণিজন্ত √রুদ্ ধাতু (*রুদির্ অশ্রুবিমোচনে,* অদাদিগণ, ১০৬৭) থেকে রুদ্র শব্দের উৎপত্তি হয়েছে (√রুদ্-ধাতু + ণিচ্ + রক্ = রুদ্র)। উক্ত ব্যুৎপত্তি ব্যাকরণগত শব্দগঠন প্রক্রিয়ার অনুরূপ। 'রোদের্ণিলুক্ চ' (উণাদিসূত্র ২/২২) এই উণাদিসূত্র দ্বারা শব্দটি গঠিত হয়। অতএব শব্দটি ব্যাকরণ অনুসারী প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতির অন্তর্গত বলা যায়।

বসু

তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মযজ্ঞোপাসনা বর্ণনাকালে বলা হয়েছে পুরুষ দীর্ঘায়ুসম্পন্ন হয়েই পুত্রাদি ফল প্রাপ্ত হয়। তাই সে স্বয়ং যজ্ঞ হিসাবে নিজেকে সম্পাদন করবে। কিভাবে করবে তা বর্ণনাকালেই প্রাণকে 'বসু' বলা হয়েছে এবং 'বসু' নামকরণের কারণ উল্লিখিত হয়েছে-

প্রাণা বাব বসব এতে হীদং সর্বং বাসযন্তি।[১৪৭]

অর্থাৎ বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ, প্রাণসমূহই বসু, কারণ তারাই ভূতবর্গকে বাস করতে প্রযোজিত করে।

নির্বচনপদ্ধতি

'বসু' শব্দটি √বস্-ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে অর্থাৎ √বস্-ধাতুর উত্তর 'উ' প্রত্যয় যুক্ত করে 'বসু' শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে। ব্যাকরণগত প্রক্রিয়ায় শব্দটি এইভাবেই সিদ্ধ হয়। অতএব প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে শব্দটি ব্যুৎপাদিত হয়েছে।

সংযমদ্বাম

চতুর্থ অধ্যায়ে ব্রহ্মবেত্তার গতি আলোচনাকালেই 'সংযমদ্বাম' শব্দের উৎপত্তি বর্ণিত হয়েছে-

এতং সংযমদ্বাম ইত্যাচক্ষত এতং হি সর্বাণি বামান্যভিসংযন্তি।[১৪৮]

এনাকে অর্থাৎ ব্রহ্মকে 'সংযমদ্বাম' বলা হয় কারণ সমস্ত শোভন পদার্থ তাঁরই অভিমুখে সম্যকভাবে গমন করে।

শঙ্করাচার্যের ভাষ্যেও বলা হয়েছে- "যস্মাদেতং সর্বাণি বামানি বননীযানি সংভজনীযানি শোভনান্যভিসংযন্ত্যভিসংগচ্ছন্তীঃ সংযমদ্বাম"[১৪৯] অর্থাৎ যেহেতু সকল সংভজনীয় বা শোভন পদার্থ সম্যকরূপে অভিগমন করে তাই সংযমদ্বাম।

নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনটির যথার্থ বিশ্লেষণ থেকে অনুমান করা যায় 'বামানি সংযন্তি' এই বাক্যাংশই শব্দটির ব্যুৎপত্তির মূলস্বরূপ। 'সম্ এই উপসর্গপূর্বক √ইণ্-ধাতুর সাথে 'বাম' শব্দের সংযুক্তিকরণ দ্বারাই সংযমদ্বাম' শব্দের

উৎপত্তি দ্যোতিত হয়েছে (সম্ + *√ইণ গতৌ* ধাতু + বাম)। অতএব ব্যাকরণগত পদ্ধতি অনুসারেই শব্দটির নির্বচন করা হয়েছে অর্থাৎ এটি যাস্কীয় প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সংবর্গ

এই উপনিষদে রৈক্ক দ্বারা সংর্গবিদ্যার উপদেশ বর্ণনাকালে বায়ু ও প্রাণকে 'সংবর্গ' আখ্যা দেওয়ার কারণ বর্ণনাকালে এই শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সেগুলি হল-

> বাযুর্বাব সংবর্গো যদা বা অগ্নিরুদ্বাযতি বাযুমেবাপ্যেতি যদা সূর্যোঽস্তমিতে বাযুমেবাপ্যেতি চন্দ্রোঽস্তমেতি বাযুমেবাপ্যেতি। যদাপ উচ্ছুষ্যন্তি বাযুমেবাপিযন্তি বাযুর্হ্যেবৈতান্য সর্বান্য সংবৃঙ্ক্তে ইতি।[১৫০]

অর্থাৎ বায়ুই সংবর্গ। অগ্নি যখন নির্বাপিত হয় তখন বাযুতেই লীন হয়। সূর্য যখন অস্তগমন করে তখন বায়ুতেই লীন হয়। যখন জল শুষ্ক হয় তখন বায়ুতেই লীন হয় কারণ বায়ুই এই সমুদায়কে আত্মসাৎ করে।

> প্রাণ বাব সম্বর্গঃ, স যদা স্বপিতি প্রাণমেব বাগপ্যেতি। প্রাণং চক্ষু, প্রাণং শ্রোত্রং, প্রাণং মনঃ প্রাণো হ্যেবৈতান্ সর্বান্ সংবৃঙ্ক্তে ইতি।[১৫১]

প্রাণ-ই সম্বর্গ। কেউ (অর্থাৎ জীব) যখন নিদ্রা যায়, তখন বাগিন্দ্রিয় প্রাণে লীন হয়, চক্ষু প্রাণে লীন হয়, শ্রোত্র প্রাণে লীন হয়, মন প্রাণে লীন হয় কারণ প্রাণই এই সমুদায়কে আত্মসাৎ করে।

নির্বচনপদ্ধতি

'সম্বর্গ' শব্দের দুটি নির্বচনেই 'সংবৃঙ্ক্তে' ক্রিয়াপদ বিদ্যমান। এই ক্রিয়াপদটিই 'সম্বর্গ' শব্দের উৎপত্তির মূল হিসাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। √বৃজ্-ধাতু নিষ্পন্ন হওয়ায় অনুমান করা যায় 'সম্' এই উপসর্গপূর্বক √বৃজ্-ধাতু থেকে সম্বর্গ শব্দের উৎপত্তি সিদ্ধ হয়েছে (সম্-√বৃজ্-ধাতু + ঘঞ্ = সম্বর্গ)। অতএব ব্যাকরণগত শব্দগঠন প্রক্রিয়া অনুসারে শব্দটির ব্যুৎপত্তি অনুরূপ হওয়ায় অনুমান করা যায় প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতিতেই নিরুক্তি করা হয়েছে।

সাম

ছান্দোগ্যোপনিষদে 'সাম' শব্দের নির্বচনটি একাধিক স্থানে একাধিকভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। যেমন প্রথম অধ্যায়েই বলা হয়েছে-

> ইযমেবর্গগ্নিঃ সাম তদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢং সাম তস্মাদৃচ্যব্যূঢং সাম গীযত ইযমেব সা অগ্নিরমস্তত্ সাম।[১৫২]

এটিই (পৃথিবীই) ঋক্, অগ্নি সাম। এই অগ্নি সংজ্ঞক সাম এই ঋকের ওপর অধিষ্ঠিত। সেই জন্যই ঋকে অধিষ্ঠিত সাম গীত হয়ে থাকে। এটিই (পৃথিবী) সা অগ্নিই অম- এইরূপে তারা সাম-শব্দ-বাচ্য হয়।

> অন্তরিক্ষমেবর্গ্বাযুঃ সাম তদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢং সাম। তস্মাদৃচ্যধ্যূঢং সাম গীযতেঽন্তরিক্ষমেব সা বাযুরমস্তৎসাম।[১৫৩]

অন্তরিক্ষই ঋক্, বায়ু সাম, সেই সাম অন্তরিক্ষরূপী ঋকে অধিষ্ঠিত। সেইজন্য ঋকে অধিষ্ঠিত সাম গীত হয়ে থাকে। অন্তরিক্ষই 'সা', বায়ু 'অম' এই উপায়ে তারা 'সাম' নামে অভিহিত হয়।

> দৌরেবর্গাদিত্যঃ সাম তদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢং সাম। তস্মাদৃচ্যধ্যূঢং সাম গীযতে দৌরেব সাদিত্যোঽমস্তং সাম।[১৫৪]

দ্যুলোকই ঋক্, আদিত্যও সাম, উক্ত সংজ্ঞক সাম এই দ্যুলোকরূপ ঋকে অধিষ্ঠিত হয়। দ্যুলোকই 'সা', আদিত্য 'অম'- এইরূপে তারা 'সাম' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

> নক্ষত্রাণ্যেবর্ক্চন্দ্রমাঃ সাম তদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢং সাম। তস্মাদৃচ্যধ্যূঢং সাম গীযতে। নক্ষত্রাণ্যেব সা চন্দ্রমা অমস্তৎসাম।[১৫৫]

নক্ষত্রসমূহ ঋক্, চন্দ্রমা সাম, উক্ত এই চন্দ্ররূপী সাম নক্ষত্রবর্গরূপী ঋকে অধিষ্ঠিত। সেইজন্যই ঋকে অধিষ্ঠিত সাম গীত হয়। নক্ষত্রবর্গই 'সা', চন্দ্রমা 'অম'- এইভাবে তারা যুক্ত হয়ে 'সাম' শব্দের বাচক হয়।

অথ যদেবৈতদাদিত্যস্য শুক্লং ভাঃ সৈব সাঽথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তদমস্তৎসাম।[১৫৬]

অর্থাৎ আবার সূর্যের যা শ্বেত বর্ণ বিশিষ্ট আভা সেটিই 'সা' আর যা সাতিশয় কৃষ্ণ আভা সেটিই 'অম'। এই রূপে শ্বেত আভা ও কৃষ্ণ আভাই সাম শব্দের বাচ্য।

(অথাধ্যাত্ম্যম্) বাগেবর্ক্প্রাণঃ সাম তদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢং সাম গীযতে। বাগেব সা প্রাণোঽমস্তত্ সাম।[১৫৭]

বাক্-ই 'ঋক্', প্রাণ বা ঘ্রাণেন্দ্রিয় 'সাম', সেই সাম এই বাগ্রূপী ঋকেই প্রতিষ্ঠিত। সেই কারণেই ঋকে অধিষ্ঠিত সাম গীত হয়। বাক্-ই 'সা', ঘ্রাণ 'অম'। এই রূপে বাক্ ও ঘ্রাণই সাম শব্দরূপে পরিগণিত হয়।

চক্ষুরেবর্গাত্মা সাম তদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢং সাম। তস্মাদৃচ্যধ্যূঢং সাম গীযতে। চক্ষুরেব সাত্মাঽমস্তত্ সাম।[১৫৮]

অর্থাৎ চক্ষুই ঋক্, আত্মা অর্থাৎ দেহচ্ছায়া সাম। সেই (চক্ষুরূপী) ঋকে (আত্মারূপী) সাম প্রতিষ্ঠিত। সেহেতু ঋকে অধিষ্ঠিত সাম গান করা হয়। চক্ষুই 'সা', ছায়া 'অম', এইরূপে চক্ষু ও ছায়াই সামপদবাচ্য।

শ্রোত্রমেবর্জ্মঃ সাম...। শ্রোত্রমেব সামনোঽমস্তত্ সাম।[১৫৯]

কর্ণই ঋক্, মন সাম। সেই এই (মনোরূপী) সাম এই কর্ণরূপী ঋকে প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্যই ঋকে অধিষ্ঠিত সাম গীত হয়। কর্ণই সা, মন অম, এইরূপে কর্ণ ও মন সাম-শব্দ-বাচ্য।

যদেবৈতদক্ষঃ শুক্লং ভার সৈব সাঽথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তদমস্তত্ সাম।[১৬০]

এই যে চক্ষুর শুভ্র জ্যোতি, সেটি সা এবং যা নীলাতিশায়ী কৃষ্ণ, তা অম। এইরূপে উভয়ে সাম-শব্দ-বাচ্য।

এছাড়াও দ্বিতীয় অধ্যায়েও 'সাম' শব্দের একটি নির্বচন দেখা যায়। সামবেদীয় এই উপনিষদে আদিত্য বিষয়ক সাতপ্রকার সামের উপাসনার বর্ণনা প্রসঙ্গে সামের সামত্ব বিহিত হয়েছে। সেটি হল-

অথ খল্বমুমাদিত্যং সপ্তবিধং সামোপাসীত সর্বদা সমস্তেন সাম মাং প্রতি মাং প্রতীতি সর্বেণ সমস্তেন সাম।[১৬১]

অনন্তর, ওই আদিত্য বা সূর্যকে সামসমূহে আরোপ করে সাতপ্রকার সামের উপাসনা করতে হবে। সূর্য সবসময় সমান (অর্থাৎ যার ক্ষয়-বৃদ্ধি নেই), তাই তিনি সাম এবং তিনি আমার অভিমুখে বা সামনে বর্তমান, আমার অভিমুখে বা সামনে বর্তমান- এইরূপে সকলের কাছে সমান বুদ্ধির জ্ঞাপক, অতএব তিনি সাম।

নির্বচনপদ্ধতি

প্রথম অধ্যায়ের সবকটি নির্বচনে দেখা যায় মূলত 'সা' এবং 'অম' এই শব্দ দুটি মিলিত হয়েই 'সাম' শব্দের উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও দ্বিতীয় অধ্যায়স্থিত নির্বচন অনুযায়ী 'সাম' শব্দের দ্বারা সূর্যকে বোঝানো হয়েছে কারণ তা ক্ষয়বৃদ্ধিরহিত সমান। অর্থাৎ 'সম' থেকে 'সাম' শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করা হয়েছে। যদিও 'সাতিভ্যাং মনিমনিণৌ' (উণাদি সূত্র ৪/১৫৪) এই উণাদিসূত্র অনুসারে √ষো-ধাতুর সাথে 'মনিন্' প্রত্যয় যুক্ত করে 'সামন্' বা 'সাম' শব্দটি নির্ণয় করা যায় (√ষো-ধাতু + মনিন্ = সাম)। অতএব অনুমান করা যায়, নির্বচনটি অতিপরোক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে 'সাম' শব্দের অর্থ নির্ণয়ে সহায়ক হয়েছে।

স্বপিতি

সুষুপ্তিকালে জীবের স্থিতি উপদেশকালে 'স্বপিতি' শব্দের নির্বচন প্রদর্শিত হয়েছে-

যত্রৈতত্ পুরুষঃ স্বপিতি নাম সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি স্বমপীতো ভবতি তস্মাদেনং স্বপিতীত্যাচক্ষতে স্বং হ্যপীতো ভবতীতি।[১৬২]

অর্থাৎ যখন বলা হয় কেউ সুষুপ্ত হয়েছেন তখন হে সোম্য তিনি সতের সাথে একীভূত হন এবং নিজ স্বরূপে গমন করেন। সেইজন্য লোকে তাকে 'সুষুপ্ত' (স্বপিতি) এই নামে বলে থাকে কারণ তিনি তখন স্ব স্বরূপকে প্রাপ্ত হন।

নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনটি বিশ্লেষণ থেকে অনুমান করা যায় 'স্বমপীতো ভবতি' অর্থাৎ নিজ স্বরূপে গমন করেন তাই স্বপিতি এই সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। স্বম্> স্ব, অপি> পি এবং 'ইতো ভবতি' অর্থাৎ এতি>তি যুক্ত হয়ে 'স্বপিতি' শব্দটি গঠিত হয়েছে। সুতরাং 'স্বপিতি' শব্দের নির্বচনটি অতিপরোক্ষনির্বচনপদ্ধতির অন্তর্গত।

হৃদয়

ছান্দোগ্যোপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডে অসত্যের দ্বারা আবৃত সত্যের উপাসনা এবং নামোক্ষরোপাসনা বর্ণনার সময় 'হৃদয়' শব্দের হৃদয়ত্বের নিষ্পাদনস্বরূপ বলা হয়েছে-

স বা এষ আত্মা হৃদি তস্যৈতদেব নিরুক্তং হৃদযমিতি তস্মাদ্হৃদযম্।[১৬৩]

এই সেই আত্মা হৃদয়েই অবস্থিত। উক্ত হৃদয়ের এটিই নির্বচন বা মৌলিক অর্থ যেহেতু হৃদয়ের মধ্যে ইনি অর্থাৎ এই আত্মা বর্তমান, অতএব 'হৃদি অযম্ হৃদযম্'।

নির্বচনপদ্ধতি

উক্ত নির্বচন অনুযায়ী 'হৃদয়ম্' পদটি 'হৃদি অযম্' এই শব্দজোড় থেকে সৃষ্টি হয়েছে। অতএব হৃদি + অয়ম্ > হৃদয়ম্ (ইকার লোপ)। সুতরাং শব্দটি পরোক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে নির্বচিত হয়েছে।

২.৭. উপসংহার

আচার্য যাস্ক নির্দেশিত নির্বচন-সিদ্ধান্ত বা নির্বচনপদ্ধতি অনুসারে নির্বচনগুলির শব্দার্থ বিশ্লেষণপূর্বক পদ্ধতি নিরূপণের প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ জানা যায়, *তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ* প্রভৃতি সামবেদীয় নির্বাচিত ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে যাজ্ঞিক বর্ণনা ও তত্ত্বচিন্তার আধারে প্রদর্শিত নির্বচনগুলির নির্দিষ্ট পদ্ধতিগত কোনো রূপরেখার উল্লেখ না থাকলেও তা যাস্কাচার্য দ্বারা উক্ত নির্বচন-সিদ্ধান্তকে (অনেকাংশেই) অনুসরণ করেছে এবং বিবিধ অর্থপ্রদানকারী নির্বচনগুলি পদ্ধতিগত দিক থেকেও যথার্থ। যাস্কাচার্যকৃত নির্বচন-পদ্ধতি এইসমস্ত নির্বচনগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ সমীক্ষার-ই ফলস্বরূপ।

তথ্যপঞ্জি

[১] *তৈত্তিরীয়সংহিতা* ১/৫/১।

[২] *মেদিনীকোষঃ,* পৃষ্ঠাঙ্ক ৬৭।

[৩] *শতপথব্রাহ্মণম্* ৩/২/৫/১।

[৪] *ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা* , পৃষ্ঠাঙ্ক ২৬।

[৫] *আপস্তম্বযজ্ঞপরিভাষাসূত্রম্* ১/৩৫।

[৬] *পূর্বমীমাংসাসূত্রম্* ২/১/৩৩।

[৭] *পাণিনীয়মহাভাষ্যম্* ৫/১/১/৭।
[৮] *ঋগ্বেদাদিভাষ্য ভূমিকা*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৯১।
[৯] *মীমাংসাশাবরভাষ্যম্* ২/৩৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪১৪।
[১০] *তাণ্ডমহাব্রাহ্মণম্* ১৬/৮/৯।
[১১] *জৈমিনীয়ব্রাহ্মণম্* ৩/৩৭৭।
[১২] *জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণম্* ১/১২/২/৮।
[১৩] *তাণ্ডমহাব্রাহ্মণম্* ১৬/৪/৬।
[১৪] *তদেব* ২০/৮/১, পৃষ্ঠাঙ্ক ৫৫০।
[১৫] *তদেব* ২২/৮/৪, পৃষ্ঠাঙ্ক ৬৬৪।
[১৬] *অষ্টাধ্যায়ী* ৩/২/৬১।
[১৭] *তাণ্ডমহাব্রাহ্মণম্* ৪/৩/২, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৭৯।
[১৮] তত্রৈব।
[১৯] *তাণ্ডমহাব্রাহ্মণম্* ৮/২/৮, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৮৬।
[২০] *তদেব* ১২/৫/২৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৮৪।
[২১] *তদেব* ২১/৪/২, পৃষ্ঠাঙ্ক ৬০২।
[২২] তত্রৈব।
[২৩] *উণাদিকোষঃ* ১/১৫১।
[২৪] *তাণ্ডমহাব্রাহ্মণম্* ১১/৫/১০, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭১০-৭১১।
[২৫] তত্রৈব।
[২৬] *তাণ্ডমহাব্রাহ্মণম্* ২১/২/৫, পৃষ্ঠাঙ্ক ৫৯৫।
[২৭] *তদেব* ৭/২/১, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪১০।
[২৮] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪১১।
[২৯] *অষ্টাধ্যায়ী* ৩/১/১০৯।
[৩০] *তাণ্ডমহাব্রাহ্মণম্* ৭/৫/১, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৩১।
[৩১] তত্রৈব।
[৩২] *তাণ্ডমহাব্রাহ্মণম্* ১৬/৩/২, পৃষ্ঠাঙ্ক ২৭৫।
[৩৩] তত্রৈব।
[৩৪] *তাণ্ডমহাব্রাহ্মণম্* ১৮/১/২, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৯৯।
[৩৫] *তদেব* ৮/৩/১, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৮৭।
[৩৬] *তদেব* ১৪/৩/১৯, পৃষ্ঠাঙ্ক ১১৩।
[৩৭] *তদেব* ১৩/৫/১৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৮।
[৩৮] তত্রৈব।
[৩৯] *তাণ্ডমহাব্রাহ্মণম্* ৮/১/৪, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৭৯।
[৪০] তত্রৈব।
[৪১] *তাণ্ডমহাব্রাহ্মণম্* ৮/১/৯, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৮১।
[৪২] তত্রৈব।
[৪৩] *তাণ্ডমহাব্রাহ্মণম্* ২০/১৪/২, পৃষ্ঠাঙ্ক ৫৬৪।
[৪৪] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৫৬৬।
[৪৫] *তদেব* ৪/৫/৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৯৭।
[৪৬] *তদেব* ২১/৮/৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ৬১৩।
[৪৭] তত্রৈব।
[৪৮] *তাণ্ডমহাব্রাহ্মণম্* ৭/৬/৫, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৪০।

[৪৯] তত্রৈব।
[৫০] *তাণ্ডমহাব্রাহ্মণম্* ১৪/১১/১৪, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৬৯।
[৫১] *তদেব* ২০/১৪/২, পৃষ্ঠাঙ্ক ৫৬৪।
[৫২] তত্রৈব।
[৫৩] *তাণ্ডমহাব্রাহ্মণম্* ৪/১০/১, পৃষ্ঠাঙ্ক ২৩৯।
[৫৪] *তদেব* ৪/১০/২, পৃষ্ঠাঙ্ক ২৪০।
[৫৫] *তদেব* ৭/৫/১৪, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৩৭।
[৫৬] *তদেব* ৭/৫/১৫, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৩৭।
[৫৭] *তদেব* ৭/৬/৪, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৪০।
[৫৮] *তদেব* ৭/৫/১১, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৩৫।
[৫৯] *তদেব* ৭/৫/১১, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৩৫-৪৩৬।
[৬০] তত্রৈব।
[৬১] *তাণ্ডমহাব্রাহ্মণম্* ১৩/৯/২০, পৃষ্ঠাঙ্ক ৯৮।
[৬২] তত্রৈব।
[৬৩] *অষ্টাধ্যায়ী* ৩/২/৬১।
[৬৪] *তদেব* ৬/১/৭১।
[৬৫] *তাণ্ডমহাব্রাহ্মণম্* ১৮/৭/১, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪২৬।
[৬৬] *তদেব* ১৯/১৯/১, পৃষ্ঠাঙ্ক ৫২৯।
[৬৭] *তদেব* ১৯/১৮/২, পৃষ্ঠাঙ্ক ৫২৭।
[৬৮] তত্রৈব।
[৬৯] *তাণ্ডমহাব্রাহ্মণম্* ৪১/৯/২০, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৫৪।
[৭০] *তদেব* ১৬/৪/৫, পৃষ্ঠাঙ্ক ২৮২।
[৭১] *তদেব* ২২/৮/৪, পৃষ্ঠাঙ্ক ৬৬৪।
[৭২] *তদেব* ২৫/১৮/২, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮২৮।
[৭৩] *তদেব* ১৩/৪/১, পৃষ্ঠাঙ্ক ২১।
[৭৪] তত্রৈব।
[৭৫] তত্রৈব।
[৭৬] *তাণ্ডমহাব্রাহ্মণম্* ৭/১০/১৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৭৪।
[৭৭] *তদেব* ১১/৫/৬, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭০৮-৭০৯।
[৭৮] *তদেব* ১৫/৩/২৯, পৃষ্ঠাঙ্ক ২০২।
[৭৯] *তদেব* ১৩/৬/৭, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৬-৪৭।
[৮০] *তদেব* ৮/৪/৯, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৯৭।
[৮১] *তদেব* ১১/১০/১২, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৩৭।
[৮২] *তদেব* ৮/৮/১৬, পৃষ্ঠাঙ্ক ৫২৮।
[৮৩] *জৈমিনীয়ব্রাহ্মণম্* ২/৫৬, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৮০।
[৮৪] *তদেব* ২/৪৪, পৃষ্ঠাঙ্ক ২৬৫।
[৮৫] *তদেব* ৩/৩৬১, পৃষ্ঠাঙ্ক ৫০২।
[৮৬] *তদেব* ২/১৭৪।
[৮৭] *তদেব* ১/৩১২।
[৮৮] *তদেব* ২/১৭৮, পৃষ্ঠাঙ্ক ২৩৬।
[৮৯] *তদেব* ২/৩৮০, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩২৪।
[৯০] *তদেব* ৩/২৯৪, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৭৫।

[৯১] *তদেব* ২/১১, পৃষ্ঠাঙ্ক ২১০।
[৯২] *তদেব* ২/৪৪২।
[৯৩] *তদেব* ৩/৩৭৯, পৃষ্ঠাঙ্ক ৫১০।
[৯৪] তত্রৈব।
[৯৫] *জৈমিনীয়ব্রাহ্মণম্* ৩/১২৮, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪১৪।
[৯৬] *তদেব* ১/২৮৪, পৃষ্ঠাঙ্ক ১১৮।
[৯৭] *তদেব* ১/৪৯।
[৯৮] *তদেব* ১/৩০।
[৯৯] *তদেব* ৩/৬৩।
[১০০] *তদেব* ৩/৩১৮, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৮৫।
[১০১] *তদেব* ৩/১১৯, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৮৫।
[১০২] *তদেব* ৩/৩৭৯।
[১০৩] *তদেব* ২/৪০৯, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৩৭।
[১০৪] *তদেব* ৩/২৬৩।
[১০৫] *তদেব* ২/৭৭।
[১০৬] *তদেব* ১/১২২।
[১০৭] তত্রৈব।
[১০৮] *জৈমিনীয়ব্রাহ্মণম্* ২/৫৬।
[১০৯] *অষ্টাধ্যায়ী* ৩/৪/৭২।
[১১০] *উণাদিকোষঃ* ৩/৮৬।
[১১১] *জৈমিনীয়ব্রাহ্মণম্* ২/৫৬।
[১১২] *তদেব* ৩/১৯০।
[১১৩] *তদেব* ৩/১৩২।
[১১৪] *তদেব* ৩/৩৭৯।
[১১৫] *তদেব* ৩/৩৫৭।
[১১৬] *তদেব* ১/৮৯।
[১১৭] তত্রৈব।
[১১৮] জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণম্ ১/২৪/১-২।
[১১৯] *তদেব* ১/২০/৪।
[১২০] *তদেব* ২/৩/২/৭।
[১২১] *তদেব* ৩/৩৫/৩।
[১২২] *তদেব* ২/১১/৬।
[১২৩] *তদেব* ৪/২/৯।
[১২৪] *তদেব* ৩/৩৩/৭।
[১২৫] *তদেব* ১/১৫/৬।
[১২৬] *তদেব* ৩/৩৮/৪।
[১২৭] *তদেব* ৪/২/৬।
[১২৮] *তদেব* ৩/৩/৬।
[১২৯] *তদেব* ১/২৫/৪।
[১৩০] *তদেব* ১/২৯/৯।
[১৩১] *তদেব* ১/৪৪/৫।
[১৩২] *কেনোপনিষদ্* ৪/৬।

[১৩৩] তত্রৈব।
[১৩৪] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্* ১/২/১০।
[১৩৫] *তদেব* ৩/১৬/৫।
[১৩৬] *তদেব* ১/২/১২।
[১৩৭] *তদেব* ১/৩/৬।
[১৩৮] *তদেব* ১/৩/৭।
[১৩৯] *তদেব* ২/৯/৭, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৭১।
[১৪০] *তদেব* ৩/১২/১।
[১৪১] *তদেব* ২/৯/৮।
[১৪২] *তদেব* ২/৯/৬।
[১৪৩] *তদেব* ১/২/১১।
[১৪৪] *তদেব* ৪/১৫/৪।
[১৪৫] তত্রৈব।
[১৪৬] *তদেব* ৩/১৬/৩।
[১৪৭] *তদেব* ৩/১৬/১।
[১৪৮] *তদেব* ৪/১৫/২।
[১৪৯] তত্রৈব।
[১৫০] *তদেব* ৪/৩/১।
[১৫১] *তদেব* ৪/৩/৩।
[১৫২] *তদেব* ১/৬/১।
[১৫৩] *তদেব* ১/৬/২।
[১৫৪] *তদেব* ১/৬/৩।
[১৫৫] *তদেব* ১/৬/৪।
[১৫৬] *তদেব* ১/৬/৬।
[১৫৭] *তদেব* ১/৭/১।
[১৫৮] *তদেব* ১/৭/২।
[১৫৯] *তদেব* ১/৭/৩।
[১৬০] *তদেব* ১/৭/৪।
[১৬১] *তদেব* ২/৯/১।
[১৬২] *তদেব* ৬/৮/১।
[১৬৩] *তদেব* ৮/৩/৩।

***

তৃতীয় অধ্যায়
নিরুক্তে প্রাপ্ত সামবেদীয় শব্দসমূহের নির্বচন

৩.০. ভূমিকা

নিরুক্তশাস্ত্র মূলত নিঘণ্টুর ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ। তথাপি যাস্কাচার্য তাঁর নিরুক্তগ্রন্থে ১৭৭০ টি শব্দের মধ্যে ৫৮৫টি শব্দ *নিঘণ্টু* থেকে সংগ্রহ করেছেন এবং অবশিষ্ট ৫৮৭টি শব্দ তাঁর নিজস্ব সংগ্রহ। দুর্বোধ্যভাষাময় বৈদিক সাহিত্যে নির্বিঘ্ন অবগাহনের এক অন্যতম সহায়ক গ্রন্থ হল *নিরুক্তশাস্ত্র*। এই গ্রন্থটি তিনটি কাণ্ড ও পরিশিষ্ট অংশ বাদ দিয়ে বারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। তিনটি কাণ্ড যথাক্রমে নৈঘণ্টুককাণ্ড, নৈগমকাণ্ড এবং দৈবতকাণ্ড। নৈঘণ্টুক কাণ্ড প্রথম তিনটি অধ্যায় নিয়ে গঠিত। এই কাণ্ডে, ব্যাকরণ ও নিরুক্তের সম্বন্ধ এবং সমানার্থক শব্দের অর্থাৎ পৃথিব্যাদিবাচক অনেক শব্দের একার্থত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত নৈগমকাণ্ড। এখানে একটি শব্দের অনেকার্থত্ব প্রদর্শিত হয়েছে এছাড়াও অনবগতসংস্কার শব্দের নিরুক্তিসাধনও লক্ষ্য করা যায়। দৈবতকাণ্ড সপ্তম অধ্যায় থেকে দ্বাদশ অধায় পর্যন্ত অংশ নিয়ে বিদ্যমান। এখানে দেবতার স্তুতি বিষয়ক পদসমূহ আলোচিত হয়েছে। তিন প্রকার দেবতা, তাঁদের স্বরূপ এবং স্তুতিপরক মন্ত্রের ভেদ স্থান পেয়েছে। *নিরুক্তগ্রন্থের* দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত নির্বচনসিদ্ধান্ত নির্বচনশাস্ত্রের ইতিহাসে এক অনন্য সৃষ্টি। যা অবলম্বন করে বৈদিক ও লৌকিক উভয় শব্দের বর্গীকরণ, উৎপত্তি ও অর্থ বিষয়ে সামগ্রিক ধারণা পাওয়া যায় এবং অনুমানও করা হয় যে, তাঁর নির্বচনপদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে বৈদিকনির্বচন পদ্ধতিরই লিখিত স্বরূপমাত্র।

৩.১. নির্বচনসমূহের তুলনা

যাস্ককৃত *নিরুক্তে* অনেক বৈদিক শব্দের নির্বচন করা হয়েছে যেগুলি বিভিন্ন বৈদিক সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও তদন্তর্গত উপনিষদেও তৎকালীন ঘটনা ও বিষয়ের পরিপেক্ষিতে বর্ণিত ও নির্বচিত হয়েছে। যেমন দেখা যায়, সামবেদীয় কিছু নির্বাচিত গ্রন্থ- *তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ, জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ, জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ* এবং *ছান্দোগ্যোপনিষদ্* গ্রন্থগুলিতে এমন কিছু শব্দের নির্বচন বিদ্যমান যেসমস্ত শব্দের যাস্কাচার্যকৃত *নিরুক্তেও* নির্বচন করা হয়েছে। যাস্ককৃত একই বৈদিক শব্দের নির্বচনগত বিশ্লেষণপূর্বক সেগুলির তুলনাত্মক আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক-

অন্তরিক্ষ

'অন্তরিক্ষ' বলতে সাধারণত আকাশ বা অন্তরিক্ষলোককে বোঝায়। 'অন্তরিক্ষ' শব্দটির সামবেদীয় *তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ, জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ, জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণে* যেমন নির্বচন করা হয়েছে ঠিক তেমনি যাস্কাচার্যও তাঁর গ্রন্থে শব্দটির নির্বচন প্রদর্শন করেছেন।

যাস্ক নিরুক্তের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে ষোড়শ অন্তরিক্ষবাচক শব্দের নির্বচনকালে প্রথমেই 'অন্তরিক্ষ' শব্দের নির্বচন করেছেন। প্রশ্নোত্তরের আঙ্গিকে প্রদর্শিত নির্বচনটি হল-

> অন্তরিক্ষং কস্মাৎ ?।। অন্তরা ক্ষান্তং ভবতি। অন্তরেমে (ক্ষিযতি) ইতি বা।। শরীরেষ্বন্তরক্ষযমিতি বা।।[১]

'অন্তরিক্ষ' নাম কোথা থেকে হল, তার উত্তরে বলা হয়েছে, দ্যুলোক এবং পৃথিবী এই উভয়লোকের অন্তরা বা মধ্যবর্তী হওয়ায় এবং পৃথিবী শেষ সীমা যার এরকম হওয়ায় অথবা দ্যুলোক এবং পৃথিবী এই উভয়

স্থানের মধ্যে নিবাস করায় অথবা শরীরসমূহের মধ্যে অবস্থিত এবং অক্ষয় হওয়ায় 'অন্তরিক্ষ' এই নাম হয়েছে।

বিমর্শ

'অন্তরিক্ষ' শব্দের নির্বচনে তিনটি হেতুর উল্লেখ করে শব্দটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম কারণ অনুসারে 'অন্তরিক্ষ' শব্দের উৎপত্তিতে 'অন্তরা' ও 'ক্ষান্ত' শব্দদুটির বিশেষ ভূমিকা বিদ্যমান অর্থাৎ 'অন্তরা' শব্দটি √ক্ষম্-ধাতুর (*ক্ষমূষ্ সহনে* , ভ্বাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ৪৪২) সাথে যুক্ত হয়ে শব্দটি ব্যুৎপন্ন হয়েছে। দ্বিতীয়ত, 'অন্তরা' শব্দের সাথে √ক্ষি-ধাতুর (*ক্ষি নিবাসগত্যো,* তুদাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১৪০৭) সংযোগে 'অন্তরিক্ষ' শব্দটি সিদ্ধ করা হয়েছে। তৃতীয়ত, অন্তর্ + ন + √ক্ষি-ধাতু (ক্ষি ক্ষযে, ভ্বাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ২৩৬) যুক্ত হয়ে 'অন্তরিক্ষ' শব্দের সিদ্ধির চেষ্টা করা হয়েছে।

কিন্তু *তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে* 'অন্তরিক্ষ' শব্দটি 'অন্তর্' শব্দ থেকে নিষ্পত্তির চেষ্টা করা হয়েছে (অন্তর্ > অন্তরিক্ষ)। শুধু তাই নয়, *জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণে* 'অন্তর্যক্ষ' শব্দ থেকে 'অন্তরিক্ষ' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে অর্থাৎ 'অন্তর্ যক্ষ' > 'অন্তরিক্ষ' (যকারের স্থানে ইকার)।

অতএব বলা যায় 'অন্তরিক্ষ' শব্দটির আকাশ বা অন্তরিক্ষ অর্থে সামবেদীয় দুই ব্রাহ্মণগ্রন্থ ও *নিরুক্তে* নির্বচন করা হলেও সর্বত্রই শব্দটিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিশ্লেষণ ও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যেগুলি দ্বারা শব্দটির নানাবিধ সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ	অন্তর্ > অন্তরিক্ষ।
জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ	অন্তর্যক্ষ > অন্তরিক্ষ।
নিরুক্ত	অন্তরা + √ক্ষম্-ধাতু = অন্তরিক্ষ।
	অন্তরা + √ক্ষি-ধাতু = অন্তরিক্ষ।
	অন্তর্ + ন + √ক্ষি-ধাতু ধাতু = অন্তরিক্ষ।

অসুর

সামবেদীয় *জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণে* বিদ্যমান 'অসুর' শব্দের নির্বচন *নিরুক্তেও* করা হয়েছে।

নিরুক্তের একাধিক স্থানে 'অসুর' শব্দের নির্বচন করা হয়েছে। প্রথমটি হল-

> অসুরা অসুরতা স্থানেষ্বস্তা স্থানেভ্য ইতি বাপি বাসুরিতি প্রাণনামাস্তঃ শরীরে ভবতি তেন তদ্বন্তঃ।।[২]

অর্থাৎ অসুররা তাদের স্থানগুলিতে সুষ্ঠুভাবে রত থাকে না অথবা তাদের স্থানসমূহ থেকে নিক্ষিপ্ত বা স্থানচ্যুত হয় অথবা অসু এটি প্রাণের নাম, (যা) শরীরে নিক্ষিপ্ত বা অবস্থিত হয়। তার দ্বারাই প্রাণবান বা প্রাণবিশিষ্ট হওয়ায় 'অসুর' এই সংজ্ঞা।

দশম অধ্যায়ে বলা হয়েছে-

> অসুরত্বম্ প্রজ্ঞাবত্বং বাঽনবত্বং বাঽপি বাঽসুরিতি প্রজ্ঞানামাস্যত্যনর্থানস্তাশ্চাস্যামর্থা অসুরত্বমাদিলুপ্তম্।[৩]

অর্থাৎ অসুরত্ব শব্দের অর্থ প্রজ্ঞাবত্ব বা প্রাণবত্ব কারণ 'অসু' শব্দ প্রজ্ঞাবাচক, যা অনর্থসমূহকে বিনাশ করে, এতে (প্রজ্ঞায়) ধনসমূহ বা পুরুষার্থ অস্ত বা নিহিত থাকে। 'অসু' শব্দ প্রাণবাচক, যার উপস্থিতিতে বা যার দ্বারা এই সমস্তই করা সম্ভব। 'অসুরত্ব' শব্দটি আদিলোপের দ্বারা সৃষ্ট।

বিমর্শ

তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাপ্ত নির্বচনে প্রথমে 'অসুরতা' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করে প্রথম হেতু হিসাবে 'অ-সুরতা' অর্থাৎ 'নঞ্ (অ) সু-রতা' এরকম বিগ্রহ পাওয়া যায়। তদনুসারে 'নঞ্ + সু + √রম্-ধাতু' থেকে 'অসুর' শব্দের নিষ্পত্তি করা হয়েছে। দ্বিতীয় কারণস্বরূপ বলা হয়েছে- 'স্থানেভ্যঃ স্বস্তা' অর্থাৎ স্থানচ্যুত বা নিক্ষিপ্ত। এর দ্বারা √অস্-ধাতুর (*অসু ক্ষেপণে*, দিবাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১২০৯) উত্তর উণাদি 'উরন্' প্রত্যয় যুক্ত করে 'অসুর' শব্দ নিষ্পন্ন করা হয়েছে এবং তৃতীয় কারণ হল- অসুমান অর্থাৎ প্রাণবান হওয়ায় 'অসুর' অর্থাৎ 'অসু' শব্দের উত্তর মত্বর্থীয় 'র' প্রত্যয় যুক্ত করে 'অসুর' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

দশম অধ্যায়ে প্রাপ্ত নির্বচন অনুসারে প্রথমত, প্রজ্ঞা ও প্রাণের বাচক 'অসু' শব্দের সাথে মত্বর্থীয় 'র' প্রত্যয় যুক্ত করে 'অসুর' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। দ্বিতীয় প্রসঙ্গে দুর্গাচার্যের উক্তি হল- "যদেতদসুরত্বং তদ্বসুরত্বং সদাদিবর্ণলোপেনাভিসংপন্নং জানীযাত্"[৪] অর্থাৎ 'বসুর' ('বসু' + 'র' প্রত্যয়, উদকবান) শব্দের 'ব'কার লোপ করে 'অসুর' শব্দ উৎপন্ন হয়েছে।

পরন্তু *জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণে* 'অসু' শব্দের সাথে √রম্-ধাতু যুক্ত করে 'অসুর' শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। এই ব্রাহ্মণগ্রন্থে মনকে 'অসুর' বলা হয়েছে কারণ মন 'অসু' অর্থাৎ প্রাণে রমণ করে। কিন্তু *নিরুক্তে* দেবতাদের শত্রু তথা রাক্ষস এবং দেবতা (উদকবান, প্রজ্ঞাবান অর্থে) উভয় অর্থেই 'অসুর' শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে।

জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ	অসু + √রম্-ধাতু = অসুর
নিরুক্ত	নঞ্ + সু + √রম্-ধাতু = অসুর
	√অস্-ধাতু + 'উরণ্' প্রত্যয় (উণাদি প্রত্যয়) = অসুর
	অসু + 'র' প্রত্যয় (মত্বর্থীয়) = অসুর
	বসু + 'র' প্রত্যয় = বসুর > অসুর (ব্ এর লোপ)

আদিত্য

'আদিত্য' শব্দের নির্বচন *জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ*, *জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ*, *ছান্দোগ্যোপনিষদ্* ও *নিরুক্তে* দৃষ্ট হয়।

নিরুক্ত অনুসারে 'আদিত্য' শব্দের নির্বচন হল-

> আদিত্যঃ কস্মাত্ ? আদত্তে রসান্ আদত্তে ভাসং জ্যোতিষাম্। আদীপ্তো ভাসেতি বা। অদিতেঃ পুত্র ইতি বা।[৫]

অর্থাৎ আদিত্য শব্দ কোথা থেকে এল, তার উত্তরে বলা হয়েছে, (যা) রস গ্রহণ করে, জ্যোতিষ্মান পদার্থের জ্যোতি বা দীপ্তি গ্রহণ করে অথবা স্বকীয় দীপ্তিতে আবৃত অথবা অদিতির পুত্র।

বিমর্শ

'আদত্তে' ও 'আদীপ্ত' এই দুই ক্রিয়াপদ থেকে যথাক্রমে 'আ' এই উপসর্গপূর্বক দানার্থক √দা ধাতু থেকে এবং 'আ' এই উপসর্গ পূর্বক √দীপ্-ধাতু থেকে 'আদিত্য' শব্দ নিষ্পন্ন হয় এবং অদিতির পুত্র হিসাবে অদিতি শব্দের সাথে অপত্যর্থক 'ঞ্য' প্রত্যয় যুক্ত করে 'আদিত্য' শব্দ ব্যুৎপন্ন হয়।

কিন্তু *জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্যোপনিষদে* 'আ' এই উপসর্গপূর্বক দানার্থক √দা-ধাতু থেকে 'আদিত্য' শব্দ উৎপন্ন হয়েছে।

জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ	আ-√দা-ধাতু > আদিত্য
ছান্দোগ্যোপনিষদ্	আ-√দা-ধাতু > আদিত্য
নিরুক্ত	আ-√দা-ধাতু > আদিত্য। আ-√দীপ্–ধাতু > আদিত্য। অদিতি > আদিত্য

ঋক্

সামবেদীয় *জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ* ও *জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণে* 'ঋক্' শব্দটি নির্বচন প্রাপ্ত হয়েছে। নিরুক্তকারও শব্দটির নির্বচন করেছেন। তাঁর প্রদর্শিত নির্বচনটি হল-

শরীরমত্র ঋগুচ্যতে যদনেনার্চন্তি।[৬]

অর্থাৎ শরীরকে 'ঋক্' বলা হয় কারণ এর দ্বারাই অর্চনা করা হয়।

বিমর্শ

দুর্গাচার্য এই নির্বচনের বৃত্তিস্বরূপ বলেছেন- "ঋচন্তি অর্চন্ত্যনেনেতি ঋক্ 'ঋচ স্তুতৌ' করণে ক্বিপ্"।[৭] অতএব *ঋচ স্তুতৌ* ধাতুর সাথে করণবাচ্যে 'ক্বিপ্' প্রত্যয় যুক্ত করে 'ঋক্' শব্দ নিষ্পন্ন হয়।

কিন্তু *জৈমিনীয়ব্রাহ্মণে* 'ঊর্ঘ' শব্দটিকে পরোক্ষভাবে 'ঋক্' বলা হয়েছে। ধ্বনিপরিবর্তনের দ্বারাই 'ঊর্ঘ' শব্দ থেকে 'ঋক্' শব্দের উৎপত্তি (ঊর্ঘ > ঋক্, ঊকারের লোপ, রেফের স্থানে ঋকার এবং ঘকারের স্থানে ককার হয়েছে) হয়েছে। এবং *জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণে অর্চ পূজায়াম্* ধাতু থেকে 'ঋচ্' শব্দের ব্যুৎপত্তি হয়েছে (অর্চ্ > ঋচ্)।

জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ	ঊর্ঘ > ঋক্।
জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ	√অর্চ্ ধাতু > ঋচ্।
নিরুক্ত	√ঋচ্-ধাতু + ক্বিপ্ = ঋক্।

গায়ত্র

জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ, জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ ও *নিরুক্তে* 'গায়ত্র' শব্দের নির্বচন বিদ্যমান। আচার্য যাস্ক 'গায়ত্র' শব্দের নির্বচন করেছেন-

গাযত্রং গাযতেঃ স্তুতিকর্মণঃ।[৮]

অর্থাৎ 'গায়ত্র' শব্দটি স্তুত্যর্থক √গৈ-ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে।

বিমর্শ

'গায়ত্র' শব্দের নির্বচনে স্তুত্যর্থক √গৈ-ধাতুর উল্লেখ পাওয়া যায়। অতএব √গৈ-ধাতুর সাথে করণবাচ্যে 'ষ্ট্রন্'-প্রত্যয় যুক্ত করে শব্দটির ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু *জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণে* √গৈ-ধাতু নিষ্পন্ন 'গায়ন্' থেকে 'গায়' অংশ এবং √ত্রৈ-ধাতু থেকে জাত 'অত্রায়ত' থেকে 'ত্র' গৃহীত হয়ে 'গায়ত্র' শব্দ উৎপন্ন হয়।

জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ	√গৈ ধাতু + √ত্রৈ ধাতু > গায়ত্র।
নিরুক্ত	√গৈ ধাতু + ষ্ট্রণ্ প্রত্যয় = গায়ত্র।

গায়ত্রী

সামবেদান্তর্গত *ছান্দোগ্যোপনিষদে* যে 'গায়ত্রী' শব্দের নির্বচন করা হয়েছে, তা আচার্য যাস্ক দ্বারাও নির্বচিত হয়েছে।

আচার্য যাস্ক কর্তৃক নির্বচনটি হল-

> গাযত্রী গাযতেঃ স্তুতিকর্মণঃ। ত্রিগমনা বা বিপরীতা গাযতো মুখাদুদপতদিতি চ ব্রাহ্মণম্।[৯]

অর্থাৎ 'গায়ত্রী' শব্দটি স্তুত্যর্থক √গৈ-ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে অথবা 'গায়ত্রী' ত্রিগমনা তিনটি পাদবিশিষ্টা, এই 'ত্রিগম' শব্দই অক্ষর বিপর্যয়ের দ্বারা 'গায়ত্রী' শব্দে পরিণত হয়েছে। ব্রাহ্মণসাহিত্যে বলা হয়েছে স্তুতিকালীন ব্রহ্মার মুখ থেকে পতিত হয়েছিল তাই 'গায়ত্রী' সংজ্ঞা হয়েছে।

বিমর্শ

'গায়ত্রী' শব্দের নির্বচন থেকে তিনটি উপায়ে শব্দটি সিদ্ধ করা হয়েছে। প্রথমত, স্তুত্যর্থক √গৈ-ধাতুর সাথে 'অত্রিন্' প্রত্যয় যুক্ত করে 'আয়' আদেশ হয়ে স্ত্রীলিঙ্গে 'ঙীষ্' প্রত্যয় যুক্ত করে সিদ্ধ হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ত্রিগম > ত্রিগায় > গায়ত্রী। তৃতীয়ত, √গৈ-ধাতু ও √পত্-ধাতু যোগে 'গায়ত্রী' শব্দ ব্যুৎপত্তি করা হয়েছে। *ছান্দোগ্যোপনিষদে* √গৈ-ধাতু নিষ্পন্ন 'গায়তি' থেকে 'গায়' অংশ এবং √ত্রৈ-ধাতু থেকে জাত 'ত্রায়তে' থেকে 'ত্র' গৃহীত হয়ে 'গায়ত্র' শব্দ উৎপন্ন হয়। তারপর অন্ত্যস্বর অকারের দীর্ঘ-ঈকারে পরিবর্তন করে 'গায়ত্রী' রূপটি পাওয়া যায়।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্ –	√গৈ-ধাতু + √ত্রৈ-ধাতু > গায়ত্র > গায়ত্রী।
নিরুক্ত	√গৈ-ধাতু + অত্রিন্ প্রত্যয় = গায়ত্রি ('আয়' আদেশ) > গায়ত্রী (স্ত্রীলিঙ্গ 'ঙীষ্')। ত্রিগম > ত্রিগায় > গায়ত্রী (অক্ষরবৈপরীত্য), (স্ত্রীলিঙ্গ 'ঙীষ্' প্রত্যয়)। গাপত্র > গায়ত্র > গায়ত্রী।

নভস্

'নভস্' শব্দের নির্বচন *জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ* ও *নিরুক্তে* লক্ষ্য করা যায়। এই ব্রাহ্মণে 'নভস্' হল নভোলোক বা অন্তরিক্ষলোক কিন্তু নিরুক্তে 'নভস্' শব্দটি আদিত্যের বোধক হিসাবে নির্বচিত হয়েছে। যাস্ককৃত নির্বচনটি হল-

নভ আদিত্যো ভবতি। নেতা রসানাম্। নেতা ভাসাম্। জ্যোতিষাং প্রণয়ঃ। অপি বা ভন এব তদ্বিপরীতঃ। ন ন ভাতীতি বা।[১০]

আদিত্যের বোধক হয় 'নভস্' এই শব্দ। যা রসসমূহের নেতা বা নায়ক, যেটি জ্যোতিঃসমূহের নেতা বা নায়ক, যা জ্যোতিঃশ্চক্রের নায়ক বা নেতা অথবা 'ভন' শব্দই বর্ণবিপর্যয়ের দ্বারা এই শব্দ প্রাপ্ত হয়েছে অথবা প্রকাশ যে পায়না তা নয় এইভাবেও পদটি ব্যুৎপন্ন করা যায়।

বিমর্শ

রসসমূহের নেতা এই অর্থে এবং জ্যোতিঃসমূহের নেতা অর্থে √নী-ধাতু থেকে 'নভস্' শব্দের নিষ্পত্তি করা যায়। 'নেতা ভাসাম্'- এই স্থানে √নী-ধাতু থেকে 'ন' ও 'ভাসাম্' এর 'ভ' যুক্ত হয়ে 'নভ' শব্দ হয়েছে বলা যায়। 'ভন' শব্দও বিপরীত করে 'নভ' হওয়ার কথা নিরুক্তকার বলেছেন। এছাড়াও 'ন ন ভাতি' থেকে 'ন' এবং 'ভাতি' অর্থাৎ *ভা দীপ্তৌ* ধাতুর 'ভ'-কে গ্রহণ করে 'নভ' (নভস্) পদ সিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু *জৈমিনীয়ব্রাহ্মণে* 'নভস্' শব্দটি 'ন বিভেতি' এই ক্রিয়াপদ থেকে 'ন' এবং 'বিভেতি' অর্থাৎ *ঙি ভী ভয়ে* ধাতু থেকে 'ভ' গ্রহন করে 'নভ' শব্দ সিদ্ধ করা যায়।

জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ	ন (নঞর্থক) + √ভী-ধাতু (√ভী-ধাতু > 'ভ') = নভস্।
নিরুক্ত	নী-ধাতু > নভস্। ন (√নী-ধাতু) + ভ (ভাসাম্) = নভস্। ভন > নভ (নভস্)। ন + ভ (√ভা-ধাতু) = নভস্।

পুরোহিত

জৈমিনীয়ব্রাহ্মণস্থিত পুরোহিত শব্দের নির্বচন আচার্য যাস্ক প্রণীত নিরুক্তেও প্রদর্শিত হয়েছে। উভয় স্থানেই 'পুরোহিত' শব্দ সমান ধাতু প্রত্যয় হতে নিষ্পন্ন হয়েছে, যা সম্পূর্ণরূপে ব্যাকরণগত প্রক্রিয়ার অনুরূপ। *নিরুক্ত* নামক নির্বচনগ্রন্থে বলা হয়েছে-

পুরোহিতঃ পুর এনং দধতি।[১১]

'পুরোহিত' হলেন তিনি, এনাকে রাজারা (শান্তি, পৌষ্টিক ইত্যাদি কর্মে) অগ্রভাগে স্থাপন করেন।

বিমর্শ

পুরস্ অব্যয় পূর্বক √ধা-ধাতু থেকে 'পুরোহিত' শব্দের উৎপত্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। *জৈমিনীয়ব্রাহ্মণেও* 'পুরস্' অব্যয় পূর্বক √ধা-ধাতুর (*ডুধাঞ্ ধারণপোষণয়োঃ*, জুহোত্যাদিগণ, ১০৬২) সাথে 'ক্ত'-প্রত্যয় যুক্ত করে 'পুরোহিত' শব্দটি সিদ্ধ হয় (পুরস্-√ধা-ধাতু + 'ক্ত' প্রত্যয় = পুরোহিত)।

জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ	পুরস্ – √ধা ধাতু + 'ক্ত' প্রত্যয় = পুরোহিত।
নিরুক্ত	পুরস্ – √ধা ধাতু + 'ক্ত' প্রত্যয় = পুরোহিত।

পৃথিবী

'পৃথিবী' শব্দের নির্বচন সামবেদান্তর্গত *জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ* ও *নিরুক্তে* দৃষ্ট হয়। উভয় গ্রন্থেই শব্দটি 'পৃথিবী' অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে। যাস্ককৃত ব্যুৎপত্তিটি হল-

প্রথনাৎ পৃথিবীত্যাহুঃ।[১২]

প্রথন ক্রিয়া বা বিস্তার হেতুই 'পৃথিবী' এই নাম।

বিমর্শ

'প্রথ বিস্তারে' ধাতু থেকে 'পৃথিবী' শব্দ নিষ্পন্ন করা হয়েছে, এটি ব্যাকরণসম্মত অর্থাৎ 'প্রথ বিস্তারে' ধাতু > 'পৃথিবী'। √প্রথ্-ধাতুর উত্তর 'ষিবন্' প্রত্যয় যুক্ত করে, 'র্' এর সম্প্রসারণ 'ঋ' হয় এবং 'ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ'[১৩] সূত্র দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গে 'ঙীষ্' প্রত্যয় যুক্ত করে 'পৃথিবী' শব্দটি সিদ্ধ হয়। *জৈমিনীয়ব্রাহ্মণেও* 'পৃথিবী' শব্দ *নিরুক্তে* উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসারেই নির্বচন করা হয়েছে।

জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ	√প্রথ্-ধাতু + 'ষিবন্' প্রত্যয় > পৃথিব ('র্' এর সম্প্রসারণ 'ঋ') + 'ঙীষ্' প্রত্যয় (ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ) > পৃথিবী
নিরুক্ত	√প্রথ্-ধাতু + 'ষিবন্' প্রত্যয় > পৃথিব ('র্' এর সম্প্রসারণ 'ঋ') + 'ঙীষ্' প্রত্যয় (ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ) > পৃথিবী।

বৃহস্পতি

সামবেদান্তর্গত *জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণে, ছান্দোগ্যোপনিষদ্* এবং *নিরুক্তে* 'বৃহস্পতি' শব্দের নির্বচন করা হয়েছে। *জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণে* অপান বায়ুকে 'বৃহস্পতি' বলা হয়েছে। *নিরুক্তে* মেঘের পরিচালক বায়ুকে, *ছান্দোগ্যোপনিষদে* প্রাণকে 'বৃহস্পতি' বলা হয়েছে। *নিরুক্তে* উল্লেখিত 'বৃহস্পতি' শব্দের নির্বচনটি হল-

বৃহস্পতিঃ বৃহতঃ পাতা বা পালযিতা বা।[১৪]

'বৃহস্পতি' এই শব্দটির অর্থ হল বৃহতের রক্ষক বা পালক। মহৎ শব্দের দ্বারা বিশাল জলরাশি বা জগৎ অর্থ দ্যোতিত হয়।

বিমর্শ

নিরুক্ত অনুসারে 'বৃহস্পতি' শব্দটির উৎস হল 'বৃহত্' শব্দের সাথে রক্ষণার্থক √পা-ধাতু (*পা রক্ষণে*, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১০৫৬) অথবা √পাল-ধাতু (*পাল রক্ষণে*, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১৬০৯)। কিন্তু, *ছান্দোগ্যোপনিষদে* 'বৃহস্পতি' শব্দ 'বৃহত্যাঃ পতিঃ বৃহস্পতিঃ' এইরূপ বিগ্রহ দ্বারা ষষ্ঠীসমাস নিষ্পন্ন হিসাবে পাওয়া যায় এবং *জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণেও* 'বৃহতী' ও 'পতি' শব্দ যুক্ত হয়ে 'বৃহস্পতি' শব্দ ব্যুৎপন্ন হয়েছে।

জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ	বৃহতী (বাক্) + পতিঃ = বৃহস্পতিঃ।
ছান্দোগ্যোপনিষদ্	বৃহতী (বাক্) + পতিঃ ('বৃহত্যাঃ পতিঃ) = বৃহস্পতিঃ।
নিরুক্ত	বৃহত্ + √পা-ধাতু বা √পাল্-ধাতু (রক্ষণার্থক) > বৃহস্পতি

রুদ্র

সামবেদসংহিতার অন্তর্গত *জৈমিনীয়ব্রাহ্মণে* পুরুষের দশ প্রাণ এবং আত্মা নিয়ে একাদশ রুদ্র। *জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ* অনুসারে প্রাণসমূহই রুদ্র ও *ছান্দোগ্যোপনিষদেও* প্রাণসমূহকেই রুদ্র বলা হয়েছে। *নিরুক্তে* উল্লিখিত রুদ্র হলেন রুদ্র দেবতা, মরুদ্গণের পিতা আবার রুদ্রগণও। যে রুদ্র শব্দের নির্বচন নির্বাচিত সামবেদীয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থে করা হয়েছে নিরুক্তকার যাস্কও সেই একই শব্দের নির্বচন করেছেন। তাঁর মতে-

> রুদ্রো রৌতীতি সতঃ, রোরূযমাণো দ্রবতীতি বা রোদযতের্বা, যদরুদত্তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বম্ ইতি কাঠকম্, যদরোদীত্তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বম্, ইতি হারিদ্রবিকম্।[১৫]

অর্থাৎ 'রুদ্র' শব্দ করেন অথবা অত্যধিক শব্দ করতে করতে চলেন অথবা শত্রুদের রোদন করান, যেহেতু রোদন করেছিলেন তাই রুদ্রের রুদ্রত্ব- এটি কঠশাখার প্রবচন। মৈত্রায়ণীয় হারিদ্রব শাখার প্রবচন অনুযায়ী যেহেতু রোদন করেছিলেন তাই রুদ্রের রুদ্রত্ব।

বিমর্শ

নিরুক্তস্থিত 'রুদ্র' শব্দের নির্বচন থেকে শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে একাধিক ধারণা পাওয়া যায়। প্রথমত, শব্দার্থক √রু-ধাতু থেকে 'রুদ্র' শব্দের উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, √রু-ধাতু ও √দ্রু ধাতুর সংযোগে 'রুদ্র' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। তৃতীয়ত, ণিচ্ প্রত্যয়ের অর্থে √রুদ্-ধাতু থেকে 'রুদ্র' শব্দ নিষ্পন্ন করা হয়েছে। চতুর্থত, √রুদ্-ধাতু থেকে 'রুদ্র' শব্দের ব্যুৎপত্তি করা হয়েছে কিন্তু *ছান্দোগ্যোপনিষদে* ণিজন্ত √রুদ্-ধাতু (*রুদির্ অশ্রুবিমোচনে*, অদাদিগণ, ১০৬৭) থেকে 'রুদ্র' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে (√রুদ্-ধাতু + ণিচ্ + রক্ = রুদ্র)। *জৈমিনীয়ব্রাহ্মণে* এবং *জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণেও* 'রুদ্র' শব্দ ণিজন্ত √রুদ্-ধাতু থেকেই নিষ্পন্ন করা যায়।

জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ	√রুদ্ ধাতু + ণিচ্ + রক্ = রুদ্র।
জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ	√রুদ্ ধাতু + ণিচ্ + রক্ = রুদ্র।
ছান্দোগ্যোপনিষদ্	√রুদ্ ধাতু + ণিচ্ + রক্ = রুদ্র।
নিরুক্ত	√রু ধাতু > রুদ্র।
	√রু ধাতু + √দ্রু ধাতু > রুদ্র।
	√রুদ্ ধাতু + ণিচ্ + রক্ = রুদ্র।

বসু

ছান্দোগ্যোপনিষদ্ অনুসারে প্রাণসমূহই বসুগণ আবার *নিরুক্তে* বসুগণ হলেন গণদেবতা এবং তাঁরা অগ্নি, ইন্দ্র এবং আদিত্যের সাথে সম্পর্কবশাৎ তিনলোকেরই দেবতা। উভয় গ্রন্থেই 'বসু' শব্দের নির্বচন করা হয়েছে নিরুক্তকারের মতে-

> বসবো যদ্বিবসতে। বসব আদিত্যরশ্ময়ো বিবাসনাত্।[১৬]

অর্থাৎ যেহেতু সকল বস্তু আচ্ছাদিত করে (তাই) বসুগণ বা বসু এই সংজ্ঞা। অন্ধকার বিবাসন বা দূর করায় বসুগণ আদিত্যরশ্মিসমূহকেও বলা হয়।

বিমর্শ

'বিবাসতে' ও 'বিবাসনাত্' এই ক্রিয়াপদ থেকে অনুমান করা যায় 'বি' উপসর্গ পূর্বক *বস আচ্ছাদনে* ধাতু থেকে 'বসু' শব্দ নির্বচিত হয়। অতএব *নিরুক্ত* অনুসারে 'বসু' শব্দ 'বি' উপসর্গ পূর্বক √বস্-ধাতু থেকে উৎপন্ন। *ছান্দোগ্যোপনিষদে* 'বসু' শব্দটি √বস্-ধাতু থেকে নিষ্পন্ন অর্থাৎ √বস্-ধাতুর উত্তর 'উ' প্রত্যয় যুক্ত করে 'বসু' শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্	√বস্-ধাতু + 'উ' প্রত্যয় = বসু।
নিরুক্ত	*নিরুক্ত* – বি- √বস্-ধাতু > বসু।

বাত

'বাত' শব্দের নির্বচন *জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ* ও *নিরুক্তে* বিদ্যমান। উভয়ত্রই ব্যাকরণগত পদ্ধতি অনুসারেই নির্বচন করা হয়েছে। যাস্ক কৃত নির্বচনটি হল-

বাতো বাতীতি সতঃ।[১৭]

অর্থাৎ 'বাত' বা বায়ু সর্বদা গমনশীল।

বিমর্শ

গত্যর্থক √বা ধাতু থেকে কর্তৃবাচ্যে 'বাত' শব্দ উৎপন্ন করা হয়েছে। *জৈমিনীয়ব্রাহ্মণেও* একই উপায় অবলম্বন করা হয়েছে। কর্তৃবাচ্যে গত্যর্থক √বা-ধাতুর (*বা গতিগন্ধনয়োঃ*, অদাদিগণ, ১০৫০) উত্তর 'ক্ত' প্রত্যয় যুক্ত করেই 'বাত' শব্দটি ব্যুৎপন্ন হয়েছে।

জৈমিনীয়ব্রাহ্মণে	√বা-ধাতু + 'ক্ত' প্রত্যয় = বাত।
নিরুক্ত	√বা-ধাতু + ক্ত প্রত্যয় = বাত।

বৈখানস

'বৈখানস' শব্দের নির্বচন *জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ* ও *নিরুক্তে* লক্ষ্য করা যায়। *নিরুক্ত* কৃত নির্বচনটি হল-

বিখননাদ্ বৈখানস।[১৮]

বিশেষরূপে (অগ্নিস্থান) খনন হেতু 'বৈখানস' এই সংজ্ঞা।

বিমর্শ

নিরুক্তে 'বি' এই উপসর্গপূর্বক √খন্-ধাতু হতে 'বিখনন' পদ সিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু *জৈমিনীয়ব্রাহ্মণে* 'তেন প্রোক্তম্' এই অর্থে 'বিখানস্' শব্দের সাথে 'অণ্' এই প্রত্যয় যুক্ত করে 'বৈখানস' শব্দটি সিদ্ধ হয়।

জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ	বি- √খন্-ধাতু > বিখনন।
নিরুক্ত	বিখানস্ + অণ্ = বৈখানস।

শক্করী

'শক্করী' শব্দের নির্বচন সামবেদীয় *তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ* এবং যাস্কাচার্যের *নিরুক্ত* গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়। উভয় স্থানেই √শক্-ধাতু থেকে 'শক্করী' শব্দটি নিষ্পন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। যাস্ককৃত নির্বচন হল-

> শক্র্য্য ঋচঃ শক্নোতেঃ। তদ্যদাভির্বৃত্রমশকদ্ধন্তুং তচ্ছক্করীণাং শক্করীত্বমিতি বিজ্ঞায়তে।[১৯]

'শক্করী' শব্দের প্রথমার বহুবচনের রূপ হল 'শক্র্য্য' অর্থাৎ ঋক্ সমূহ যেগুলি (সমর্থ হওয়া অর্থে) √শক্-ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। যেহেতু এই ঋক্ গুলির দ্বারা বৃত্রকে বধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন ইন্দ্রদেব তাই 'শক্করী' নামক ঋক্-সমূহের শক্করীত্ব এটি জানা যায়।

বিমর্শ

নিরুক্তকার নির্বচনে স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন যে √শক্-ধাতু থেকেই 'শক্বন্' তথা এই শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ প্রথমার একবচনের রূপ 'শক্করী' রূপটি সিদ্ধ হয়েছে। সামবেদীয় *তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ* অনুসারেও পদটি 'সমর্থ হওয়া' অর্থে √শক্'-ধাতু থেকেই নিষ্পন্ন করা হয়েছে।

নিরুক্ত	√শক্-ধাতু + বনিপ্ প্রত্যয় = শক্বন্, প্রথমার একবচন শক্করী।
তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ	√শক্-ধাতু + বনিপ্ প্রত্যয় = শক্বন্ + ঙীষ্' প্রত্যয়, 'ন্' এর রেফাদেশ = শক্করী।

সমুদ্র

'সমুদ্র' শব্দের নির্বচন *জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ* ও *নিরুক্ত* উভয় গ্রন্থেই বিদ্যমান। ব্রাহ্মণগ্রন্থটিতে 'সমুদ্র' শব্দ 'সমুদ্র' অর্থাৎ পৃথিবীস্থ জলরাশিকেই বুঝিয়েছে। কিন্তু নিরুক্তে 'সমুদ্র' শব্দ অন্তরিক্ষ এবং পৃথিবীস্থ জলরাশিসমূহ উভয়ে অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে। *নিরুক্তে* বিদ্যমান 'সমুদ্র' শব্দের নির্বচন প্রশ্নোত্তরের আকারে পরিবেশিত হয়েছে। তা হল-

> সমুদ্রঃ কস্মাত্। সমুদ্রবন্ত্যস্মাদাপঃ সমভিদ্রবন্ত্যেনমাপঃ সংমোদন্তেঽস্মিন্ ভূতানি সমুদকো ভবতি সমুনত্তীতি বা।[২০]

অর্থাৎ সমুদ্র এই নাম বা সংজ্ঞা কোথা থেকে হল? তার উত্তরে বলা হয়েছে- এখান থেকে (সমুদ্র, অন্তরিক্ষ) জলরাশি সম্যক্ ভাবে উর্ধে গমন করে, এই স্থানের অভিমুখে জল সম্যক্ভাবে প্রবাহিত হয়, এখানে প্রাণিসমূহ আনন্দিত হয়, এই অংশে জলরাশি একত্রাবস্থিত হয় অথবা যা জলসিক্ত বা ক্লেদিত করে সেটিই সমুদ্র।

বিমর্শ

নিরুক্তে 'সমুদ্র' শব্দের উৎপত্তির একাধিক কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত, স্কন্দস্বামীর মত অনুসারে 'সমুত্' শব্দ পূর্বক √দ্রু-ধাতুর সাথে 'ড'-প্রত্যয় যুক্ত করে সমুদ্র উৎপন্ন হয়েছে। দ্বিতীয় কারণস্বরূপ পূর্বেরই অনুরূপ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হয়েছে। তৃতীয় হেতু থেকে শব্দটির ব্যুৎপত্তি হল 'সম্' এই উপসর্গপূর্বক √মুদ্-

ধাতুর উত্তর 'রক্'-প্রত্যয়। চতুর্থ হেতু অনুসারে স্কন্দস্বামীর উক্তি অনুযায়ী 'সম্' এই উপসর্গ পূর্বক 'উদক' শব্দের সাথে মত্বর্থে 'রক্' প্রত্যয় যুক্ত করে 'সমুদ্র' শব্দ নিষ্পন্ন। পঞ্চম কারণ অনুসারে 'সমুদ্র' শব্দ 'সম্' পূর্বক *উদী ক্লেদনে* ধাতুর সঙ্গে 'রক্' প্রত্যয় যুক্ত করে সিদ্ধ হয়। কিন্তু *জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণে* 'সম্' উপসর্গ ও √দ্রু-ধাতু থেকে 'সমুদ্র' শব্দের উৎপত্তি (সম্- √দ্রু-ধাতু > সমুদ্র) সিদ্ধ হয়েছে।

জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ	সম্- √দ্রু-ধাতু > সমুদ্র।
নিরুক্ত	সমুত্- √দ্রু-ধাতু + ড = সমুদ্র।
	√দ্রু-ধাতু + ড = সমুদ্র।
	সম্– √মুদ্-ধাতু + রক্ = সমুদ্র।
	সম্– উদক + র (মত্বর্থে) = সমুদ্র।
	সম্- √উন্দ্-ধাতু + রক্ = সমুদ্র

সাম

'সাম' বা 'সামন্' শব্দটি *জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ* ও *জৈমিনীয়ব্রাহ্মণে* যেমন উপলব্ধ হয় তেমনি *নিরুক্তে*ও শব্দটির নির্বচন করা হয়েছে। নিরুক্তস্থিত নির্বচনটি হল-

সাম সম্মিতমৃচাস্যতের্বর্চা সমং মেন ইতি নৈদানাঃ।[২১]

'সাম' সেটি যা ঋকের দ্বারা পরিমাপিত অথবা √অস্-ধাতু কিংবা √সো-ধাতু থেকে সাম' শব্দ উৎপন্ন হয়, ঋকের সমান সংখ্যক সাম- প্রজাপতি এটিই পরিজ্ঞাত হয়েছিল।

বিমর্শ

নিরুক্তে 'সাম' শব্দের নির্বচনে শব্দটি সৃষ্টিতে একাধিক কারণের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথমত, 'সম্' এই উপসর্গপূর্বক √মা-ধাতু (*মাঙ্ মানে*, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১১৪২, দিবাদিগণ) থেকে সামের উৎপত্তি বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ক্ষেপণার্থক √অস্-ধাতু (*অসু ক্ষেপণে*, পাণিনীয়-ধাতুপাঠ ১২০৯) অথবা অবসানার্থক √সো-ধাতু (*ষো অন্তকর্মণি*, দিবাদিগণ, পাণিনীয়-ধাতুপাঠ ১১৪৭) 'সাম' শব্দের উৎস হিসাবে ধরা হয়েছে। তৃতীয়ত, 'সম্' শব্দ পূর্বক জ্ঞানার্থক √মন্ (*মন জ্ঞানে*, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১১৭৬) ধাতু থেকে উৎপত্তি হয়েছে শব্দটি। পরন্তু *জৈমিনীয়ব্রাহ্মণে* 'সম্' এই উপসর্গ পূর্বক গত্যর্থক √ইণ্-ধাতু (*ইণ গতৌ*) থেকে 'সাম' শব্দটি নিষ্পন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে (সম্– *ইণ গতৌ* ধাতু > সাম)। *জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণে* একটি নির্বচনে *জৈমিনীয়ব্রাহ্মণে*রই অনুরূপ পদ্ধতিতে অর্থাৎ 'সম্' এই উপসর্গ পূর্বক √ইণ্-ধাতু থেকে 'সাম' শব্দটি নিষ্পন্ন করা হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় নির্বচনটি আবার সম শব্দ থেকে সাম শব্দের উৎপত্তির ইঙ্গিত বহন করে (সম > সাম), যা *ছান্দোগ্যোপনিষদে*ও লক্ষ্য করা যায়। *ছান্দোগ্যোপনিষদের* প্রথম অধ্যায়ে 'সা' এবং 'অম' এই শব্দ দুটি মিলিত

হয়ে 'সাম' শব্দের উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে পুনরায়, দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'সম' শব্দ থেকে 'সাম' শব্দের উৎপত্তির সংকেত পাওয়া গেছে।

জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ	সম্ – √ইণ্-ধাতু > সাম
জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ	সম্ - √ইণ-ধাতু > সাম
	সম > সাম
ছান্দোগ্যোপনিষদ্	সা + অম = সাম
	সম > সাম
নিরুক্ত	সম্ –√মা-ধাতু > সাম
	√অস্-ধাতু > সাম
	√ষো-ধাতু > সাম
	সম্ – √মন্-ধাতু > সাম

সিন্ধু

জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ ও *নিরুক্তে* 'সিন্ধু' শব্দের নির্বচন লক্ষ্য করা যায়। উভয় গ্রন্থেই শব্দটির অর্থ হল নদী। নদীবাচক 'সিন্ধু' শব্দের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে নিরুক্তকারের উক্তিটি হল-

সিন্ধুঃ স্রবণাত্।[২২]

অর্থাৎ স্রুত বা প্রবাহিত হওয়ার জন্য 'সিন্ধু' এই নাম।

বিমর্শ

'সিন্ধু' শব্দের নির্বচনে গত্যর্থক √স্রু-ধাতুর সংকেত পাওয়া যায়। অতএব *নিরুক্ত* অনুসারে 'সিন্ধু' শব্দ √স্রু-ধাতু নিষ্পন্ন। কিন্তু *জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণে* 'ষিঞ্ বন্ধনে' ধাতু নিষ্পন্ন 'সিতম্' এই ক্রিয়াপদের সাথে 'সিন্ধু' শব্দের আদ্যংশ 'সি' এর অক্ষরগত সাম্য থাকায় মনে করা যায় 'সিতম্' ক্রিয়াপদ থেকে 'সিন্ধু' শব্দের উৎপত্তি।

জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ	সিতম্ > সিন্ধু
নিরুক্ত	স্রু-ধাতু > সিন্ধু

সূর্য

'সূর্য' শব্দের নির্বচন *জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ* ও *নিরুক্তে* লক্ষ্য করা যায়। দুই গ্রন্থেই আদিত্য 'সূর্য' নামে অভিহিত হয়েছেন। তবে নিরুক্তে উদয়প্রাপ্ত আদিত্যকে 'সূর্য' বলা হয়েছে। নিরুক্তে কৃত 'সূর্য' শব্দের নির্বচনটি হল-

সূর্যঃ সর্তের্বা। সুবতের্বা। স্বীর্যতের্বা।[২৩]

অর্থাৎ সৃত বা অপগত হন তাই সূর্য। অথবা প্রেরণ করেন (সকল জগৎকে কর্মে প্রেরিত করেন) তাই সূর্য। অথবা সুষ্ঠভাবে প্রেরিত করেন বলা 'সূর্য' এই নাম।

বিমর্শ

নিরুক্তকার 'সূর্য' শব্দটিকে তিনটি ধাতু থেকে নিষ্পন্ন করেছেন। প্রথমত, গমনার্থক √সৃ-ধাতু থেকে 'সূর্য' শব্দের উৎপত্তির কথা বলেছেন। দ্বিতীয়ত, প্রেরণার্থক √সূ-ধাতু থেকে 'সূর্য' শব্দ ব্যুৎপন্ন হয়েছে। তৃতীয়ত, সুষ্ঠু অর্থাৎ 'সু' এই উপসর্গপূর্বক গমনার্থক √ঈর্-ধাতু থেকে 'সূর্য' শব্দের নিষ্পত্তি করেছেন। কিন্তু *জৈমিনীয়ব্রাহ্মণে* 'সোঽর্য' শব্দই যথাক্রমে সৌর্য ও অবশেষে 'সূর্য' শব্দে পরিণত হয়েছে।

জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ	সোঽর্য > সৌর্য > সূর্য।
নিরুক্ত	√সৃ-ধাতু > সূর্য
	√সূ-ধাতু > সূর্য
	সু + √ঈর্-ধাতু > সূর্য

৩.২. উপসংহার

সামগ্রিক পর্যালোচনার ভিত্তিতে জানা যায়, নিরুক্তকার শব্দের উৎপত্তিতে কখনও একটি ব্রাহ্মণগ্রন্থের সাথে, কখনও বা একাধিক ব্রাহ্মণগ্রন্থের সাথে সহমত পোষণ করেছেন। আবার একাধিক ব্রাহ্মণগ্রন্থ ও *নিরুক্তে* একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিশ্লেষণ ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (যেমন অন্তরিক্ষ শব্দ)। পুনরায় কোন স্থানে ব্রাহ্মণগ্রন্থকে অনুসরণ করলেও তদতিরিক্ত সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যুৎপত্তিরও সন্ধান দিয়েছেন। এছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে যাস্কাচার্য একই শব্দের ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তির সাথে তদ্ভিন্ন অর্থের দ্যোতক হিসাবে ভিন্ন ব্যুৎপত্তিও প্রদর্শন করেছেন। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য 'আদিত্য' শব্দের ব্যুৎপত্তি। অতএব বলা যায় আচার্য যাস্ক বৈদিক নির্বচন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন ঠিকই কিন্তু সর্বত্র অন্ধভাবে গ্রহণ না করে নিজ স্বতন্ত্র মহিমারও পরিচয় দিয়েছেন।

তথ্যপঞ্জি

[১] মুকুন্দ ঝা শর্মা (সম্পা.), *নিরুক্তম্* ২/৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮০-৮১।
[২] অমরেশ্বর ঠাকুর (সম্পা.), *নিরুক্তম্* ৩/৮/৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৬৮।
[৩] *তদেব* ১০/৩৪/২-৪, পৃষ্ঠাঙ্ক ১১৪৬-১১৪৭।
[৪] তত্রৈব।
[৫] অমরেশ্বর ঠাকুর (সম্পা.) ২/১৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ২৬০।
[৬] মুকুন্দ ঝা শর্মা (সম্পা.) ১৩/১/১১, পৃষ্ঠাঙ্ক ৫২৮।
[৭] তত্রৈব।
[৮] অমরেশ্বর ঠাকুর (সম্পা.) নিরুক্তম্ ১/২/৪/৫, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮৭।
[৯] *তদেব* ৭/১২/৭, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮৭৫।
[১০] *তদেব* ২/১/১৪/১১, পৃষ্ঠাঙ্ক ২৭১।

[১১] *তদেব* ২/১/১২/৫, পৃষ্ঠাঙ্ক ২৫৮।

[১২] *তদেব* ১/৩/৩/৭, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৩৫।

[১৩] *অষ্টাধ্যায়ীসূত্রপাঠঃ* ৪/১/৪১।

[১৪] অমরেশ্বর ঠাকুর (সম্পা.) নিরুক্তম্ ১০/১১/৫, পৃষ্ঠাঙ্ক ১০৯৮।

[১৫] *তদেব* ১০/৫/৮, পৃষ্ঠাঙ্ক ১০৮২।

[১৬] *তদেব* ১২/৪১/৪, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৩৪৫।

[১৭] *তদেব* ১০/৩৪/৫, পৃষ্ঠাঙ্ক ১১৪৭।

[১৮] *তদেব* ৩/১৭/৮, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪২৭।

[১৯] *তদেব* ১/২/৪/৬-৭, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮৭-৮৮।

[২০] *তদেব* ২/১/১০/১৩-১৪, পৃষ্ঠাঙ্ক ২৪৮।

[২১] *তদেব* ৭/১২/৫, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮৭৪।

[২২] *তদেব* ৫/২৭/৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ৬৮৪।

[২৩] *তদেব* ১২/১৪/৭, পৃষ্ঠাঙ্ক ১২৯৩।

***

চতুর্থ অধ্যায়

বৃহদ্দেবতা ও *মহাভারতে* প্রাপ্ত নির্বচন

৪.০. ভূমিকা

বৈদিকনির্বচন যে শুধুমাত্র সংহিতা ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের শোভা বর্ধন করেছে তা নয়, এইসব সাহিত্যের আলোকে আলোকিত গ্রন্থসমূহেও তৎকালীন গ্রন্থকারদের হাত ধরে প্রাণ প্রতিষ্ঠার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে। এপ্রসঙ্গে সর্বাগ্রে উল্লেখের দাবি রাখে আচার্য শৌনক বিরচিত *বৃহদ্দেবতা* নামক প্রকরণগ্রন্থ। বৈদিক বা বেদনির্ভর গ্রন্থের মতো লৌকিক সংস্কৃত-সাহিত্যেও যে নির্বচন বা নির্বচন পদ্ধতির অবাধ বিচরণ বিদ্যমান তার অন্যতম দৃষ্টান্ত হল মহর্ষি ব্যাসদেব প্রণীত *মহাভারত* নামক মহাকাব্য। সমগ্র *বৃহদ্দেবতায়* প্রাপ্ত নির্বচন এবং *মহাভারতের* উদ্যোগ ও শান্তিপর্বে প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের নাম-নির্বচনসমূহ এই অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

৪.১. গ্রন্থপরিচয়

শৌনকাচার্যের একাধিক গ্রন্থকৃতির মধ্যে অন্যতম হল *বৃহদ্দেবতা* নামক গ্রন্থ। এটি আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। *ঋগ্বেদসংহিতা* গ্রন্থটির আকরস্বরূপ। দশটি মণ্ডলে সমন্বিত ঋগ্বেদের একশত একানব্বইটি সূক্তে দেবতা ও আখ্যান বর্ণনা গ্রন্থটির মূল বিবেচ্য বিষয়। প্রসঙ্গত সূক্তগুলির ঋষি ও তাঁদের বংশপরিচয় বর্ণনায় সমুজ্জ্বল হয়ে বিদ্যমান। প্রথম অধ্যায়ে দেবতাকে জানার মহত্ব, সূক্তের প্রকারভেদ, অগ্নির তিন রূপ, অগ্নি ও ইন্দ্রের সাথে সম্বদ্ধ দেবতাদের পরিচয় ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইন্দ্র, সূর্য, পর্জন্য, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি, বিষ্ণু ইত্যাদি দেবতাদের আলোচনায় সমৃদ্ধ। তৃতীয় অধ্যায়ে *ঋগ্বেদস্থিত* প্রথম মণ্ডলের ১৩-১২৬ সূক্তের দেবতা, চতুর্থ অধ্যায়ে পরিশিষ্ট সূক্ত, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ মণ্ডলের ৩২তম সূক্তের ঋষি, দেবতা ও তাঁদের বাহক বিষয়ে বর্ণনা উপস্থিত। পঞ্চম অধায়ে ৩৩তম সূক্ত থেকে সপ্তমমণ্ডলের ৪৯তম সূক্তের দেবতা, ঋষি ইত্যাদি বিষয় বর্তমান। ষষ্ঠ অধ্যায়ে সপ্তম মণ্ডলের ৫০তম সূক্ত থেকে দশম মণ্ডলের ১৭তম সূক্ত, সপ্তম অধ্যায়ে দশম মণ্ডলের ১৮তম সূক্তে দেবতা এবং অষ্টম অধায়ে ১৯১তম সূক্তের দেবতা ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে।

৪.১.১ *বৃহদ্দেবতায়* প্রাপ্ত নির্বচন সমূহের উৎসসন্ধান

আচার্য শৌনক বিরচিত *বৃহদ্দেবতা* নামক গ্রন্থটিতে প্রাপ্ত আঠাশটি শব্দের বত্রিশটি নির্বচন বিশ্লেষণপূর্বক উৎসসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাক-

অগ্নি

শৌনকাচার্য বিরচিত *বৃহদ্দেবতা* গ্রন্থে 'অগ্নি' শব্দের উৎপত্তির কারণস্বরূপ একাধিক নির্বচন প্রদর্শিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে বিদ্যমান নির্বচনটি হল-

> নীয়তেঽযং নৃভির্যস্মান্ নযত্যস্মাদসৌ চ তম্।
> তেনামৌ চক্রতুঃ কর্ম সনামানৌ পৃথক্ পৃথক্।।[১]

যেহেতু এটি (পার্থিবাগ্নি) মানুষের দ্বারা নীয়মান হয়, এটিই (দিব্য-অগ্নিরূপে) এই পৃথিবী থেকে মানুষকে নিয়ে যায়। অতএব সমান নামবিশিষ্ট এই দুই অগ্নি পৃথক পৃথক কর্ম করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে অগ্নির পাঁচ নামের উৎপত্তি বর্ণনাকালে প্রথমেই অগ্নি নামের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

জাতো যদগ্রে ভূতানাম্ অগ্রণীরধ্বরে চ যত্।
নাম্না সংনযতে বাঙ্গং স্তুতোঽগ্নিরিতি সূরিভিঃ।।[২]

যেহেতু ভূতসমুহের অগ্রে জাত হন এবং হিংসারহিত যজ্ঞে অগ্রণী হন। নিজের অঙ্গকে একীভূত করে নেয় অর্থাৎ নিকটস্থিত সব পদার্থকে নিজের অঙ্গে পরিণত করেন বা দাহ্য রূপে আত্মসাৎ করেন তাই দেবতাদের দ্বারা অগ্নি নামে অভিহিত হন।

উৎসসন্ধান

প্রথম নির্বচনে 'নীযতে' ও 'নযতি' এই দুই ক্রিয়াপদের উপস্থিতি থেকে অনুমান করা যায় 'অগ্নি' শব্দের উৎপত্তিতে *ণীঞ্ প্রাপণে* ধাতুর প্রাধান্য বিদ্যমান। প্রসঙ্গত 'অগ্নি' শব্দের শেষাংশ 'নি' এর সাথে √নী-ধাতুর বর্ণগত সাম্য বিদ্যমান।

দ্বিতীয় নির্বচনে 'অগ্রে জাত' অর্থাৎ 'অগ্রজ' শব্দের অ-কারের সাথে অগ্নির আদ্যংশ অকারের অক্ষরগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। অতএব এই শব্দ থেকে 'অগ্নি' শব্দের উৎপত্তি নিষ্পন্ন করা যায়। পুনরায় 'অগ্রণী' শব্দ থেকে অগ্নি শব্দের উৎপত্তির সংকেত পাওয়া যায়। তৃতীয়ত 'সংনযতে' এই ক্রিয়াপদ এবং 'অঙ্গ' শব্দ থেকে 'অঙ্গ' ও √নী-ধাতু প্রাপ্ত হয়ে অঙ্গ + √নী-ধাতু যুক্ত করে 'অগ্নি' শব্দ সিদ্ধ করা যায়।

অদিতি

শৌনকাচার্য 'অদিতি' শব্দের উৎপত্তির কারণস্বরূপ বলেছেন-

ন কুতশ্চন যদ্দীনো বৃত্বা তিষ্ঠতি মধ্যমঃ।
রাহূগণ ঋষিস্তেন প্রাহৈনং গোতমোঽদিতিম্।।[৩]

যেহেতু তিনি সংসারকে আবৃত করে মধ্যম স্থানে আবস্থান করেন এবং কোনো ভাবেই, কোনো দিকেই একটুও হীন বা ক্ষয় হননা। সেইজন্য রাহুগণ গোতম তাঁকে (ইন্দ্রকে) 'অদিতি' বলেছেন।

উৎসসন্ধান

নির্বচনটির বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় শব্দটির উৎপত্তির ক্ষেত্রে যেটি প্রবলভাবে সহায়ক তা হল- কোনো ভাবেই, কোনোদিকেই হীন বা ক্ষীণ না হওয়ায় 'অদিতি' এই নাম প্রাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ 'নঞ্'- পূর্বক √দী-ধাতুর (*দীঙ্ ক্ষযে,* দিবাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১১৩৪) উত্তর 'ক্তিন্' প্রত্যয় যুক্ত করে 'অদিতি' শব্দটি নিষ্পন্ন।

ইন্দ্র

বৃহদ্দেবতা গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইন্দ্রের ছাব্বিশটি নামের উৎপত্তি বর্ণনার সময় 'ইন্দ্র' নামের দুটি ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হয়েছে, সেগুলি যথা-

চতুর্বিধানাং ভূতানাং প্রাণো ভূত্বা ব্যবস্থিতঃ।
ঈষ্টে চৈবাস্য সর্বস্য তেনেন্দ্র ইতি স স্মৃতঃ।[৪]
ইরাং দৃণাতি যৎকালে মরুদ্ভিঃ সহিতোঽম্বরে।
রবেণ মহতা যুক্তঃ তেনেদ্রমৃষযোঽব্রুবন্।।[৫]

চার প্রকার ভূত অর্থাৎ জীবের ব্যবস্থিত প্রাণ হয়ে তিনি এই সবকিছু বা বিশ্বকে শাসন করেন সেইজন্য তাঁকে ইন্দ্র নামে স্মরণ করা হয়।

যেহেতু তিনি মরুতের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে যথাসময়ে ভীষন গর্জনের সাথে আকাশে জলকে প্রকট করেন তাই ঋষিগণ তাঁকে ইন্দ্র বলেন।

উৎসসন্ধান

'ইন্দ্র' শব্দের দুটি নির্বচন থেকে শব্দটির উৎস সম্পর্কে দুটি ভিন্ন উপায়ের সংকেত পাওয়া যায়। প্রথম নির্বচনে 'ঈষ্টে' এই ক্রিয়াপদের উপস্থিতি অনুসারে √ঈশ্-ধাতু (*ঈশ ঐশ্বর্যে*, অদাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১০২০) থেকে 'ইন্দ্র' শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে অনুমান করা যায়। √ঈশ্-ধাতুর ঈকার হ্রস্ব হয়ে 'ইন্দ্র' শব্দের আদ্যংশ ইকার প্রাপ্ত হয় এবং তা থেকেই শব্দটির উৎপত্তি সিদ্ধ হয়। দ্বিতীয় নির্বচনে 'ইরাং দৃণাতি' অংশ থেকে সংকেত পাওয়া যায় ইরা শব্দপূর্বক √দৃ-ধাতু (*√দৃ বিদারণে*, ক্র্যাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১৪৯৩) থেকে 'ইন্দ্র' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে (ইরা + √দৃ ধাতু > ইন্দ্র)।

উষা (উষস্)

দুই দিব্য দ্বার রাত্রি ও উষা (উষস্) সম্পর্কে বর্ণনাকালে আচার্য শৌনক *বৃহদ্দেবতা* নামক গ্রন্থে উষস্ বা উষা শব্দের ব্যুৎপত্তি করেছেন, সেটি হল-

> তম উচ্ছত্যুষা নক্তানক্তীমাং হিমবিন্দুভিঃ।
> অপি বাব্যক্তবর্ণেতি নঞ্পূর্বাঞ্চেরিদং ভবেত্।[৬]

উষা অন্ধকার দূর করে, হিমবিন্দু দ্বারা রাত্রিকে ব্যাপ্ত করে অথবা 'নঞ্' শব্দ পূর্বক √অঞ্চ্-ধাতু থেকে নিষ্পন্ন, যার অর্থ অব্যক্তবর্ণা।

উৎসসন্ধান

নির্বচনস্থিত ক্রিয়াপদগুলি থেকে 'উষা' শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে সহজেই অনুমান করা যায়। 'উচ্ছতি' ক্রিয়াপদের উপস্থিতি থেকে বলা যায়, √উচ্ছ্ ধাতু (*উচ্ছী বিবাসে*, তুদাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১২৯৫) থেকে 'উষা' শব্দ নিষ্পন্ন। 'অক্তি' ক্রিয়াপদ অবগত করে √অঞ্চ্ ধাতু থেকে শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে। এছাড়াও নির্বচনকারের স্পষ্ট উক্তি 'নঞ্' শব্দ পূর্বক √অঞ্চ্-ধাতু থেকে 'উষা' শব্দ নিষ্পন্ন।

কেশিন্

বৃহদ্দেবতায় একাধিক স্থানে 'কেশিন্' শব্দের নির্বচন করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের চুরানব্বইতম শ্লোকে পার্থিবাদি তিন অগ্নিকে 'কেশিন্' বা কেশী নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং তার কারণস্বরূপ বলা হয়েছে-

> অর্চিভিঃ কেশ্যযং ত্বগ্নির্বিদ্যুদ্ভিশ্চৈব মধ্যমঃ।
> অসৌ তু রশ্মিভিঃ কেশী তেনৈনানাহ কেশিনঃ।।[৭]

অর্থাৎ এই (পার্থিব) অগ্নি জ্বালারূপী এবং মধ্যমস্থান অর্থাৎ অন্তরিক্ষলোকে অবস্থিত বিদ্যুৎরূপী অগ্নি কেশ দ্বারা যুক্ত, দিব্য অগ্নি (দ্যুলোকস্থিত) রশ্মিময় কেশযুক্ত। অতএব কবিগণ এনাদের অর্থাৎ তিন অগ্নিকে 'কেশিনঃ' বলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সূর্যের 'সবিতৃ', 'ভগ' ইত্যাদি সাতটি নামের বর্ণনাকালে তাঁকে 'কেশিন্' নামে অভিহিত করা হয়েছে। সূর্যের 'কেশিন্' নামের হেতুস্বরূপ নির্বচনটি উত্থাপিত হয়েছে, সেটি হল-

> কৃত্বা সাযং পৃথগ্যাতি ভূতেভ্যস্তমসোঽত্যযে।

প্রকাশং কিরণৈঃ কুর্বংস্তেনৈনং কেশিনং বিদুঃ।[৮]

অর্থাৎ অল্পক্ষণের জন্য পৃথকরূপে নিবাসের পর অন্ধকারের প্রস্থানের সময় নিজ কিরণ দ্বারা সমস্ত ভূত অর্থাৎ জীবসমূহের জন্য প্রকাশ বা আলো উৎপন্ন করেন। এইজন্য ঋষিরা এনাকে বা সূর্যকে 'কেশিন্' বলে থাকেন।

উৎসসন্ধান

'কেশিন্' শব্দের উভয় নির্বচন বিশ্লেষণ থেকে জ্ঞাত হওয়া যায় কেশবিশিষ্ট বা কেশযুক্ত হিসাবে তিনপ্রকার অগ্নি বা দিব্যাগ্নি সূর্যকে 'কেশিন্' নামে অভিহিত করা হয়েছে। অতএব 'অত ইনি-ঠনৌ' (পাণিনীয়সূত্র ৫/২/১১৫) এই সূত্র দ্বারা 'কেশ' শব্দের সাথে অস্ত্যর্থে 'ইনি' প্রত্যয় যুক্ত করে 'কেশিন্' শব্দের উৎপত্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায় (কেশ+ইনি=কেশিন্)।

গৃৎসমদ

চতুর্থ অধ্যায়ে ইন্দ্র ও গৃৎসমদ ঋষির কাহিনী বর্ণনাকালে শৌনকাচার্য তাঁর এই নামের কারণ হিসাবে শব্দটির নির্বচন প্রদর্শন করেন। সেটি হল-

গৃণন্মাদযসে যস্মাত্ ত্বমস্মানৃষিসত্তম।
তস্মাদ্গৃৎসমদো নাম শৌনহোত্রো ভবিষ্যসি।।[৯]

অর্থাৎ হে শ্রেষ্ঠ ঋষি! তুমি নিজ স্তুতি দ্বারা যেহেতু আমাদের প্রসন্ন করেন তাই শুনহোত্রের পুত্র তুমি 'গৃৎসমদ নামে পরিচিত হবেন।

উৎসসন্ধান

প্রস্তুত শব্দের নির্বচনে প্রথমেই উল্লিখিত 'গৃণন্মাদযসে' অংশটি থেকে 'গৃৎসমদ' শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে অনুমান করা যায়। শব্দরূপ স্তুতি দ্বারা তৃপ্ত বা প্রসন্ন করেন বলে 'গৃৎসমদ' নাম প্রাপ্ত হয়। অতএব √গৃ-ধাতু (*গৃ শব্দে*, ক্র্যাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১৪৯৮) ও √মদ্ ধাতুর (*মদ তৃপ্তিযোগে*, চুরাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১৭০৫) সম্মিলিত প্রয়োগেই 'গৃৎসমদ' শব্দ নিষ্পন্ন করা হয়েছে (√গৃ-ধাতু + √মদ্-ধাতু > গৃৎসমদ)।

জাতবেদস্

আচার্য শৌনক তাঁর *বৃহদ্দেবতা* গ্রন্থে 'জাতবেদস্' শব্দের দ্বারা তিন প্রকার অগ্নির মধ্যে পার্থিবাগ্নি ও মধ্যলোকস্থিত অগ্নিকেই বুঝিয়েছেন এবং তাদের প্রকৃতি অনুসারেই শব্দটির নিরুক্তি প্রদর্শন করেছেন। 'জাতবেদস্' শব্দের একাধিক নির্বচন লক্ষ্য করা যায়। প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে-

যদ্বিদ্যতে হি জাতঃ সঞ্ জাতৈর্যদ্বাত্র বিদ্যতে।
তেনেমৌ তুল্যনামানৌ উভৌ লোকৌ সমাপ্নুতঃ।[১০]

যেটি (পার্থিবাগ্নি) জাত হওয়ার পরই জানা যায় অথবা যেটি (দিব্য অগ্নি) এখানে পৃথিবীলোকে জীবের দ্বারা জ্ঞাতব্য হয় বা জানা যায়। এইভাবে এই দুটিই সমান নামবিশিষ্ট অর্থাৎ জাতবেদস্ হয়ে পার্থিব ও দিব্য উভয় লোককে পৃথক পৃথক ভাবে ব্যাপ্ত করে আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রাপ্ত নির্বচনদুটি হল-

ভূতানি বেদ যজ্জাতো জাতবেদাথ কথ্যতে।
যচ্চৈষ জাতবিদ্যোঽভূদ্ বিত্তং জাতোঽধিবেত্তি বা।[১১]

বিদ্যতে সর্বভূতৈর্হি যদ্বা জাতঃ পুনঃ পুনঃ।
তেনৈষ মধ্যভাগেন্দ্রো জাতবেদা ইতি স্তুতঃ।[১২]

যেহেতু জন্ম নেওয়ার পর অগ্নি ভূতসমূহকে বা প্রাণিসমূহকে জানেন সেহেতু 'জাতবেদা' নামে কথিত হন। অথবা যে অগ্নি জাতবিদ্য অর্থাৎ যাতে বিদ্যার (বেদের) জন্ম হয় অথবা যেহেতু জন্ম নেওয়ার পর তা অধিবেত্তি হয় অথবা যেহেতু বার বার জন্ম গ্রহণ করায় প্রাণিরা তাঁকে জানতে পারে অতএব (মধ্যমস্থান ইন্দ্রের মতো) এই অগ্নির 'জাতবেদস্' নামে স্তুতি করা হয়।

উৎসসন্ধান

প্রথম অধ্যায়ে প্রদর্শিত নির্বচন অনুসারে 'জাত' শব্দের সাথে জ্ঞানার্থক √বিদ্-ধাতু যুক্ত হয়ে 'জাতবেদ' শব্দ উৎপন্ন হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথম নির্বচনে একাধিক উপায়ে পদটি নিষ্পত্তির সংকেত পাওয়া যায়, যেমন- 'জাত' শব্দের সাথে জ্ঞানার্থক √বিদ্-ধাতু যুক্ত হয়ে 'জাতবেদ' শব্দ নিষ্পন্ন করা যায়। 'জাতবিদ্য' শব্দ থেকে 'জাতবেদ' শব্দ এবং 'জাতবিত্ত' শব্দ থেকেও 'জাতবেদ' শব্দের উৎপত্তির অনুমান করা যায়। দ্বিতীয় নির্বচনেও 'জাত' শব্দের সাথে জ্ঞানার্থক √বিদ্-ধাতু যুক্ত হয়ে 'জাতবেদ' শব্দ ব্যুৎপন্ন হয়।

তনূনপাত্

শৌনকাচার্য রচিত *বৃহদ্দেবতা* গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে 'তনূনপাত্' শব্দের উৎপত্তি বর্ণিত হয়েছে, সেটি হল-

তনূনপাদযং ত্বেব নাম্না যচ্ছত্যসৌ তনুম্।
নপাদিতি প্রজামাহুরমুতাঽস্য চ সংভবম্।।[১৩]

এই অগ্নি কিন্তু 'তনূনপাত্' নামে পরিচিত, তিনি তনু অর্থাৎ নিজ শরীর প্রদান বা বিস্তার করেন। 'নপাত্' এর অর্থ বংশজ (পুত্র-পৌত্রাদি), অগ্নি থেকে তাঁর উৎপত্তি হয়- এরকম বলা হয়।

উৎসসন্ধান

প্রস্তুত শব্দের নির্বচনে দেখা যায় 'তনু' এবং 'নপাত্' এই দুই শব্দ যুক্ত হয়েই 'তনূনপাত্' শব্দ উৎপন্ন হয়েছে। অগ্নি যেহেতু তনু বিস্তার করে উৎপন্ন করেন তাই তিনি 'তনূনপাত্' নামে অভিহিত হন (তনু + নপাত্ = তনূনপাত্)।

ত্বষ্টা

আচার্য শৌনক তাঁর *বৃহদ্দেবতায়* তৃতীয় অধ্যায়ে দিব্য ত্বষ্ট বিষয়ে আলোচনাকালে 'ত্বষ্টা' শব্দের ব্যুৎপত্তি করেছেন, সেটি হল-

ত্বিষিতস্ত্বক্ষতের্বা স্যাত্ তৃর্ণমশ্নুত এব বা।
কর্মসূত্তারণো বেতি তেন নামৈতদশ্নুতে।।[১৪]

ত্বষ্টা √ত্বিষ্-ধাতু অথবা √ত্বক্ষ্-ধাতু থেকে ব্যুৎপন্ন হতে পারে অথবা তিনি শীঘ্রতাপূর্বক তা প্রাপ্ত করেন অথবা তিনি কর্ম দ্বারা সহায়তা প্রদান করেন অতএব এই নাম প্রাপ্ত হন।

উৎসসন্ধান

নির্বচনটির বিশ্লেষণ থেকে সহজেই জ্ঞাত হওয়া যায় নির্বচনকার স্বয়ং দুটি ক্রিয়াপদের দ্বারা প্রস্তুত শব্দটির উৎস সম্পর্কে অবগত করেছেন। তদনুসারে 'ত্বিষিতঃ' অর্থাৎ √ত্বিষ্-ধাতু (*ত্বিষ দীপ্তৌ*, ভ্বাদিগণ,

পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১০০১) থেকে এবং 'ত্বক্ষতেঃ' অর্থাৎ √ত্বক্ষ্-ধাতু (*ত্বক্ষূ তনূকরণে*, ভ্বাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ৬৫৬) থেকে 'ত্বষ্টা' শব্দের উৎপত্তির কথা বলেছেন। এছাড়াও 'তূর্ণমশ্নুত এব' এই নির্বচনাংশের দ্বারা 'তূর্ণ' শব্দের সাথে √অশ্-ধাতু (*অশূঙ্ ব্যাপ্তৌ*, স্বাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১২৬৪) যুক্ত করেও শব্দটির ব্যুৎপত্তি করা যায় (তূর্ণ-√অশ্-ধাতু > ত্বষ্টা)।

ধাতা

আচার্য শৌনক বিরচিত *বৃহদ্দেবতা* গ্রন্থ অনুসারে ইন্দ্রেরই আর এক নাম ধাতা। এই শব্দের নিরুক্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন-

> মাসেন সংভৃতং গর্ভং নবমেনাথ মাসিকম্।
> স্বযং ক্রন্দন্দধাত্যুর্ব্যাং ধাতেত্যৃগ্ভিঃ স গীযতে।।[১৫]

তারপর স্বয়ং গর্জন করতে করতে নবম মাসে গর্ভকে প্রকাশিত করে এক মাস পর্যন্ত পৃথিবীতে স্থাপন করেন। অতএব ঋগ্বেদের মন্ত্রের দ্বারা তিনি ধাতা এই নামে গীত হন।

উৎসসন্ধান

নিরুক্তিতে বিদ্যমান 'দধাতি' ক্রিয়াপদের অর্থ ধারণ বা স্থাপন করা। ইন্দ্র দেবতা ধারণ বা স্থাপনকর্তা হিসাবে 'ধাতা' নামে অভিহিত হন। দধাতি ক্রিয়াপদটি √ধা-ধাতু নিষ্পন্ন। অতএব বলা যায় 'ধাতা' শব্দটিও √ধা-ধাতু (*ডুধাঞ্ ধারণপোষণযোঃ*, জুহোত্যাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১০৯২) থেকেই উৎপন্ন হয়েছে।

নরাশংস

'নরাশংস' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গে আচার্য শৌনকের অভিমত হল-

> নরাশংসমিহৈকে তু অগ্নিমাহুরথেতরে।
> নরাঃ শংসন্তি সর্বেঽস্মিন্নাসীনা ইতি বাধ্বরে।।[১৬]

কেউ বলেন এখানে 'নরাশংস' বলতে অগ্নিকে বলা হয়েছে। পুনরায় কিছু লোক বলেন সকল মানুষ এখানে বা যজ্ঞে অবস্থান করে প্রশস্তি করেন (তাই নরাশংস এই নাম)।

উৎসসন্ধান

প্রস্তুত শব্দের নির্বচনের দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে নরাঃ অর্থাৎ সকল মানুষ শংসন্তি অর্থাৎ প্রশংসা করেন। অতএব এই অংশ থেকে অনুমান করা যায় গ্রন্থকার 'নর' শব্দের সাথে √শংস্-ধাতু (*শংসু স্তুতৌ*, ভ্বাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ৭২৮) যুক্ত করেই 'নরাশংস' শব্দের ব্যুৎপত্তি করেছেন।

পর্জন্য

শৌনকাচার্য রচিত গ্রন্থটিতে দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'পর্জন্য' শব্দের নির্বচন করা হয়েছে। 'পর্জন্য' শব্দের নিরুক্তিতে ইন্দ্র দেবতার পর্জন্যত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেটি হল-

> যদিমাং প্রার্জযত্যেকো রসেনাম্বরজেন গাম্।
> কালেঽত্রিরৌর্বশশ্চর্ষী তেন পর্জন্যমাহতুঃ।।[১৭]
> তর্পযত্যেষ যল্লোকাঞ্জন্যো জনহিতশ্চ যত্।
> পরো জেতা জনযিতা যদ্বাগ্নেযস্ততো জগৌ।।[১৮]

অর্থাৎ যেহেতু এই পৃথিবীকে যথাসময়ে আকাশে উৎপন্ন আর্দ্রতা প্রদান করে অতএব ঋষি অত্রি তথা উর্বশী-পুত্র ঔর্বশ (বসিষ্ঠ) তাঁকে পর্জন্য বলে থাকেন। এছাড়াও পরের শ্লোকটিতেও বলা হয়েছে-

যেহেতু তিনি লোকসমূহের প্রসন্নতা প্রদান করেন এবং যেহেতু তিনি জনগনের হিতৈষী অথবা যেহেতু তিনি বিজেতা বা জনয়িতা অতএব আগ্নেয় (কুমার বা বসিষ্ঠ) তাঁকে (পর্জন্য রূপে) স্তুতি করেন।

উৎসসন্ধান

প্রথম নির্বচনে 'প্রার্জয়তি' ক্রিয়াপদ থেকে অনুমান করা যায় 'প্র' এই উপসর্গপূর্বক √অর্জ্-ধাতুর সাথে 'যক্' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'পর্জন্য' শব্দ সিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে (প্র–√অর্জ্-ধাতু + যক্ = পর্জন্য)।

দ্বিতীয় নির্বচন অনুসারে একাধিক উপায়ে 'পর্জন্য' শব্দটি সিদ্ধ করা যায়। 'তর্পয়তি জন্যঃ' এই বাক্যাংশ পর্জন্য শব্দের উৎপত্তির সহায়করূপে পরিচয় পাওয়া যায়। 'তর্পয়তি' ক্রিয়াপদটি √তৃপ্-ধাতু নিষ্পন্ন। এটি বর্ণবিপর্যয়ের দ্বারা পৃত্ করে √জন্ ধাতুর উত্তর 'যক্' প্রত্যয় যুক্ত করে 'পর্জন্য' শব্দটি নিষ্পন্ন করা যায় (তৃপ্ > পৃত্ + √জন্-ধাতু + যক্ = পর্জন্য)। 'পরো জেতা' ও 'পরো জনযিতা' শব্দজোড় থেকেও যথাক্রমে 'পর' পূর্বক- √জি-ধাতু + 'যক্' প্রত্যয় যোগে (পর– *জি জয়ে* ধাতু + যক্ = পর্জন্য) এবং 'পর' শব্দ পূর্বক - √জন্-ধাতুর সাথে 'যক্' প্রত্যয় যোগে 'পর্জন্য' শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে অনুমান করা যায় (পর – √জন্ ধাতু + যক্ = পর্জন্য)।

পবমান

অগ্নিদেবতার পাঁচ নামের উৎপত্তি বিশ্লেষণের সময় 'পবমান' শব্দ দ্বারা তাঁকে বিশেষিত করে শব্দটির ব্যুৎপত্তি করা হয়েছে, সেটি হল-

> পুনাতি যদিদং বিশ্বম্ এবাগ্নিঃ পার্থিবোঽথ চ।
> বৈখানসর্ষিভিস্তেন পবমান ইতি স্তুতঃ।।[১৯]

(অর্থাৎ) যেহেতু এই পার্থিব অগ্নিই বিশ্বকে পবিত্র করে অতএব ঋষি বৈখানস পবমান নামে তাঁর স্তুতি করেন।

উৎসসন্ধান

নির্বচনটির বিশ্লেষণ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, অগ্নির পবমান এই নামের হেতু 'পুনাতি' ক্রিয়াপদটি। অতএব √পূ-ধাতু (*পূঞ্ পবনে*, ক্র্যাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১৪৮২) থেকেই 'পবমান' শব্দের উৎপত্তি।

পূষা

সূর্যদেবতার নামান্তর হল পূষা বা পূষন্। শৌনকাচার্যের মতে 'পূষা' শব্দের নামকরণের হেতু হল-

> পুষ্যন্ ক্ষিতিং পোষযতি প্রণুদন্ রশ্মিভিস্তমঃ।
> তেনৈনমস্তৌৎপূষেতি ভরদ্বাজস্তু পঞ্চভিঃ।।[২০]

পোষণ করতে করতে, রশ্মি দ্বারা অন্ধকার দূর করতে করতে, তিনি পৃথিবীর পুষ্টিসাধন করেন, অতএব ভরদ্বাজ ঋষি তাঁর পাঁচটি সূক্তে 'পূষণ্' নামে সূর্যের স্তুতি করেন।

উৎসসন্ধান

'পোষযতি' ক্রিয়াপদটি 'পূষা' শব্দের উৎপত্তির বিশেষ সহায়ক হিসাবে গণ্য করা যায়। পোষণক্রিয়ার জন্যই সূর্যকে 'পূষা' নামে অভিহিত করা হয়। অতএব জ্ঞাত হওয়া যায় √পুষ্-ধাতু (*পুষ পুষ্টৌ*, দিবাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১১৮২) থেকেই 'পূষা' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

বৃহস্পতি

'বৃহস্পতি' ইন্দ্রেরই অপর নাম। ইন্দ্র দেবতাকে 'বৃহস্পতি' কেন বলা হয়, তার উত্তরস্বরূপ বলা হয়েছে-

> বৃহন্তৌ পাতি যল্লোকাবেষ দ্বৌ মধ্যমোত্তমৌ।
> বৃহতা কর্মণা তেন বৃহস্পতিরিতীলিতঃ।।[২১]

যেহেতু মধ্যম ও উত্তম এই দুই বৃহৎ লোক তিনি রক্ষা করেন, তাই তাঁর এই বৃহৎ কর্মের জন্য তাঁকে (ইন্দ্রকে) 'বৃহস্পতি' এই নামে স্তুতি করা হয়।

উৎসসন্ধান

বৃহত্ দুই লোক রক্ষা করেন তাই তাঁর নাম 'বৃহস্পতি'। অতএব 'বৃহত্' শব্দপূর্বক রক্ষণার্থক √পা-ধাতু (*পা রক্ষণে*, অদাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১০৫৬) থেকে 'বৃহস্পতি' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে (বৃহত্ + √পা-ধাতু > বৃহস্পতি)।

ব্রহ্মণস্পতি

উক্ত গ্রন্থে 'ব্রহ্মণস্পতি' শব্দ দ্বারা ইন্দ্র দেবতা দ্যোতিত হয়েছেন। 'ব্রহ্মণস্পতি' শব্দের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

> ব্রহ্ম বাগ্ ব্রহ্ম সত্যং চ ব্রহ্ম সর্বমিদং জগৎ।
> পাতারং ব্রহ্মণস্তেন শৌনহোত্র স্তবঞ্জগৌ।।[২২]

অর্থাৎ বাক্ ব্রহ্ম, সত্য ব্রহ্ম, দৃশ্যমান সমগ্র জগৎ ব্রহ্ম। অতএব স্তুতি করার সময় শৌনহোত্র (গৃৎসমদ) ঋষি ব্রহ্মরূপী এই সবের রক্ষক হিসাবে 'ব্রহ্মণস্পতি' বলেছেন।

উৎসসন্ধান

নির্বচনটি বিশ্লেষণ দ্বারা অনুমান করা যায় যে, আচার্য শৌনক 'ব্রহ্ম' শব্দ রক্ষণার্থক √পা ধাতুর (*পা রক্ষণে*, অদাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১০৫৬) সাথে যুক্ত করে ব্রহ্মণস্পতি শব্দটি সিদ্ধ করেছেন (ব্রহ্ম + √পা-ধাতু > ব্রহ্মণস্পতি)।

মান্য

অগস্ত্য ও বসিষ্ঠের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনাকালে ঋষি অগস্ত্যকে 'মান্য' বলা হয়েছে। তাঁর এই মান্য নামের হেতু স্বরূপ *বৃহদ্দেবতায়* বলা হয়েছে-

> মানেন সংমিতো যস্মাত্ তস্মান্মান্য ইহোচ্যতে।
> যদ্বা কুম্ভাদৃষির্জাতঃ কুম্ভেনাপি হি মীয়তে।।[২৩]

অর্থাৎ, যেহেতু এক মানের দ্বারা সীমিত করা হয় বলে ইহলোকে তাঁর (অগস্ত্য-মুনি) নাম মান্য অথবা কুম্ভ থেকে যেহেতু এই ঋষি জাত হন, কুম্ভের দ্বারা মাপা হয় বা পরিমিত হন তাই মান্য এই নাম প্রাপ্ত হন।

উৎসসন্ধান

প্রস্তুত শব্দের নিরুক্তির দ্বারা শব্দটির উৎসের সংকেত পাওয়া যায়। মানের দ্বারা সীমিত বা পরিমিত হন তাই অগস্ত্য ঋষিকে 'মান্য' বলা হয়। অতএব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, √মাঙ্ মানে ধাতু (*মাঙ্ মানে,* দিবাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১১৪২) থেকেই 'মান্য' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

মৃত্যু

ইন্দ্রদেবকে 'মৃত্যু' নামেও অভিহিত করা হয়েছে। তাঁর এই নামকরণের কারণ হিসাবে শৌনকাচার্য বলেছেন-

> যত্তু প্রচ্যাবযন্নেতি ঘোষেণ মহতা মৃতম্।
> তেন মৃত্যুমিমং সন্তং স্তৌতি মৃত্যুরিতি স্বযম্।।[২৪]

যেহেতু অত্যন্ত গর্জন করতে করতে তিনি মৃতদেহকে প্রকৃষ্টরূপে নিয়ে যান অতএব সংকুসুক নামক যমের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র সূর্য থেকে অন্ধকার হটিয়ে এবং উষাকে প্রকট করে স্বযং মৃত্যুরূপে তাঁর স্তুতি করেন।

উৎসসন্ধান

নিরুক্তিতে বর্তমান মৃতম্ ও প্রচ্যাবযন্ শব্দদুটি থেকে মৃত্যু শব্দটি ব্যুৎপন্ন করা যায়। ইন্দ্রদেবতা মৃতদেহকে নিয়ে যাওয়ায় তাঁর নাম মৃত্যু। 'প্রচ্যাবযন্' শব্দটি √চ্যু-ধাতু (*চ্যুঙ্ গতৌ)* থেকে জাত। অতএব 'মৃত' শব্দের আদ্যংশ √মৃ এবং √চ্যু যুক্ত করা 'মৃচ্যু' শব্দ পাওয়া যায় এবং চকার তকারে পরিণত হয়ে 'মৃত্যু' শব্দ গঠিত হয়।

যম

'যম' শব্দের যমত্ব প্রতিপাদনস্বরূপ *বৃহদ্দেবতা* নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে-

> ইহ প্রজাঃ প্রযচ্ছন্স সংগৃহীত্বা প্রযাতি চ।
> ঋষির্বিবস্বতঃ পুত্রং তেনাহৈনং যমো যমম্।।[২৫]

অর্থাৎ তিনি ইহলোকে প্রজা অর্থাৎ সন্তান প্রদান করেন এবং তাদের একত্র করে অন্যলোকে বা প্রকৃষ্টরূপে গমন করেন। তাই যম নামক ঋষি তাঁকে বিবস্বতের পুত্রকে 'যম' এই আখ্যা দিয়েছেন।

উৎসসন্ধান

নির্বচনস্থিত 'প্রযচ্ছন্' ক্রিয়াপদের মধ্যে যম্ ধাতুর অস্তিত্ব বিদ্যমান। অতএব √যম্ ধাতু থেকে 'যম' শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে সংকেত পাওয়া যায় (*যম উপরমে,* ভ্বাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ৯৮৪) এবং 'প্রযাতি' ক্রিয়াপদে বর্তমান √যা-ধাতু (*যা প্রাপণে,* অদাদিগণ, ১০৪৯) থেকে 'যম' শব্দের উৎপত্তির অনুমান করা যায়।

রুদ্র

আচার্য শৌনক ইন্দ্রের যে ছাব্বিশটি নামের বর্ণনা করেছেন, 'রুদ্র' সেগুলির মধ্যে একটি অন্যতম নাম। ইন্দ্রকে 'রুদ্র' বলার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে-

> অরোদীদন্তরিক্ষে যদ্ বিদ্যুদ্বৃষ্টিং দদন্নৃণাম্।
> চতুর্ভিররৃষিভিস্তেন রুদ্র ইত্যভিসংস্তত।।[২৬]

যেহেতু তিনি (ইন্দ্র) অন্তরিক্ষে গর্জন করতে করতে মানুষের জন্য বিদ্যুৎসহ বৃষ্টি সৃষ্টি করেন তাই চারজন (কণ্ব, কুৎস, গৃৎসমদ্ ও বসিষ্ঠ) ঋষির দ্বারা তিনি রুদ্র এই অভিধায় অত্যধিক স্তুত হন।

উৎসসন্ধান

নির্বচনে বিদ্যমান 'অরোদীত্' এই ক্রিয়াপদের উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায় শব্দার্থক √রু-ধাতু থেকে 'রুদ্র' এই শব্দের উৎপত্তি দ্যোতিত হয়েছে।

বনস্পতি

'বনস্পতি' শব্দের বনস্পতিত্ব প্রতিষ্ঠাস্বরূপ *বৃহদ্দেবতা*কার বলেছেন-

> বনস্পতিং তু যং প্রাহুরযং সোঽগ্নির্বনস্পতিঃ।
> অযং বনানাং হি পতিঃ পাতা পালযতীতি বা।।[২৭]

'বনস্পতি' শব্দের দ্বারা যিনি অভিহিত হন সেই অগ্নিই এই 'বনস্পতি'। ইনি বা এই অগ্নি রক্ষক হিসাবে বনসমূহের পতি অথবা বনসমূহ পালন করেন তাই 'বনস্পতি'।

উৎসসন্ধান

শৌনকাচার্যকৃত নির্বচন অনুযায়ী বনস্পতি শব্দ একাধিক উপায়ে নিষ্পন্ন হয়। যেমন- 'বন' ও 'পতি' এই দুই সুবন্ত পদ যুক্ত হয়ে 'বনস্পতি' শব্দ উৎপন্ন হয় (বন + পতি = বনস্পতি)। 'বন' শব্দের সাথে যথাক্রমে √পা-ধাতু (*পা রক্ষণে*, অদাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১০৫৬) ও √পাল্ (*পাল রক্ষণে*, চুরাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১৬০৯) ধাতু যুক্ত করেও তিনি 'বনস্পতি' শব্দটির উৎপত্তি বর্ণনা করেছেন (বন + √পা-ধাতু > বনস্পতি, বন + √পাল্ ধাতু > বনস্পতি)।

বরুণ

বৃহদ্দেবতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইন্দ্রের নামসমূহের উৎপত্তি আলোচনাকালে ইন্দ্র 'বরুণ' হিসাবেও বর্ণিত হয়েছেন। ইন্দ্রের বরুণত্ব প্রতিষ্ঠাস্বরূপ বলা হয়েছে-

> ত্রীণীমান্যাবৃণোত্যেকো মূর্তেন তু রসেন যত্।
> তযৈনং বরুণং শক্ত্যা স্তুতিষ্বাহুঃ কৃপণ্যবঃ।[২৮]

যেহেতু তিনি একাই স্থূল আর্দ্রতা বা রসের দ্বারা পৃথিব্যাদি তিন লোককে আবৃত করে আছেন অতএব তাঁর এই কর্মের জন্যই ঋষিগণ তাঁকে (ইন্দ্রকে) স্তুতিকালে বরুণ নামে অভিহিত করেন।

উৎসসন্ধান

নিরুক্তিতে বিদ্যমান 'আবৃণোতি' ক্রিয়াপদের অর্থ আবরণ সৃষ্টি করা। যেহেতু লোকত্রয়কে আবৃত করেন তাই বলা যায় আবরণার্থক √বৃ-ধাতু থেকে 'বরুণ' শব্দের নিষ্পত্তির চেষ্টা করেছেন গ্রন্থকার।

বসিষ্ঠ

ঋষিবাচক বসিষ্ঠ এই নাম উৎপত্তির কারন বর্ণনাস্বরূপ *বৃহদ্দেবতা* নামক গ্রন্থে আচার্য শৌনক বলেছেন-

> নামাস্য গুণতো জজ্ঞে বসতেঃ শ্রৈষ্ঠ্যকর্মণঃ।
> অদৃশ্যমৃষিভির্হীন্দ্রং সোঽপশ্যত্তপসা পুরা।।[২৯]

এনার নাম গুনের আধারে শ্রেষ্ঠ কর্মের উৎপাদনকারী √বস্-ধাতু থেকে উৎপন্ন হয় কারন পুরাকালে তিনি তপস্যার দ্বারা অন্য ঋষিদের দ্বারা অদৃশ্য ইন্দ্রের দর্শন পেয়েছিলেন।

উৎসসন্ধান

নির্বচনকার 'বসতেঃ' ক্রিয়াপদ থেকে 'বসিষ্ঠ' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করেছেন। অতএব বলা যায় উক্ত নির্বচনে √বস্-ধাতু থেকে 'বসিষ্ঠ' শব্দের উৎপত্তি সিদ্ধ হয়।

বাচস্পতি

'বাচস্পতি' শব্দের উৎপত্তি প্রসঙ্গে *বৃহদ্দেবতা*কার শৌনকাচার্য বলেছেন-

> বাচা বেদা হ্যধীযন্তে বাচা ছন্দাংসি তত্র হ।
> অথো বাক্ সর্বমেবেদং তেন বাচস্পতি স্তুতঃ।।[৩০]

অর্থাৎ বাক্-এর দ্বারা বেদসমূহ, ছন্দোসমূহ অধ্যয়ন করা হয়। যেহেতু বাক্ বা বাণীই এই বিশ্ব অতএব বাণীর অধিপতি বা বাচস্পতিরূপে তিনি (ইন্দ্র) স্তুত হন।

উৎসসন্ধান

'বাচস্পতি' শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী অনুমান করা যায়, 'বাচঃ পতি বাচস্পতি' এইরূপ বিগ্রহ দ্বারা শব্দটি সিদ্ধ হয়।

বায়ু

ইন্দ্রের নামসমূহ আলোচনাকালে প্রথমেই 'বায়ু' শব্দের নিরুক্তি প্রদর্শিত হয়েছে। 'বায়ু' শব্দের উৎপত্তির কারণ হিসাবে বলা হয়েছে-

> অণিষ্ঠ এষ যত্তু ত্রীন্ ব্যাপ্যৈকো ব্যোম্নি তিষ্ঠতি।
> তেনৈনমৃষযোঽর্চন্তঃ কর্মণা বাযুমব্রুবন্।।[৩১]

পরন্তু তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মরূপে লোকত্রয়কে ব্যাপ্ত করে বায়ুমণ্ডলরূপে প্রতিষ্ঠিত, অতএব কর্মের দৃষ্টিতে তাঁকে অর্চনাকারী ঋষিরা 'বায়ু' নামে অভিহিত করেন।

উৎসসন্ধান

ব্যাপ্তকারী বা গমনকারী হিসাবে ইন্দ্রদেবকে বায়ু নামে অভিহিত করা হয়েছে। অতএব বা-ধাতু থেকেই বায়ু শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। ব্যাকরণ অনুসারে 'বায়ু' শব্দটি 'কৃবাপাজিমিস্বদিসাধ্যশূভ্য উণ্' (উণাদিসূত্র ১/১) সূত্র দ্বারা √বা-ধাতুর (*বা গতি গন্ধনয়োঃ* ধাতু, অদাদিগণ পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১০৫০) সাথে 'উণ্' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে উৎপন্ন হয় (√বা-ধাতু + উণ্ প্রত্যয় = বায়ু)। এখানেও শব্দটি তদনুসারেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিশ্বকর্মন্

আচার্য শৌনক বিরচিত *বৃহদ্দেবতা* গ্রন্থে দেখা যায় ইন্দ্র দেবতারই আর এক নাম 'বিশ্বকর্মন্'। তাঁর এই নামকরণের কারণ হিসাবে যা বলা হয়েছে তা হল-

> নিদাঘমাসাতিগমে যদৃতেনাবতি ক্ষিতিম্ ।
> বিশ্বস্য জনযন্কর্ম বিশ্বকর্মৈষ তেন সঃ।।[৩২]

যেহেতু গ্রীষ্মকালীন মাসসমূহ অতিক্রান্ত হলে পৃথিবীকে জল দ্বারা তৃপ্ত করে এবং সকল বস্তুতে ক্রিয়াশীলতা উৎপন্ন করে অতএব তাঁকে বিশ্বকর্মন্ বলা হয়।

উৎসসন্ধান

নিরুক্তিটির পর্যালোচনার দ্বারা অনুমান করা যায় যে, 'বিশ্ব' শব্দপূর্বক √কৃ-ধাতু (*ডু কৃঞ্ করণে,* তনাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১৪৭২) থেকে 'বিশ্বকর্মা' বা 'বিশ্বকর্মন্' পদটি সিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিশ্বানর

বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে সূর্যের নামসমূহের মধ্যে 'বিশ্বানর' শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে এবং বিশ্বানরের বিশ্বানরত্ব প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

> সংপ্রত্যেকৈকশস্ত্বেনং যন্মন্যন্তে পৃথঙ্নরাঃ।
> বিশ্বে বিশ্বানরস্তেন কর্মণা স্তুতিষু স্তুতঃ।।[৩৩]

অর্থাৎ ইদানীং সকল মনুষ্য নিজ নিজ মত অনুসারে যেহেতু তাঁকে পৃথক মনে করেন তাই তাঁর এই পৃথকভাবে অবস্থানরূপ কর্মের দ্বারা তিনি 'বিশ্বানর' নামে স্তুত হন।

উৎসসন্ধান

'বিশ্বানর' শব্দের ব্যুৎপত্তি থেকে অনুমান করা যায় 'বিশ্ব' ও 'নর' শব্দ √মন্-ধাতুর (*মন জ্ঞানে,* দিবাদিগণ, ১১৭৬) সাথে যুক্ত হয়ে 'বিশ্বানর' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে (বিশ্ব + নর + √মন্-ধাতু = বিশ্বানর)।

বিষ্ণু

বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে বিষ্ণু এই নামটি সূর্যেরই নামান্তর হসাবে দেখান হয়েছে এবং সূর্য অর্থেই শব্দটির ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হয়েছে। ব্যুৎপত্তিটি হল-

> বিষ্ণোতের্বিশতের্বা স্যাদ্ বেবেষ্টের্ব্যাপ্তিকর্মণঃ।
> বিষ্ণুর্নিরুচ্যতে সূর্যঃ সর্বং সর্বান্তরশ্চ যঃ।।[৩৪]

ব্যাপ্তিবোধক 'বিষ্ণু' এই শব্দ √বিষ্-ধাতু অথবা √বিশ্-ধাতু অথবা √বিষ্ল্৯-ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে, যিনি সূর্য বাহ্যাভ্যন্তর সহ সকল পদার্থেই ব্যাপ্ত।

উৎসসন্ধান

গ্রন্থকার বিষ্ণু শব্দের ব্যুৎপত্তিতে শব্দটির উৎস হিসাবে 'বিষ্ণোতের্বিশতেঃ' 'বেবেষ্টেঃ' ইত্যাদি ক্রিয়াপদের উল্লেখ করেছেন, যা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে 'বিষ্ণু' শব্দটি যথাক্রমে √বিষ্-ধাতু অথবা √বিশ্-ধাতু অথবা 'বিষ্লৃ ব্যাপ্তৌ' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে।

বেন

বৃহদ্দেবতা গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে শৌনকাচার্য 'বেন' শব্দের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বলেছেন-

> প্রাণভূতস্তু ভূতেষু যদ্বেনত্যেষু তিষ্ঠতি।
> তেনৈনং বেনমাহর্ষির্বেনো নামেহ ভার্গবঃ।।[৩৫]

ভূতসমূহের প্রাণস্বরূপ তিনি যেহেতু ভূতসমূহেই গতিশীল হন তাই বেন ভার্গব নামক ঋষি তাঁকে বেন নামে অভিহিত করেন।

উৎসসন্ধান

'বেন' শব্দের নির্বচনে 'বেনতি' ক্রিয়াপদ বিদ্যমান, যার অর্থ গতিশীল হওয়া। 'বেনতি' ক্রিয়াপদটি √বেণ্-ধাতু নিষ্পন্ন। অতএব অনুমান করা যায় √বেণ্-ধাতু (*বেণৃ গতিজ্ঞানচিন্তানিশামনবাদিত্রগ্রহণেষু,* ভ্বাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ৮৭৭) থেকেই 'বেন' শব্দটি ব্যুৎপন্ন হয়েছে।

সরস্বত্ ও সরস্বতী

ইন্দ্রদেবের ছাব্বিশটি নামের মধ্যে একটি অন্যতম নাম হল 'সরস্বত্'। বৃহদ্দেবতাকার এই শব্দের নিরুক্তিস্বরূপ বলেছেন-

> সরাংসি ঘৃতবন্ত্যস্য সন্তি লোকেষু যৎত্রিষু।
> সরস্বন্তমিতি প্রাহ বাচং প্রাহুঃ সরস্বতীম্।।[৩৬]

যেহেতু তিন লোকের ঘৃত দ্বারা পূর্ণ সরোবরসমূহ তাঁর নিকটে বিদ্যমান সেইজন্য ঋষিগণ তাঁকে (ইন্দ্রকে) সরস্বত্ ও বাক্-কে সরস্বতী বলে থাকেন।

উৎসসন্ধান

নির্বচন অনুসারে 'সরস্বত্' ও 'সরস্বতী' শব্দের উৎপত্তিতে 'সরস্' শব্দের বিশেষ ভূমিকা বিদ্যমান। 'সরস্' শব্দের সাথে 'মতুপ্' প্রত্যয় যুক্ত করে 'সরস্বত্' শব্দ ব্যুৎপন্ন করা যায় এবং 'সরস্' শব্দের সাথে 'মতুপ্' প্রত্যয় যুক্ত করে স্ত্রীলিঙ্গে 'ঙীষ্' প্রত্যয় দ্বারা 'সরস্বতী' শব্দ নিষ্পন্ন করা যায়।

সবিতা

'সবিতা' ও 'ভগ' শব্দের দ্বারা সূর্য দ্যোতিত হন। সূর্য দেবতার 'সবিতা' নামের হেতুরূপে *বৃহদ্দেবতা*কার বলেছেন-

> দিবাকরং প্রসৌত্যেকঃ সবিতা তেন কর্মণা।[৩৭]

যেহেতু নিজ রশ্মি দ্বারা এই লোকসমূহকে প্রসব করেন বা ঐশ্বর্যবান্ করেন, এই কর্মের দ্বারা দিবাকর সবিতা নামে অভিহিত হন।

উৎসসন্ধান

'সবিতা' শব্দের নিরুক্তিতে উল্লিখিত 'প্রসৌতি' ক্রিয়াপদটি 'প্র' এই উপসর্গপূর্বক *ষু প্রসবৈশ্বর্যয়োঃ* ধাতুর প্রথম পুরুষ একবচনের রূপ। 'প্রসৌতি' ক্রিয়াপদের দ্বারাই 'সবিতা' শব্দের নির্বচন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতএব বলা যায় √সু-ধাতু থেকেই 'সবিতা' শব্দটি নিষ্পন্ন করা হয়েছে।

৪.১.২. উপসংহার

আদ্যন্ত বিচারপূর্বক দেখা যায়, শৌনকাচার্য দ্বারা প্রদর্শিত নিরুক্তিতে *নিরুক্ত*কার আচার্য যাস্কের প্রভাব সুস্পষ্ট। অধিকাংশ শব্দের নির্বচন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যাস্কাচার্য যে উপায়ে বা যে ধাতু বা শব্দ দ্বারা ব্যুৎপত্তি করেছেন *বৃহদ্দেবতা* গ্রন্থকার সেই ধাতু বা শব্দ অনুকরণ করেছেন, তবে সর্বত্র তা নয়, তিনি *নিরুক্ত*কারের মত যেমন উল্লেখ করেছেন তেমনি বিকল্প উপায়স্বরূপ স্ব-চিন্তনেরও বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন (যেমন ইন্দ্র-শব্দ)। এছাড়াও ব্যাকরণগত সংস্কার অনুসারেও তিনি শব্দের নিরুক্তি করেছেন (যেমন- বরুণ)।

৪.২. *মহাভারতে* (উদ্যোগপর্ব ও শান্তিপর্ব) প্রাপ্ত নির্বচন

৪.২.১. গ্রন্থপরিচয়

ভারতীয় লৌকিকসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ হল কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব রচিত *মহাভারত* নামক আর্ষ-মহাকাব্য। গ্রন্থটি আঠারোটি পর্বে বিন্যস্ত, সেগুলি যথা- আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, শল্য, কর্ণ, সৌপ্তিক, স্ত্রী, শান্তি, অনুশাসন, আশ্বমেধিক, আশ্রমবাসিক, মৌষল, মহাপ্রাস্থানিক এবং স্বর্গারোহণ। কৌরব ও পাণ্ডবদের বিরোধ, শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় অষ্টাদশ দিন যাবৎ মহাযুদ্ধের অবসানে ন্যায়পরায়ণ পান্ডবদের জয়লাভ মূল বিবেচ্য বিষয় হলেও এর আশ্রয়ে অসংখ্য কাহিনী, উপাখ্যান, নীতিমূলক উপদেশ ও অনুশাসন, ধর্মনীতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সমস্ত তত্ত্ব একত্রিত হয়ে এক সামগ্রিক সাহিত্যের রূপ লাভ করেছে। এই মহাকাব্যের অন্তর্গত উদ্যোগ ও শান্তিপর্বে বর্ণিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামের নির্বচনগুলিই আলোচ্য অধ্যায়ে পর্যালোচনার আকর হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।

৪.২.১.১. যাস্কীয় নির্বচনপদ্ধতি অনুসারে নির্বচনসমূহের বিশ্লেষণ

*মহাভারতে*র উদ্যোগপর্বে ও শান্তিপর্বে বিভিন্ন কাহিনীর বর্ণনাবসরে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন নামের ব্যুৎপত্তি লক্ষ্য করা যায়। উদ্যোগপর্বে ধৃতরাষ্ট্র শ্রীকৃষ্ণের নাম ও কর্মের অভিপ্রায়ের জ্ঞাতা সঞ্জয়কে পুরুষোত্তম ভগবান সম্পর্কে বর্ণনা করতে বললে বলেন, তিনি ভগবান বাসুদেবের মঙ্গলময় নামের ব্যুৎপত্তি শুনেছেন, তবে যতটুকু তাঁর স্মরণে আছে তিনি ততটুকুই বলবেন কারণ ভগবান কেশব অপ্রমেয়। সারথি সঞ্জয়কর্তৃক বর্ণিত নির্বচন এবং শান্তিপর্বে ভগবান স্বয়ং নিজের যে নাম-নির্বচন বর্ণনা করেছেন সেগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যাক-

অচ্যুত

মহাভারত-স্থিত শান্তিপর্বে শ্রীকৃষ্ণ নিজ 'নাম-নির্বচন' বর্ণনাকালে 'অচ্যুত' নামের নিরুক্তিস্বরূপ বলেছেন-

> নির্বাণং পরমং ব্রহ্ম ধর্মোঽসৌ পর উচ্যতে।
> তস্মান্ন চ্যুতপূর্বোঽহমচ্যুতস্তেন কর্মণা।।[৩৮]

পরব্রহ্ম নিত্যমুক্ত, ধর্মকেই পরব্রহ্ম বলা হয়, আমি পূর্বে সেই ধর্ম থেকে বিচ্যুত হইনি বলে 'অচ্যুত' নাম ধারণ করি।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম থেকে চ্যুত না হওয়ায় তিনি 'অচ্যুত' নামে পরিচিত হন অর্থাৎ নঞ্-পূর্বক √চ্যু-ধাতুর (*চ্যুঙ্ গতৌ*, ভ্বাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ৮৫৫) সাথে 'ক্ত'-প্রত্যয় যুক্ত করে শব্দটি গঠিত হয়। অতএব 'অচ্যুত' শব্দটি ব্যাকরণ অনুসারেই নির্বচন করায় অনুমান করা যায় এটি যাস্কীয় প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতিরই প্রকৃষ্ট উদাহরণস্বরূপ।

অজ

মহাভারত নামক মহাকাব্যের উদ্যোগপর্বে সঞ্জয় কর্তৃক প্রদর্শিত পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের 'অজ' নামের নির্বচনটি হল-

> ন জায়তে জনিত্রাযমজঃ।[৩৯]

কোনো জন্মদাতার দ্বারা জাত হননি তাই তিনি 'অজ'।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 'অজ' নামের কারণ হিসাবে নির্বচনে স্পষ্টই বলা হয়েছে 'ন জাযতে' এই শব্দদ্বয়, যার অর্থ জাত বা উৎপন্ন বা সৃষ্ট হননি অর্থাৎ 'ন জাযতে যঃ সঃ' এইরূপ বিগ্রহবাক্য দ্বারা নঞ্-বহুব্রীহি সমাসবদ্ধ পদরূপে 'অজ' শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা যেতে পারে (ন - √জন্-ধাতু + ড = অজ)। অতএব অনুমান করা যায় *মহাভারত*-স্থিত 'অজ' শব্দটি যাস্কীয় প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতিতেই নিরুক্ত করা হয়েছে।

শান্তিপর্বে 'অজ' শব্দের নির্বচনটি নিম্নরূপ-

> ন হি জাতো ন জাযেযং ন জনিষ্যে কদাচন।
> ক্ষেত্রজ্ঞঃ সর্বভূতানাং তস্মাদহমজঃ স্মৃতঃ।।[৪০]

আমি (শ্রীকৃষ্ণ) পূর্বেও জন্মাইনি, বর্তমানেও জন্মগ্রহণ করছিনা, ভবিষ্যতেও জন্মাবনা। এইজন্যই আমি অজ এবং সমস্ত প্রাণীর জীবাত্মা।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

শান্তিপর্বেও 'অজ' শব্দটির পূর্ববত্ নঞ্ পূর্বক √জন্-ধাতুর উত্তর 'ড' এই প্রত্যয় যুক্ত করে ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা যায়। অতএব এখানেও 'অজ' শব্দের নির্বচনটি প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতির অন্তর্গত হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

অধোক্ষজ

'অধোক্ষজ' শব্দের নির্বচন প্রসঙ্গে উদ্যোগপর্বের ষট্ষষ্টিতম অধ্যায়ে বলা হয়েছে-

> অধো ন ক্ষীযতে জাতু যস্মাত্ তস্মাদধোক্ষজঃ।[৪১]

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কখনই অধো অর্থাৎ নরকে গমন করেন না, তাই তিনি অধোক্ষজ। নর অর্থাৎ জীবাত্মাসমূহের অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় হওযায় তিনি নারায়ণ।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

পূর্বোক্ত 'অধোক্ষজ' শব্দটি যাস্কীয় প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে নিরুক্তি করা হয়েছে কারণ, নির্বচনে অবস্থিত 'অধো ন ক্ষীযতে জাতু' এই বিগ্রহবাক্য দ্বারা উত্তরপদের অবয়ব লোপ করে অধঃ ও অক্ষ শব্দদ্বয় পূর্বক √জন্-ধাতুর সাথে ড-প্রত্যয় যুক্ত করে শব্দটি নিষ্পন্ন করা হয় (অধঃ + অক্ষ + √জন্-ধাতু + ড = অধোক্ষজ) এবং এটি ব্যাকরণসম্মত উপায়েই নিষ্পাদিত।

অনাদি-অমধ্য-অনন্ত

পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের আদি মধ্য ও অন্ত জানা যায়না। তাই তিনি অনাদি, অমধ্য ও অনন্ত নামে আখ্যায়িত হন। তাঁর এই নামসমূহের নিরুক্তিপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

> ন চাদিং ন মধ্য তথা চৈব নান্তং
> কদাচিদ্বিদন্তে সুরাশ্চাসুরাশ্চ।
> অনাদ্যো হ্যমধ্যস্তথাচাপ্যনন্ত...।।[৪২]

অর্থাৎ দেবগণ ও অসুরগণ আমার আদি মধ্য ও অন্ত কখনও জানেননা সেইজন্যই তাঁরা আমাকে অনাদি, অমধ্য ও অনন্ত বলেন।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনে বিদ্যমান ন আদিং ন মধ্য নান্তং এই পদগুলি তাঁর পূর্বোক্ত তিন নামের সংকেত প্রদান করে। তদনুসারে 'অবিদ্যমান আদির্যস্য সঃ', 'অবিদ্যমানো মধ্যর্যস্য সঃ', 'অবিদ্যমানমন্তং যস্য সঃ'-এইভাবে নঞ্ বহুব্রীহি সমাস দ্বারা শব্দগুলি সিদ্ধ করা যায়। অতএব প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে নিরুক্তিটি প্রদর্শিত হয়েছে।

ঋতধামা

বৈয়াসিক *মহাভারত*-এর অন্তর্গত শান্তিপর্বে নাম-নির্বচন বর্ণনাকালে অর্জুন-সখা শ্রীকৃষ্ণ নিজের 'ঋতধামা' নামের নিরুক্তিতে বলেছেন-

> ধাম সার হি ভূতানামৃতঞ্চৈব বিচারিতম্।
> ঋতধামা ততো বিপ্রৈঃ সদ্যশ্চাহং প্রকীর্তিতঃ।।[৪৩]

আমি ভূতসমূহের প্রধান আশ্রয় এবং মুনিরা আমাকে ঋত অর্থাৎ সত্য বলে নির্ণয় করেন। এইজন্যই ব্রাহ্মণেরা আমাকে 'ঋতধামা' বলে।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

'ঋতধামা' শব্দের নির্বচনে 'ঋত' এবং 'ধাম' উভয় শব্দের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ একদিকে যেমন 'ঋত' অর্থাৎ সত্যস্বরূপ অন্যদিকেই তিনিই ভূতসমূহের প্রধান আশ্রয়। সেইজন্যই তাঁকে 'ঋতধামা' বলা হয়। অতএব শব্দটির ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গে ভারতকৌমুদীকারের মত বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন- "ঋতশ্চাসৌ ধামা চেতি ঋতধামা"।[৪৪] এই ব্যাকরণগত শব্দগঠন প্রক্রিয়া অবলম্বনে শব্দটির নিরুক্তি প্রদর্শিত হওয়ায় এটি যাস্কীয়-প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতির অন্তর্গত এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

একশৃঙ্গ

পরমেশ্বর বিষ্ণুর 'একশৃঙ্গ' নামের নির্বচনস্বরূপ শান্তিপর্বে বলা হয়েছে-

> একশৃঙ্গঃ পুরা ভূত্বা বরাহো নন্দিবর্ধনঃ।
> ইমাঞ্চোদ্ধৃতবান্ ভূমিমেকশৃঙ্গস্ততো হ্যহম্।।[৪৫]

অর্থাৎ পূর্বে আমি জগতের আনন্দবর্ধক একশৃঙ্গ বরাহের রূপ ধারণ করে এই পৃথিবীকে জল বা প্রলয় সমুদ্র থেকে উত্তোলন করেছিলাম। তাই আমার নাম 'একশৃঙ্গ'।

নির্বচনপদ্ধতি

'একশৃঙ্গ' শব্দের নিরুক্তি প্রসঙ্গে 'ভারতকৌমুদী' টীকায় বলা হয়েছে-"একং শৃঙ্গং শৃঙ্গমিব উচ্চং শিরোমাংসং যস্য সঃ"।[৪৬] অতএব তাঁর মতানুসারে বহুব্রীহিসমাস দ্বারা নির্বচনান্তর্গত পদটি সিদ্ধ হওয়ায় এটি প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কৃষ্ণ

উদ্যোগপর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 'কৃষ্ণ' নামের নির্বচন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

> কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
> বিষ্ণুস্তদ্ভাবযোগাচ্চ কৃষ্ণো ভবতি সাত্বতঃ।।[৪৭]

অর্থাৎ √কৃষ্-ধাতু নিষ্পন্ন কৃষি শব্দ অস্তিত্ব বা সত্তাবাচক এবং 'ণ' আনন্দ অর্থের বোধক। এই দুই ভাব যুক্ত হয়ে যদুকুলে অবতীর্ণ নিত্য আনন্দস্বরূপ শ্রীবিষ্ণুকে 'কৃষ্ণ' বলা হয়।

যাস্কীয় নির্বচনপদ্ধতি

উদ্যোগপর্বে বিদ্যমান কৃষ্ণ শব্দের নির্বচনে শব্দটির উৎপত্তি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়েছে। নির্বচনে √কৃষ্-ধাতু থেকে জাত 'কৃষি' শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'ভূ' অর্থাৎ সত্তা আবার, √কৃষ্ ধাতু নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ হল 'কর্ষতি', যার অর্থ কর্ষণ করা বা আকর্ষণ করা। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সৎ-স্বরূপ। তত্ত্বজ্ঞান জন্মালে তিনি সমস্ত জগৎকে নিজের মধ্যে কর্ষণ করেন। তিনিই আবার আনন্দস্বরূপ। তাঁর এই দুই গুনের সংযোগেই 'কৃষ্ণ' এই নাম। কৃষি শব্দের 'কৃষ্' ও আনন্দ বাচক 'ণ' শব্দ যুক্ত করে 'কৃষ্ণ' শব্দের উৎপত্তি সিদ্ধ হয়েছে (*কৃষ বিলেখনে,* ভ্বাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ৯৯০)। অতএব কৃষ্ণ শব্দের নির্বচনটি যাস্কীয় অতিপরোক্ষ-নির্বচন শ্রেণীর অন্তর্গত হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

শান্তিপর্বে শ্রীকৃষ্ণ নিজের কৃষ্ণত্ব প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে যা বলেছেন সেটি হল-

> কৃষামি মেদিনীং পার্থ! ভূত্বা কার্ষ্ণ্যযসো মহান্।
> কৃষ্ণবর্ণশ্চ মে যস্মাত্তস্মাত্ কৃষ্ণোঽহমর্জুন! [৪৮]

পৃথানন্দন অর্জুন! আমি লাঙ্গলের বিশাল লৌহময় ফাল হয়ে ভূমি কর্ষণ করি অথবা যেহেতু আমার কৃষ্ণবর্ণ সেহেতু আমি 'কৃষ্ণ'।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

এখানে কৃষ্ণ শব্দের উৎপত্তির দুটি হেতু নির্দেশিত হয়েছে। প্রথমটি হল কর্ষণকারীরূপে কৃষ্ণ আর দ্বিতীয় কারণ হল কৃষ্ণবর্ণ হওয়ায় কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব। অতএব কর্ষণার্থক *কৃষ বিলেখনে* ধাতুর উত্তর ঔণাদিক নক্-প্রত্যয় (√কৃষ্ + নক্ = কৃষ্ণ) যুক্ত করে 'কৃষ্ণ' শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে যেমন অনুমান করা যায় তেমনি 'কৃষ্ণবর্ণ যস্য সঃ' এইরূপ বিগ্রহ দ্বারাও বহুব্রীহিসমাস নিষ্পন্ন হিসাবেও শব্দটি সিদ্ধ করা যায়। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, শান্তিপর্বে 'কৃষ্ণ' শব্দের ব্যাকরণগত প্রত্যক্ষ-নির্বচনপদ্ধতিতে নির্বচন করা হয়েছে।

কেশব

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে শান্তিপর্বে তাঁর 'কেশব' নামের নিরুক্তি হিসাবে যা বলেছেন তা হল-

> সূর্যস্য তপতো লোকানগ্নেঃ সোমস্য চাপ্যুত।
> অংশবো যত্ প্রকাশন্তে মম তে কেশসংজ্ঞিতাঃ।
> সর্বজ্ঞাঃ কেশবং তস্মান্নামাহুর্দ্বিজসত্তমাঃ।[৪৯]

পৃথিব্যাদি লোকসমূহকে তাপপ্রদানকারী সূর্য, অগ্নি এবং চন্দ্রের যে কিরণ প্রকাশিত হয় সেগুলিকে আমার কেশ বলা হয়। সেই কেশযুক্ত আমাকে সর্বজ্ঞ বিদ্বানগণ কেশব বলেন।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

অগ্নি, সূর্য এবং চন্দ্রের কিরণরূপ কেশ ধারণ করায় শ্রীকৃষ্ণ 'কেশব' নামে প্রসিদ্ধ হন। নির্বচনটির বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত শব্দটির ব্যুৎপত্তি যথা- 'কেশা অস্য সন্তি ইতি কেশব' অর্থাৎ 'কেশ' শব্দের সাথে অস্ত্যর্থে 'ব'-প্রত্যয় যুক্ত করে 'কেশব' পদটি পাওয়া যায়। অতএব নির্বচনটি ব্যাকরণ অনুসারে প্রদর্শিত হওয়ায় এটি যাস্কীয়প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতির প্রকৃষ্ট উদাহরণস্বরূপ।

খণ্ডপরশু

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নাম-নির্বচন বর্ণনাকালে নিজেকে 'খণ্ডপরশু' অভিধায় অভিহিত করে, তাঁর এই নামের কারণ হিসাবে বলেছেন-

ক্ষিপ্তশ্চ সহসা তেন খণ্ডং প্রাপ্তবাংস্তদা।
ততোঽহং খণ্ডপরশুঃ স্মৃতঃ পরশুখণ্ডনাত্।।[৫০]

অর্থাৎ নারায়ণাত্মক নর মহাদেবকে বিনাশ করার উদ্দেশ্যে তাঁর প্রতি বেগে পরশুটি নিক্ষেপ করলেন কিন্তু মহাদেবের প্রভাবে তা খণ্ডিত হয়ে গেল। সেই পরশু খণ্ড হওয়াতেই আমি 'খণ্ডপরশু' নামে প্রসিদ্ধ হয়েছি।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

'খণ্ডপরশু' শব্দের নির্বচন বিশ্লেষণ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় এটি যাস্কাচার্য্যের প্রথম নির্বচনপদ্ধতি অবলম্বন করেছে। মহাদেবের প্রভাবে তাঁর দ্বারা নিক্ষিপ্ত পরশু খণ্ডিত হওয়ায় তিনি এই নাম প্রাপ্ত হন অর্থাৎ 'খণ্ডঃ পরশুঃ যস্য সঃ' এইরূপ বিগ্রহবাক্যের সহায়তায় 'খন্ডপরশুঃ' শব্দটির নিষ্পত্তি করা যায়।

গোবিন্দ

'গোবিন্দ' শব্দের উৎপত্তি প্রসঙ্গে এক বিশেষ কারণ দর্শিত হয়, তা হল-

গোবিন্দো বেদনাদ্ গবাম্।।[৫১]

'গবাম্' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের 'বেদনাত্' অর্থাৎ লাভ করায় অথবা লিঙ্গদেহসমূহ লাভ করায় তিনি গোবিন্দ নামে অভিহিত হন।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচন থেকে সহজেই অনুমান করা যায়- 'গো' এই শব্দপূর্বক লাভার্থক √বিদ্-ধাতুর সাথে 'শ' প্রত্যয় যুক্ত করে 'গোবিন্দ' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে (গো - √বিদ্-ধাতু + শ = গোবিন্দ)। অতএব এটি যাস্কীয় প্রত্যক্ষনির্বচন পদ্ধতিতে ব্যুৎপন্ন হয়েছে।

শান্তিপর্বে 'গোবিন্দ' শব্দের নিরুক্তিস্বরূপ বলা হয়েছে-

নষ্টাঞ্চ ধরণীং পূর্বমবিন্দং বৈ গুহাগতাম্।
গোবিন্দ ইতি তেনাহং দেবৈর্বাগ্ভিরভিষ্টুতঃ।।[৫২]

পূর্বকালে পৃথিবী যখন গুহাপ্রবিষ্টের ন্যায় প্রলয় সমুদ্রের জলে অদৃশ্য হয়েছিল তখন আমি বরাহরূপে দন্ত দ্বারা সেই পৃথিবীকে লাভ করেছিলাম। সেইজন্য দেবতারা আমাকে গোবিন্দ নামে স্তব করেছেন।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনস্থিত 'ধরণী' শব্দের একটি পর্যায়বাচী শব্দ হল 'গো' যেটির অর্থ 'পৃথিবী'। বিশ্লেষণ হেতু জানা যায়- 'ধরণী' অর্থাৎ পৃথিবীকে লাভ করায় তিনি 'গোবিন্দ' নাম প্রাপ্ত হন। 'গো' এই শব্দপূর্বক লাভার্থক √বিদ্-ধাতুর সাথে 'শ'-প্রত্যয় যুক্ত করে 'গোবিন্দ' শব্দের উৎপত্তি সিদ্ধ করা যায় (গো - √বিদ্-ধাতু + শ = গোবিন্দ)। অতএব অনুমান করা যায়, এটি যাস্কীয় প্রত্যক্ষনির্বচন পদ্ধতিতে ব্যুৎপন্ন হয়েছে।

ঘৃতার্চি

'ঘৃতার্চি' নামের নিরুক্তিস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন-

ঘৃতং মমার্চিষো লোকে জন্তূনাং প্রাণধারণম্।
ঘৃতার্চিরহমব্যগ্রৈর্বেদজ্ঞৈঃ পরিকীর্তিতঃ।।[৫৩]

অর্থাৎ জগতে প্রাণিদের প্রাণধারক ঘৃত আমার স্বরূপভূত অগ্নিদেবের অর্চিষ অর্থাৎ আহুতির যোগ্য তাই বেদজ্ঞগণ আমাকে 'ঘৃতার্চি' বলেন।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

'ঘৃতার্চি' শব্দের নিরুক্তিটির বিশ্লেষণ থেকে ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়। 'ঘৃতেন বর্ধিতমর্চিঃ ইতি ঘৃতার্চিঃ' এইরূপ মধ্যপদলোপীকর্মধারয় সমাস বা 'ঘৃতমর্চিঃ যস্য সঃ' এই বিগ্রহবাক্য দ্বারা বহুব্রীহিসমাস দ্বারা 'ঘৃতার্চিঃ' এই পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায় 'ঘৃতার্চি' শব্দ ব্যাকরণ অনুসারী প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে ব্যুৎপাদিত হয়েছে।

জনার্দন

উদ্যোগপর্বে পুরুষোত্তম ভগবানের 'জনার্দন' নামের নির্বচনস্বরূপ বলা হয়েছে-

দস্যুত্রাসাজ্জনার্দনঃ।।[৫৪]

তিনি দস্যু অর্থাৎ দুর্জনের পীড়ন করেন তাই তাঁর নাম 'জনার্দন'।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

পাপী মানুষদের ত্রাস সৃষ্টি করেন বা হিংসা করেন সেইজন্য তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) 'জনার্দন' নামে পরিচিত। অতএব জন শব্দপূর্বক হিংসার্থক √অর্দ্-ধাতু (*অর্দ হিংসায়াম্,* চুরাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১৮২৮) থেকে 'জনার্দন' শব্দের নিষ্পত্তি বিষয়ে অনুমান করা যায় (জন – √অর্দ্-ধাতু + ল্যুট্ = জনার্দন)। নির্বচনটি ব্যাকরণগত শব্দগঠন প্রক্রিয়া অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এটি যাস্কীয় প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতির অন্তর্গত।

জিষ্ণু

উদ্যোগপর্বে ভগবান কেশবকে 'জিষ্ণু' নামে অভিহিত করে তাঁর এই নামের নিরুক্তি হিসাবে সঞ্জয় বলেছেন-

জয়নাজ্জিষ্ণুরুচ্যতে।[৫৫]

(অসুরদের) জয় করায় তিনি জিষ্ণু।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

'জিষ্ণু' নামের নিরুক্তি থেকে অনুমান করা যায় জয়ার্থক √জি-ধাতু থেকে 'জিষ্ণু' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। ব্যাকরণগত শব্দগঠনপ্রক্রিয়া অনুসারে √জি-ধাতুর সাথে 'স্নুক্' প্রত্যয় যুক্ত করে 'জিষ্ণু' পদটি গঠিত হয়। এখানেও পদটির ব্যাকরণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নির্বচন প্রদর্শিত হওয়ায় অনুমান করা যায় এটি যাস্কীয় প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতির অন্তর্গত।

ত্রিককুৎ

শান্তিপর্বে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে 'ত্রিককুৎ' নামের নির্বচনস্বরূপ বলেছেন-

তথৈবাসং ত্রিককুদো বারাহং রূপমাস্থিতঃ।
ত্রিককুৎ তেন বিখ্যাতঃ শরীরস্য তু মাপনাত্।।[৫৬]

অর্থাৎ সেই প্রকার আমি বরাহ রূপ ধারণ করে তিনটি উচ্চস্থানযুক্ত দেহ প্রদর্শন করেছিলাম। সেইজন্য আমি 'ত্রিককুৎ' নামে খ্যাত।

নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনটির বিশ্লেষণ থেকে তিনটি ককুদ উচ্চস্থানবিশিষ্ট শরীর ধারণ করায় পরমেশ্বর বিষ্ণু 'ত্রিককুৎ' নাম প্রাপ্ত হন। তদনুসারে 'ত্রীণি ককুদানি যস্য সঃ' এইরকম ব্যাসবাক্য দ্বারা পদটি নিষ্পন্ন করা যায়। অতএব প্রত্যক্ষ নির্বচনপদ্ধতিতে শব্দটি নির্বচন করা হয়েছে।

দামোদর

'দামোদর' শব্দের নির্বচন উদ্যোগ এবং শান্তি উভয় পর্বেই বিদ্যমান। 'উদ্যোগপর্বে' শ্রীকৃষ্ণের এই নামের কারণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

> দমাদ্ দামোদর বিভু।[৫৭]

দমযুক্ত হওয়ায় তিনি 'দামোদর'।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

পূর্বোক্ত নির্বচন অনুসারে 'দামোদর' নামটির উৎপত্তিতে 'দম' শব্দের সাথে আদ্যংশের বর্ণাক্ষর সাম্য লক্ষিত হওয়ায় এটি অতিপরোক্ষ নির্বচন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

'শান্তিপর্বে' শ্রীকৃষ্ণ তাঁর 'দামোদর' নামের নির্বচনস্বরূপ বলেছেন-

> দমাত্ সিদ্ধিং পরীপ্সন্তো মাং জনাঃ কাময়ন্তি হ।
> দিবঞ্চোর্বীঞ্চ মধ্যঞ্চ তস্মাদ্দামোদরো হ্যহম্।।[৫৮]

অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্য ও আকাশবর্তী লোকেরা ইন্দ্রিয়দমননিবন্ধন আমাকে লাভ করার ইচ্ছায় সিদ্ধি কামনা করে, তাই আমি 'দামোদর'।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

শান্তিপর্বস্থিত নির্বচনেও 'দামোদর' শব্দের উৎপত্তির হেতুরূপে 'দম' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। অতএব এটিও অতিপরোক্ষনির্বচনপদ্ধতি অবলম্বনে কৃত নির্বচন।

ধর্মজ

শান্তিপর্বে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে 'ধর্মজ' নামে উল্লেখ করে তার নিরুক্তিস্বরূপ বলেছেন-

> পুরাহমাত্মজঃ পার্থ! প্রথিত কারণান্তরে।
> ধর্মস্য কুরুশার্দূল! ততোঽহং ধর্মজঃ স্মৃতঃ।[৫৯]

অর্থাৎ কৌরবশ্রেষ্ঠ পৃথানন্দন! পূর্বকালে আমি কোনো কারণে ধর্মের পুত্র হয়েছিলাম সেইজন্য আমি ধর্মজ নামে প্রসিদ্ধ হয়েছি।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

'ধর্মজ' শব্দের নিরুক্তিতে এটি স্পষ্ট যে ধর্মের পুত্র বা আত্মজ হওয়ায় ভগবান কেশবকে ধর্মজ বলা হয়। অতএব ধর্মস্য আত্মজঃ ইতি ধর্মজঃ' এইরূপ নির্বচনস্থিত বিগ্রহ থেকে অনুমান করা যায় 'ধর্ম' শব্দপূর্বক

√জন্-ধাতুর উত্তর 'ড'-প্রত্যয় যুক্ত করে 'ধর্মজ' শব্দ পাওয়া যায়। সুতরাং এটি যাস্কীয়প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

নারায়ণ

উদ্যোগপর্বে সঞ্জয় কর্তৃক উদ্ধৃত ভগবান কেশবের 'নারায়ণ' নামের নির্বচনটি হল-

> নরাণামযনাচ্চাপি ততো নারাযণঃ স্মৃতঃ।।[৬০]

নর অর্থাৎ জীবাত্মাসমূহের অয়ন অর্থাৎ গতি বা আশ্রয় হওয়ায় তিনি নারায়ণ।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

পূর্বোক্ত নির্বচনটি ব্যাকরণগত শব্দগঠন প্রক্রিয়া অনুসারেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিরুক্তিতে বিদ্যমান 'নরাণামযনাত্' শব্দবন্ধ থেকে 'নারায়ণ' শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে সহজেই অনুমান করা যায়। 'নরাণাম্ অযনং যঃ সঃ' এইরূপ বিগ্রহবাক্য দ্বারা 'নর' এই শব্দ পূর্বক গত্যর্থক √ইণ্-ধাতুর সহিত 'ল্যুট্'-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'নারায়ণ' শব্দটি ব্যুৎপন্ন হয়েছে (নর- √ইণ্-ধাতু + ল্যুট্ = নারায়ণ)। অতএব বলা যায় এটি যাস্কীয় প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতির অন্তর্গত।

শান্তিপর্বে ভগবান কেশব তাঁর 'নারায়ণ' নামের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বলেছেন-

> আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
> অযনং মম তত্ পূর্বমতো নারাযণো হ্যহম্।।[৬১]

জলরাশি নারা এই নামে উক্ত হয়, এই জলরাশিসমূহ নর অর্থাৎ পরমাত্মার পুত্র। সৃষ্টির পূর্বে সেই নার বা নারা আমার (শ্রীকৃষ্ণের) আশ্রয় ছিল। এইজন্যই আমি (তিনি) নারায়ণ নামে পরিচিত হই।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

নিরুক্তটির বিশ্লেষণ থেকে জ্ঞাত হওয়া যায় নারা অর্থাৎ জলরাশিসমূহ শ্রীকৃষ্ণের অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় হওয়ায় তিনি নারায়ণ নাম প্রাপ্ত হয়েছেন। ভারতকৌমুদীকার এই প্রসঙ্গে বলেছেন- "নরঃ পরমাত্মা...। তেন চ নরস্যাপত্যানীতি নারা ইতি নারশব্দস্য জলার্থে যৌগিকত্বং দর্শিতম্। তদিতি বিধেয়প্রাধান্যাত্ ক্লীবত্বম্, পূর্বং সৃষ্টেঃ প্রাক্ মম অযনম্ আশ্রযস্থানম্ অতোঽহং নারাযণঃ"[৬২] অর্থাৎ 'নার অযনং যস্য সঃ' এইরূপ বিগ্রহ করে শব্দটির উৎপত্তি সিদ্ধ হয়। অতএব বলা যায় পূর্বোক্ত নির্বচনটি যাস্কীয় প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতির এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

পুণ্ডরীকাক্ষ

'পুণ্ডরীকাক্ষ' নামের নির্বচনটি হল-

> পুণ্ডরীকং পরং ধাম নিত্যমক্ষযমব্যযম্।
> তদ্ভাবাত্ পুণ্ডরীকাক্ষো...।।[৬৩]

অর্থাৎ নিত্য, অক্ষয় ও অবিনাশী পরম ভগবদ্ধামকে 'পুণ্ডরীক' বলা হয় বা হ্রাস ও নাশবিহীন অর্থাৎ নিত্য এবং উত্তম আশ্রয়ই 'পুণ্ডরীক'। তদ্বিশিষ্ট হওয়ায় তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) 'পুণ্ডরীকাক্ষ'।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

'পুণ্ডরীকাক্ষ' শব্দের নির্বচনে দেখা যায় 'পুণ্ডরীক' এবং 'অক্ষয়' এই দুটি শব্দ যুক্ত হয়ে অন্ত্যবর্ণ লুপের দ্বারা 'পুণ্ডরীকাক্ষ' শব্দ উৎপন্ন হয়েছে। অতএব এটি যাস্কীয় পরোক্ষ নির্বচনপদ্ধতির একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

পুরুষ

'গুরু-শিষ্যের সংবাদ' উল্লেখ করার সময় শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অধ্যাত্মতত্ত্বের বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে তিনি পুরুষরূপে অভিহিত হয়েছেন। তাঁর এই নামের ব্যুৎপত্তিস্বরূপ বলা হয়েছে –

> নবদ্বারং পুরং পুণ্যমেতৈর্ভাবৈঃ সমন্বিতম্।
> ব্যাপ্য শেতে মহানাত্মা তস্মাত্ পুরুষ উচ্যতে।।[৬৪]

অর্থাৎ সেই মহানাত্মা (শ্রীকৃষ্ণ) নবদ্বারযুক্ত, পবিত্র পুর অর্থাৎ শরীরকে ব্যাপ্ত করে এতে শয়ন করেন তাই তাঁকে পুরুষ বলা হয়।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

'পুরুষ' শব্দের নির্বচনে বিদ্যমান 'পুরং ব্যাপ্য শেতে' এই অংশ থেকে 'পুরুষ' শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে অনুমান করা যায়। পুরম্ শব্দ থেকে 'পুর' এবং √শী-ধাতু নিষ্পন্ন 'শেতে' ক্রিয়াপদ থেকে 'শ' গ্রহণ করে 'পুরশ' পদ পাওয়া যায়। অতঃপর র-কারের অ-কার উ-কার প্রাপ্ত হলে এবং 'শ্'-এর স্থানে 'ষ্' বসিয়ে 'পুরুষ' পদটি গঠিত হয়। অতএব বলা যায় এটি যাস্কীয় পরোক্ষনির্বচনপদ্ধতির আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পুরুষোত্তম

উদ্যোগপর্বে পুরুষোত্তম ও সর্ব শব্দের নির্বচন একত্রে প্রদর্শিত হয়েছে। 'পুরুষোত্তম' সম্পর্কে বলা হয়েছে-

> পূরণাত্ সদনাচ্চাপি ততোঽসৌ পুরুষোত্তমঃ।[৬৫]

অর্থাৎ তিনি সর্বত্র পূর্ণ এবং সকলের নিবাসস্থান বা আশ্রয় হওয়ায় পুরুষোত্তম।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

'পুরুষোত্তম' শব্দের নির্বচনে শব্দটির উৎপত্তির যে দুটি হেতু উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি হল- 'পূরণাত্' ও 'সদনাত্'। 'পূরণ' শব্দ বা 'পূরী আপ্যাযনে' ধাতু থেকে 'পুরু' শব্দ (পূরণ > পুরু, ঊ>উ এবং র-এর অকারের স্থানে উকার হয়েছে বা √পূর্-ধাতুস্থিত ঊকার উকার হয়েছে এবং উকার অন্ত্যস্বরাগম হয়ে পুরু প্রাপ্ত হয়) এবং 'সদন' শব্দ থেকে 'সদ্' গ্রহণ করে 'পুরু' শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে 'পুরুষত্' শব্দ পাওয়া যায় (স্>ষ্, দকার >তকার)। কিন্তু পুরুষোত্তম শব্দের অন্ত্যস্থিত তম শব্দের আগম প্রসঙ্গে কিছু বলা হয়নি। এমনকী, 'পূরণাত্' ও 'সদনাত্' শব্দদুটিকে মাথায় রেখে 'পূরযতীতি পুরু' এবং 'সীদন্ত্যস্মিন্নিতি স, তস্মাত্ পুরুষ' এইরূপ বিগ্রহ দ্বারা পুরুষ শব্দ প্রাপ্ত হলেও হেতুরূপে উত্তম শব্দের উল্লেখ নেই। অতএব বলা যায় এটি যাস্কীয় অতিপরোক্ষনির্বচন শ্রেণির অন্তর্গত।

পৃশ্নিগর্ভ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একটি অন্যতম নাম 'পৃশ্নিগর্ভ'। শান্তিপর্বে তাঁর এই নামের নিরুক্তিস্বরূপ বলা হয়েছে-

> পৃশ্নিরিত্যুচ্যতে চান্নং বেদা আপোঽমৃতং তথা।
> মমৈতানি সদা গর্ভঃ পৃশ্নিগর্ভস্ততো হ্যহম্।।[৬৬]

অর্থাৎ অন্ন, বেদ, জল ও অমৃতকে পৃশ্নি বলা হয়। সেগুলি সর্বদা আমার গর্ভে থাকে। অতএব আমার নাম পৃশ্নিগর্ভ।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

'পৃশ্নিগর্ভ' শব্দের নির্বচন থেকে শব্দটির ব্যুৎপত্তি বিষয়ে সহজেই অনুমান করা যায়। অন্নাদি 'পৃশ্নি' ভগবান কেশবের গর্ভে সর্বদা বিদ্যমান থাকায় তিনি এই নামে অভিহিত হন অর্থাৎ 'পৃশ্নিঃ গর্ভে যঃ সঃ' এইরূপ বিগ্রহবাক্য দ্বারা শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা যায়। ব্যাকরণসম্মত উপায়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এটি যাস্কীয়প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্বরূপ।

মাধব ও মধুহা-মধুসূদন

শ্রীকৃষ্ণের মাধব ও মধুহা-মধুসূদন' এই উপাধির কারণ হিসাবে 'উদ্যোগপর্বে' বলা হয়েছে-

> মৌনাদ্ধ্যানাচ্চ যোগাচ্চ বিদ্ধি ভারত! মাধবম্।
> সর্বতত্ত্বলযাচ্চৈব মধুহা মধুসূদনঃ।।[৬৭]

অর্থাৎ হে ভারত! মনন, ধ্যান ও যোগের সাহায্যে মায়াকে দূর করেন বলে তাঁকে মাধব নামে জানবেন এবং তত্ত্বজ্ঞান জন্মালে জগতের সমস্ত পদার্থই তাঁতে লয় পায় বলে তিনি মধুহা ও মধুসূদন।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

শ্রীকৃষ্ণের এই মহিমান্বিত নামের 'নিরুক্তি' হেতুবাচক পদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর এই নামের উৎস নিরূপণের জন্য 'ভারতকৌমুদীকারের' মত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন- "মাং মাযাং ধুনোতি সঞ্চালযতি অপসারযতীতি মাধবঃ। সর্বেষাং তত্ত্বানাং জড়পদার্থানাং লযাৎ তত্ত্বজ্ঞানেন বিলোপাদ্ধেতোশ্চ, মধু আপাতমধুরং ভোগং হন্তীতি মধুহা, মধু সূদযতি নাশযতীতি চ মধুসূদনঃ"।[৬৮] অতএব 'মাং ধুনোতি' থেকে 'মাধব' শব্দ সৃষ্টির সংকেত পাওয়া যায় অর্থাৎ 'মা' এই সুবন্ত পদের সাথে √ধু-ধাতুর (*ধুঞ্ কম্পনে*, স্বাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১২৫৫) উত্তর 'অচ্'-প্রত্যয় যোগে শব্দটি ব্যুৎপন্ন হয়েছে (মা-√ধু-ধাতু + 'অচ্' = মাধব)। 'মধুহা' শব্দের উৎপত্তি স্বরূপ বলা যায়- 'মধু' এই শব্দের সাথে √হন্-ধাতু (*হন হিংসাগত্যোঃ*, অদাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১০১২) যুক্ত হয়ে 'মধুহা' শব্দ উৎপন্ন হয় (মধু + √হন্-ধাতু + ক্বিপ্ > মধুহন্ বা মধুহা) এবং 'মধু' শব্দের সাথে √সূদ্-ধাতু (*ষূদ ক্ষরণে*, চুরাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১৭১৭) যুক্ত করে 'মধুসুদন' শব্দ নিষ্পন্ন হয় (মধু + √সূদ্-ধাতু + 'ল্যুট্' প্রত্যয় = মধুসূদন)। অতএব সামগ্রিক বিশ্লেষণ থেকে জ্ঞাত হওয়া যায় তিনটি নির্বচন-ই যাস্কীয় প্রত্যক্ষ নির্বচনপদ্ধতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বৈয়াসিক *মহাভারতে*র শান্তিপর্বের অন্তর্গত 'মোক্ষধর্মপর্ব' নামক অধ্যায়ে পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে শ্রীকৃষ্ণ থেকে সমস্ত ভূতের উৎপত্তি ও তাঁর মহিমা কথনকালে 'মধুসূদন' নামে আখ্যায়িত করে তাঁর এই নামের কারসূহিসাবে বলেছেন-

> তস্য তাত! বধাত্ সর্বে দেবদানবমানবাঃ।
> মধুসূদনমিত্যাহুর্ঋষভং সর্বসাত্বতাম্।।[৬৯]

বৎস! (মধু নামক অসুরকে) বধ করায় সমস্ত দেবতা দানব ও মানুষ সাত্বতবংশশ্রেষ্ঠ এই শ্রীকৃষ্ণকে মধুসূদন বলেন।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

শান্তিপর্বে 'মধুসূদন' নামের নিরুক্তিতে মধু শব্দের উল্লেখ নেই। তথাপি 'বধাত্' এই ক্রিয়াপদের উপস্থিতি থেকে অনুমান করা যায় মধু নামক দৈত্যনাশের বিষয়টিই দ্যোতিত হয়েছে। তদনুসারে 'মধুং সূদযতি ইতি মধুসূদন' এইরূপ বিগ্রহবাক্য দ্বারা 'মধুসূদন' শব্দটির ব্যুৎপত্তি করা যায়। অতএব এই নিরুক্তিতে যাস্কীয় প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। পরন্তু নির্বচনে 'মধু' নামক দৈত্যের নামোল্লেখ অনুপস্থিত থাকায় নাশার্থক √সূদ্-ধাতু থেকে 'মধুসূদন' নামের উৎপত্তি অনুমান করে নির্বচনটি অতিপরোক্ষ নির্বচনপদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

মুঞ্জকেশবান্

ভগবান কেশবের এক মহিমান্বিত নাম 'মুঞ্জকেশবান্'। তাঁর এই নামের উৎপত্তির কারণ হল-

> বেগেন মহতা পার্থ! পতন্নারাযণোঽসি।
> ততস্তত্তেজসাবিষ্টাঃ কেশাঃ নারাযণস্য হ।
> বভূবুর্মুঞ্জবর্ণাস্তু ততোঽহং মুঞ্জকেশবান্।।[৭০]

পৃথানন্দন! (মহাদেবের দ্বারা নিক্ষেপিত) সেই শূল মহাবেগে গিয়ে নারায়ণের বক্ষে পতিত হল। তারপর নারায়ণের কেশকলাপ সেই শূলের তেজে সংশ্লিষ্ট হয়ে মুঞ্জবর্ণ হয়ে গেল। সেইজন্য আমি (শ্রীকৃষ্ণ) 'মুঞ্জকেশবান্'।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

মহাদেবের শূলের আঘাতে নারায়ণের কেশরাশি মুঞ্জবর্ণ হওয়ায় তদ্বিশিষ্ট তিনি 'মুঞ্জকেশবান্' নামে পরিচিত হন। অতএব 'মুঞ্জবর্ণাঃ কেশাঃ অস্যাস্তি' এইরূপ বিগ্রহবাক্য দ্বারা অস্ত্যর্থে মতুপ্-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'মুঞ্জকেশবান্' শব্দ গঠিত হয়। ব্যাকরণগত সংস্কার অনুসরণ করায় এটি যাস্কাচার্য্য দ্বারা নির্ধারিত প্রথম অর্থাৎ প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতি অনুযায়ী কৃত নির্বচন।

বাসুদেব

সঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণের 'বাসুদেব' ও 'বিষ্ণু' এই দুই নামের ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গে বলেছেন-

> বসনাত্ সর্বভূতানাং বসুত্বাদ্ দেবযোনিতঃ।
> বাসুদেবস্ততো বেদ্যো।[৭১]

অর্থাৎ সমস্ত পদার্থের বাসস্থান হওয়ায় কিংবা সমস্ত পদার্থের আচ্ছাদনকারী (উজ্জ্বল দীপ্তি দ্বারা বা মায়ার আবরণ দ্বারা) হওয়ায়, বসু অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ধনস্বরূপ হওয়ায়, দেবতাদের জন্মস্থান হওয়ায় বা দেবগণেরও কারণ বলে তিনি 'বাসুদেব' নামে খ্যাত।

যাস্কীয় নির্বচনপদ্ধতি

'বাসুদেব' শব্দের নিরুক্তি থেকে শব্দটির উৎস সম্পর্কে একাধিক উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে- প্রথমত নিবাসার্থক √বস্-ধাতুর (*বস নিবাসে,* ভ্বাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১০০৫,) বা আচ্ছাদনার্থক √বস্-ধাতু (*বস আচ্ছাদনে,* অদাদিগণ পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১০২৩) থেকে বাসুদেব শব্দের উৎপত্তি। দ্বিতীয়ত 'বসু' শব্দ 'বাসুদেব' শব্দের মূলস্বরূপ। তৃতীয় হেতু 'দেবযোনি' শব্দ। অতএব √বস্-ধাতু নিষ্পন্ন 'বসন' শব্দ ও ধনবাচক 'বসু' শব্দের 'বাসুদেব' শব্দের আদ্যংশের সহিত এবং 'দেবযোনি' শব্দের আদ্যংশের সাথে 'বাসুদেব' শব্দের অন্তিম

অংশের বর্ণাক্ষরগত সাম্য বিদ্যমান থাকায় অনুমান করা যায় উদ্যোগপর্বে কৃত নির্বচনটি যাস্কাচার্যের তৃতীয় নির্বচনপদ্ধতিকে অনুসরণ করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বাসুদেব

মহাভারত এই মহাকাব্যের 'শান্তিপর্বে' শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জুনকে তাঁর 'বাসুদেব' নামের কারণ হিসাবে যে নির্বচন উল্লেখ করেছেন তা হল-

> ছাদযামি জগদ্বিশ্বং ভূত্বা সূর্য ইবাংশুভিঃ।
> সর্বভূতাধিবাসশ্চ বাসুদেবস্ততো হ্যহম্।।[৭২]

অর্থাৎ আমি (শ্রীকৃষ্ণ) সূর্যের ন্যায় হয়ে কিরণ দ্বারা সমগ্র জগৎ আচ্ছাদন করি এবং আমিই সর্বভূতের বাসস্থান। সেইজন্যই আমি বাসুদেব।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

শান্তিপর্বে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর 'বাসুদেব' নামের প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে বিশেষ দুই গুণের উল্লেখ করেছেন। সমগ্র বিশ্বের আচ্ছাদনকারী এবং সকল ভূতের বাসস্থান যিনি সেই দেবরূপে তিনিই হলেন 'বাসুদেব'। 'ছাদয়ামি' ক্রিয়াপদের অর্থ আচ্ছাদন করা। অতএব আচ্ছাদনার্থক √বস্-ধাতু (*বস আচ্ছাদনে,* অদাদিগণ পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১০২৩) এবং সূর্যের কিরণের ন্যায় দ্যুতিমান হিসাবে দিব্-ধাতু থেকে (*দিবু ক্রীড়াবিজিগীষাব্যবহারদ্যুতিমোদদস্বপ্নকান্তিগতিষু,* দিবাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১১০৭) বাসুদেব শব্দের উপস্থিতি বিষয়ে অনুমান করা যায় (√বস্-ধাতু + √দিব্-ধাতু = বাসুদেব)। দ্বিতীয় কারণ হিসাবে 'অধিবাস' শব্দের অন্তর্গত নিবাসার্থক √বস্-ধাতু থেকে জাত 'বাস' শব্দের সাথে 'বাসুদেব' শব্দের আদ্যংশের সাম্য স্পষ্ট (√বস্-ধাতু > বাসুদেব)। তদনুসারে শান্তিপর্বেও 'বাসুদেব' শব্দটি অতিপরোক্ষ নির্বচনপদ্ধতির পরিচয় বহন করে।

বিরিঞ্চ

শ্রীকৃষ্ণের 'বিরিঞ্চ' নামের নির্বচন যথা-

> বিরিঞ্চ ইতি যত্ প্রোক্তং কাপিলজ্ঞানচিন্তকৈঃ।
> স প্রজাপতিরেবাহং চেতনাত্ সর্বলোককৃত্।।[৭৩]

অর্থাৎ সাংখ্যজ্ঞানিকারী আচার্যরা যে বিরিঞ্চ এইরূপ নাম বলেন, আমি চৈতন্য সম্পাদনপূর্বক সর্বলোক সৃষ্টিকারী সেই প্রজাপতি অর্থাৎ বিরিঞ্চ নামক ব্রহ্ম।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

ভারতকৌমুদীকার বিরিঞ্চ শব্দের নির্বচন প্রসঙ্গে বলেছেন- "বিশেষেণ রিণক্তি মাতৃগর্ভান্নিঃসারযতীতি বিরিঞ্চো বিরিঞ্চির্বা"[৭৪] অর্থাৎ তাঁর এই উক্তির ভিত্তিতে বলা যায় 'বি' এই উপসর্গপূর্বক রিচির্ বিরেচনে ধাতুর উত্তর 'অচ্'-প্রত্যয় যুক্ত করে 'বিরিঞ্চ' শব্দ উৎপন্ন হয় (বি- √রিচ্-ধাতু + 'অচ্' প্রত্যয় = বিরিঞ্চ)। অতএব এই নির্বচনটি যাস্কাচার্যকৃত প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতির দৃষ্টান্তস্বরূপ।

বিষ্ণু

উদ্যোগপর্বে সারথি সঞ্জয় দ্বারা উক্ত 'বিষ্ণু' শব্দের নির্বচনদুটি হল-

বৃহত্বাদ্ বিষ্ণুরুচ্যতে।[৭৫]

বৃহত্ হওয়ায় তিনি 'বিষ্ণু' নামে অভিহিত হন।

বিষ্ণুর্বিক্রমণাদ্।[৭৬]

অর্থাৎ বিক্রমণহেতু 'বিষ্ণু' এই নাম।

উৎসসন্ধান

'বৃহৎ' এই হেতুবাচক শব্দের অবলম্বনেই বিষ্ণু' শব্দের প্রথম ব্যুৎপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'বৃহত্' শব্দ √বৃহ্-ধাতুর উত্তর 'অতি' প্রত্যয় সংযোগে উৎপন্ন হয়। অতএব অনুমান করা যায় √বৃহ্-ধাতু থেকে 'বিষ্ণু' নাম এসেছে (√বৃহ্-ধাতু > বিষ্ণু)। দ্বিতীয় নির্বচন অনুযায়ী বি এই উপসর্গপূর্বক √ক্রম্-ধাতু থেকে 'বিষ্ণু' শব্দের নিষ্পত্তি সিদ্ধ হয় (বি- √ক্রম্-ধাতু > বিষ্ণু)। অতএব অনুমান করা যায়, উভয় নির্বচনেই যাস্কাচার্যের অতিপরোক্ষনির্বচনপদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

বিষ্ণু

শান্তিপর্বে 'বিষ্ণু' শব্দের নির্বচনস্বরূপ বলা হয়েছে-

গতিশ্চ সর্বভূতানাং প্রজনশ্চাপি ভারত।
ব্যাপ্তা মে রোদসী পার্থ! কান্তিশ্চাভ্যধিকা মম।।
অধিভূতানি চান্তেষু তদিচ্ছংশ্চাস্মি ভারত!
ক্রমণাচ্চাপ্যহং পার্থ! বিষ্ণুরিত্যভিসজ্ঞিত।।[৭৭]

অর্থাৎ আমি (শ্রীকৃষ্ণ) সর্বভূতের গতি বলে বিষ্ণু কিংবা আমার থেকে ভূতসমূহ উৎপন্ন হওয়ায় আমি বিষ্ণু অথবা আমি স্বর্গ মর্ত্য ব্যাপ্ত করে আছি বা আমার (শ্রীকৃষ্ণের) কান্তি সর্বাপেক্ষা অধিক কিংবা প্রলয়কালে আমি (শ্রীকৃষ্ণ) নিজ দেহে সমস্ত ভূতকে প্রবেশ করাতে ইচ্ছা করি এবং বামনরূপে সমগ্র জগৎ আক্রমণ করেছিলাম এইসব কারণে লোকে আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) বিষ্ণু বলে।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

শ্রীকৃষ্ণের 'বিষ্ণু' এই উপাধির একাধিক হেতু এখানে প্রদর্শিত হয়েছে। ভূতসমূহের গতি অর্থাৎ ভূতসকল তাঁকেই লাভ করে বা প্রাপ্ত হওয়ায় লাভার্থক √বিদ্-ধাতু (*বিদ্ঌ লাভে,* রুধাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১৪৩২) থেকে শব্দটির উৎপত্তি অনুমান করা যায়। প্রজন শব্দের অর্থ উৎপত্তিস্থান। এখানেও আগমন অর্থ জ্ঞাপিত হয়। সুতরাং √বিশ্-ধাতু (*বিশ প্রবেশনে,* রুধাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১৪২৪) উৎস হিসাবে অনুমেয়। তৃতীয় হেতুস্বরূপ ব্যাপ্ত্যর্থক √বিষ্-ধাতুর (*বিষ্লৃ ব্যাপ্তৌ,* জুহোত্যাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১০৯৫) উল্লেখ করা যায়। চতুর্থত, উজ্জ্বলকান্তিবিশিষ্ট হওয়ায় তিনি সর্বত্র আবিষ্ট অর্থাৎ এটিতেও √বিশ্-ধাতুর সংকেত পাওয়া যায়। প্রলয়কালে সকল ভূতের প্রবেশস্থান হিসাবে প্রবেশনার্থক √বিশ্-ধাতু থেকে 'বিষ্ণু' শব্দের উৎপত্তির জ্ঞান হয়। অন্তিম কারণ হিসাবে ক্রমণাত্' এই পঞ্চমীবিভক্ত্যন্ত শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়, যার অর্থ পাদবিক্ষেপ। এক্ষেত্রেও ব্যাপ্তি অর্থই ব্যঞ্জিত হয় ব্যাপ্ত্যর্থক √বিষ্-ধাতু উৎসরূপে অনুমেয়। অতএব সামগ্রিক পর্যালোচনা থেকে বলা যায় লাভার্থক √বিদ্-ধাতু ও প্রবেশনার্থক √বিশ্-ধাতু থেকে 'বিষ্ণু' শব্দের নিষ্পত্তিরূপ নির্বচন যাস্কীয় অতিপরোক্ষনির্বচনের দ্যোতক এবং ব্যাপ্ত্যর্থক √বিষ্-ধাতু থেকে বিষ্ণু শব্দের উৎপত্তি যাস্কীয় প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতির দৃষ্টান্ত কারণ ব্যাকরণ অনুসারে √বিষ্-ধাতুর উত্তর ঔণাদিক 'ণু'-প্রত্যয় যুক্ত করেই 'বিষ্ণু' পদটি সিদ্ধ হয়।

বৃষভেক্ষণ

'সাত্ত্বত' নামের নির্বচনের পর ভগবান কেশবের অপর এক নামের নিরুক্তি প্রদর্শিত হয়েছে, সেটি হল-

তস্মাদার্ষভাদ্ বৃষভেক্ষণ।[৭৮]

বেদকে 'আর্ষ' বলা হয়। সেই বেদে প্রকাশিত হওয়ায় তিনি 'আর্ষভ'। আর্ষভহেতু তাঁকে বৃষভেক্ষণ বলা হয়।

নির্বচনপদ্ধতি

'বৃষভেক্ষণ' নামের নির্বচন থেকে জ্ঞাত হওয়া যায় 'আর্ষভ' শব্দ থেকেই শব্দটির উৎপত্তির সংকেত প্রদান করা হয়েছে। ব্যুৎপত্তিকৃত শব্দের আদ্যংশের সাথে 'আর্ষভ' শব্দের কিঞ্চিৎ বর্ণাক্ষরগত সাদৃশ্য বিদ্যমান (আর্ষভ > বৃষভেক্ষণ) থাকায় এটি যাস্কাচার্য দ্বারা নির্দিষ্ট অতিপরোক্ষনির্বচন শ্রেণীর অন্তর্গত।

বৃষাকপি

শ্রীকৃষ্ণের এক বিশেষ নামান্তর হল 'বৃষাকপি'। বৃষাকপি শব্দের বৃষাকপিত্ব প্রতিষ্ঠাস্বরূপ শান্তিপর্বে বলা হয়েছে-

বৃষো হি ভগবান্ ধর্মঃ খ্যাতো লোকেষু ভারত!
নির্ঘণ্টুকপদাখ্যানে বিদ্ধি মাং বৃষমুত্তমম্।
কপির্বরাহঃ শ্রেষ্ঠশ্চ ধর্মশ্চ বৃষ উচ্যতে।
তস্মাদ্বৃষাকপিং প্রাহ কশ্যপো মাং প্রজাপতি।।[৭৯]

অর্থাৎ ভরতনন্দন! আমার স্বরূপভূত ভগবান 'ধর্ম' জগতে 'ধর্ম' নামে বিখ্যাত এবং বৈদিকশব্দকোষে ও নামসংগ্রহাভিধানে তুমি (অর্জুন) আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) উত্তম বৃষ বলে অবগত হও।

শ্রেষ্ঠ বরাহকে কপি এবং ধর্মকে বৃষ বলা হয়। অতএব কশ্যপ প্রজাপতি আমাকে 'বৃষাকপি' বলেন।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনস্থিত 'বৃষ' এবং 'কপি' এই দুই শব্দের সংযোগেই 'বৃষাকপি' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণই বৃষ আবার তিনিই কপি অতএব তিনি 'বৃষাকপি'। 'বৃষশ্চাসৌ কপিশ্চেতি' এইরূপ বিগ্রহ দ্বারা এবং বৃষ শব্দ দীর্ঘ প্রাপ্ত হয়ে কর্মধারয়সমাস নিষ্পন্ন হিসাবে 'বৃষাকপি' শব্দ উৎপন্ন হয়। সুতরাং বলা যায় পূর্বোক্ত নিরুক্তিটি যাস্কীয় প্রত্যক্ষনির্বচন পদ্ধতির অন্তর্গত।

শিপিবিষ্ট

ভগবান কেশব তাঁর 'শিপিবিষ্ট' নামের নির্বচনস্বরূপ বলেছেন-

শিপিবিষ্টেতি চাখ্যাযাং হীনরোমা চা যো ভবেৎ।
তেনাবিষ্টং তু যত্ কিঞ্চিৎশিপিবিষ্টেতি চ স্মৃতঃ।।[৮০]

অর্থাৎ 'শিপিবিষ্ট' এই আখ্যায় বলা হয়- যিনি রোমহীন অর্থাৎ নিরংশ, অখণ্ড তাঁকে 'শিপি' বলা হয়। এই শিপির দ্বারা নিরাকাররূপে জগতের সকল বস্তুতে আবিষ্ট হওয়ায় আমি 'শিপিবিষ্ট' নামে অভিহিত হই।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

শ্রীকৃষ্ণ শিপি দ্বারা আবিষ্ট হওয়ায় তাঁর আর এক নাম 'শিপিবিষ্ট'। যদিও নিরুক্তিটির বিশ্লেষণ থেকে শব্দটির ব্যুৎপত্তি বিষয়ে সহজেই অনুমান করা যায় তথাপি ভারতকৌমুদীকার শব্দটির ব্যুৎপত্তিস্বরূপ বলেছেন- "শিপিনা বিষ্ট ইতি ব্যুৎপত্তেঃ"[৮১] অর্থাৎ 'শিপি' শব্দপূর্বক √বিষ্-ধাতুর সাথে 'ক্ত'-প্রত্যয় যুক্ত করে শিপিবিষ্ট শব্দটি উৎপন্ন হয়। অতএব যাস্কীয়-প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতি অবলম্বনে নিরুক্তি করা হয়েছে।

শুচিশ্রবা

শান্তিপর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকৃত 'শুচিশ্রবা' শব্দের নির্বচনটি হল-

> শুচীনি শ্রবণীযানি শৃণোমীহ ধনঞ্জয!
> ন চ পাপানি গৃহ্নামি ততোঽহং বৈ শুচিশ্রবাঃ।।[৮২]

ধনঞ্জয়! আমি পবিত্র শ্রুতিমধুর স্তুতিবাক্য শ্রবণ করি কিন্তু পাপবাক্য গ্রহণ করিনা সেইজন্যই আমার নাম শুচিশ্রবা।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

'শুচিশ্রবা' শব্দের নির্বচনে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা শুচি অর্থাৎ শ্রুতিমধুর পবিত্র বাক্য শ্রবণ করেন সেইজন্য তাঁকে 'শুচিশ্রবা' বলা হয়। নির্বচন থেকে 'শুচি'-শব্দপূর্বক √শ্রু-ধাতুর উত্তর ঔণাদিক 'অসুন্'-প্রত্যয় যুক্ত করে শব্দটির ব্যুৎপত্তি করা যায়। অতএব বলা যায় শব্দটির ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারেই নির্বচন করা হয়েছে। এটি যাস্কীয়প্রত্যক্ষ-নির্বচনপদ্ধতির অন্তর্গত।

সত্য

শ্রীকৃষ্ণকে 'সত্য'ও বলা হয়। তিনি নিজেকে 'সত্য' নামে অভিহিত করার কারণ সম্বন্ধে বলেছেন-

> নোক্তপূর্বং মযা ক্ষুদ্রমশ্লীলং বা কদাচন।
> ঋতা ব্রহ্মাস্ততা সা মে সত্যা দেবী সরস্বতী।।
> সচ্চাসচ্চৈব কৌন্তেয! মযা বেশিতমাত্মনি।
> পৌষ্করে ব্রহ্মসদনে সত্যং মামৃষযো বিদুঃ।।[৮৩]

আমি পূর্বে কখনই নিকৃষ্ট বা অশ্লীল বাক্য বলিনি। আমার বাক্য সত্য ও ব্রহ্মাতনয়া ঋতাস্বরূপ। কুন্তিনন্দন! ব্রহ্মার বাসস্থান পদ্মযুক্ত আমার দেহে সৎ ও অসৎ অর্থাৎ জগতের সমস্ত কারণ ও কার্য স্থিত। অতএব ঋষিগণ আমাকে সত্য বলেন।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

পূর্বোক্ত 'সত্য' শব্দের নির্বচন প্রসঙ্গে ভারতকৌমুদীকারের অভিমত গ্রহণ করলে দেখা যায়- "সতো বিদ্যমানত্বাদেব সত্যং নাম ইত্যাশযঃ"।[৮৪] অতএব 'সৎ + যৎ = সত্য'- এইভাবে শব্দটি সিদ্ধ করা যায়। ব্যাকরণগত সংস্কার অনুসরণ করায় এটি প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতির অন্তর্গত।

সর্ব

উদ্যোগপর্বে পুরুষোত্তম ও সর্ব শব্দের নির্বচন একত্রে প্রদর্শিত হয়েছে। 'সর্ব' নামের নিরুক্তিস্বরূপ বলা হয়েছে-

> অসতশ্চ সতশ্চৈব সর্বস্য প্রভবাপ্যযাত্।

সর্বস্য চ সদা জ্ঞানাত্ সর্বমেতং প্রচক্ষতে।।[৮৫]

তিনি সৎ ও অসৎ সকলের উৎপত্তি ও লয়ের স্থান এবং সর্বদা তাঁদের জানেন তাই তিনি সর্ব।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

'সর্ব' শব্দের নির্বচনে দেখা যায় তিনিই সবকিছুর উৎপত্তি ও লয়স্থান, তিনিই সবকিছুর জ্ঞাতা হওয়ায় 'সর্ব' এই নামে প্রসিদ্ধ। জ্ঞান ও গতি সমানার্থক হিসাবে পরিগণিত হয় অর্থাৎ গত্যর্থক √সৃ-ধাতুর (*সৃ গতৌ*, ভ্বাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ৯৩৫) সহিত 'ব'-প্রত্যয় সংযোগ করে 'সর্ব' শব্দ নিষ্পন্ন করা যায়। এটি ব্যাকরণগত শব্দগঠন প্রক্রিয়া অবলম্বন করায় নিঃসন্দেহে প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতির অন্তর্গত।

সাত্ত্বত

'জনার্দন' শব্দের নির্বচনের পর ভগবান কেশবের অপর এক নামের নিরুক্তি প্রদর্শিত হয়েছে, সেটি হল-

যতঃ সত্ত্বান্ন চ্যবতে যচ্চ সত্ত্বান্ন হীযতে।
সত্ত্বতঃ সাত্ত্বতঃ।।[৮৬]

যেহেতু তিনি কোনোদিন সত্ত্বগুণ থেকে চ্যুত হননি, কখনো সত্ত্ব থেকে আলাদা হননি, তাই সদ্ভাবের সাথে সম্বন্ধিত হওয়ায় তিনি সত্ত্বত ও সাত্ত্বত।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

'সাত্ত্বত' শব্দের নিরুক্তির বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় তিনি গুণত্রয়ের মধ্যে তিনি সত্ত্বগুণের অধিকারী। সত্ত্বগুণের সাথে তাঁর সর্বদা সম্বন্ধ বিদ্যমান। অতএব 'সাত্ত্বত' নামের মূল হিসাবে 'সত্ত্ব' শব্দের সংকেত পাওয়া যায়। 'সত্ত্বমস্যাস্তি ইতি' এই বিগ্রহ দ্বারা 'সত্ত্ব' শব্দের সাথে মত্বর্থে 'ত'-প্রত্যয় যুক্ত করে 'সত্ত্বত' এই রূপ পাওয়া যায়। অতঃপর 'সত্ত্বত' শব্দের সাথে স্বার্থে 'অণ্'-প্রত্যয় যুক্ত করে 'সাত্ত্বত' এই রূপ সিদ্ধ হয়। সুতরাং অনুমান করা যায় প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতির আশ্রয় নিয়েই শব্দটি নিরুক্তি করা হয়েছে।

শান্তিপর্বেও 'সাত্ত্বত' শব্দের নির্বচন লক্ষ্য করা যায়, সেখানে বলা হয়েছে -

সত্ত্বান্ন চ্যুতপূর্বোঽহং সত্ত্বং বৈ বিদ্ধি মৎকৃতম্।
জন্মনীহাভবত্ সত্ত্বং পৌর্বিকং মে ধনঞ্জয়।।
নিরাশীঃ কর্মসংযুক্তঃ সত্ত্বতশ্চাপ্য কল্মষঃ।
সত্ত্বতজ্ঞানদৃষ্টোঽহং সত্ত্বতামিতি সাত্ত্বতঃ।।[৮৭]

ধনাঞ্জয়! আমি পূর্বে কখনো সত্ত্ব অর্থাৎ অধ্যবসায় থেকে চ্যুত হইনি অথবা সমস্ত সত্ত্ব মৎকৃত বলেই অবগত হও অথবা আমার এই জন্মেও পূর্ব জন্মের সত্ত্ব এসেছে। আমি নিষ্কাম কর্ম করি। নিষ্পাপ পুরুষের নাম সত্ত্বত। সেই সত্ত্বত পুরুষেরা জ্ঞানদৃষ্টিতে আমাকে দেখে থাকেন আর যজ্ঞাদি কর্মের সময় যারা সত্ত্বগুণ বিস্তার করেন তাঁরা সত্ত্বৎ, তাঁদের এই অর্থে আমি সাত্ত্বত।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

উদ্যোগপর্বের ন্যায় এখানেও 'সাত্ত্বত' শব্দের নির্বচনে 'সত্ত্ব অস্যাস্তি' এই বিগ্রহ দ্বারা 'সত্ত্ব' শব্দের সাথে অস্ত্যর্থে 'ত'-প্রত্যয় যুক্ত করে 'সত্ত্বত' এই রূপ পাওয়া যায়। তারপর 'সত্ত্বত' শব্দের সাথে 'অণ্'-প্রত্যয় যুক্ত করে 'সাত্ত্বত' এই রূপ সিদ্ধ হয়। সুতরাং অনুমান করা যায় প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতির আশ্রয় নিয়েই শব্দটি নিরুক্তি করা হয়েছে।

হরি

ভগবান কৃষ্ণ কর্তৃক শান্তিপর্বে উল্লিখিত 'হরি' নামের অর্থ হল-

> ইলোপহূতে যোগেন হরে ভাগং ক্রতুষ্বহম্।
> বর্ণশ্চ মে হরিশ্রেষ্ঠস্তস্মাদ্ধরিরহং স্মৃতঃ।।[৮৮]

অর্থাৎ যজ্ঞে বাক্য দ্বারা আমার আহ্বান করা হয় তখন আমি যজ্ঞের ভাগ হরণ করি অথবা আমার দেহের বর্ণ হরিন্মণির ন্যায় উৎকৃষ্ট এইজন্য আমি 'হরি' বলে কথিত।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনে বিদ্যমান 'হরে' এই ক্রিয়াপদের অর্থ 'হরণ করি', যার প্রতিশব্দ 'হরামি'। অতএব হরণার্থক √হৃ-ধাতু থেকে 'হরি' শব্দের উৎপত্তি সংকেতিত হয়েছে (√হৃ-ধাতু + 'ইন্' প্রত্যয় = হরি)। ব্যাকরণপদ্ধতি অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এটি যাস্কাচার্যের প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। 'হরি' নামের দ্বিতীয় কারণ হল হরিৎ মণির ন্যায় শ্রেষ্ঠ তাঁর বর্ণ অর্থাৎ হরিৎ শব্দই হরি নামের মূল। এখানে অন্ত্যবর্ণ লুপ্ত হওয়ায় নির্বচনটি পরোক্ষনির্বচনপদ্ধতির অনুসারী।

৪.২.১.৩. উপসংহার

*মহাভারতে*র উদ্যোগ ও শান্তি পর্বে শ্রীকৃষ্ণের নানা মহিমান্বিত নামের অর্থ প্রদর্শনের জন্য যে নির্বচনের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে তা এককথায় অনন্য। নির্বচনগুলি সুনিপুণ ও সুপ্রসিদ্ধ উপায়ে ভগবান্ কেশবের বিবিধ রূপের পরিচয় প্রদান করেছে। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ এবং অতিপরোক্ষ এই তিন যাস্কীয় নির্বচনসিদ্ধান্ত অনুসারে নিরুক্তিগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় *মহাভারতে* তাঁর নির্বচনসিদ্ধান্তের সঠিক প্রয়োগ বিদ্যমান। তবে ওপর দুই পদ্ধতি অপেক্ষায় প্রত্যক্ষ-নির্বচনপদ্ধতির অধিক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এতে গ্রন্থকারের শব্দশাস্ত্র বিষয়ে দক্ষতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

তথ্যপঞ্জি

[১] রামকুমার রায় (সম্পা), *বৃহদ্দেবতা* ১/৯১, পৃষ্ঠাঙ্ক ২২।
[২] *তদেব* ২/২৪, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৭।
[৩] *তদেব* ২/৪৬, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৩।
[৪] *তদেব* ২/৩৫, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪০।
[৫] *তদেব* ২/৩৬, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪০।
[৬] *তদেব* ৩/৯, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৭।
[৭] *তদেব* ১/৯৪, পৃষ্ঠাঙ্ক ২৩।
[৮] *তদেব* ২/৬৫, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৮।
[৯] *তদেব* ৪/৭৮, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৩২।
[১০] *তদেব* ১/৯২, পৃষ্ঠাঙ্ক ২২।
[১১] *তদেব* ২/৩০, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৮।
[১২] *তদেব* ২/৩১, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৮।
[১৩] *তদেব* ৩/১, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৪।

[১৪] *তদেব* ৩/১৬, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৯।
[১৫] *তদেব* ২/৫৭, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৬।
[১৬] *তদেব* ৩/২, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৫।
[১৭] *তদেব* ২/৩৭, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪০।
[১৮] *তদেব* ২/৩৮, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪১।
[১৯] *তদেব* ২/২৯, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৮।
[২০] *তদেব* ২/৬৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৮।
[২১] *তদেব* ২/২৬, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৭।
[২২] *তদেব* ২/৩৯, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪১।
[২৩] *তদেব* ২/৪০, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪১।
[২৪] *তদেব* ৫/১৫৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৭৭।
[২৫] *তদেব* ২/৬০, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৭।
[২৬] *তদেব* ২/৪৮, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৩।
[২৭] *তদেব* ২/৩৪, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৯।
[২৮] *তদেব* ২/৩৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৯।
[২৯] *তদেব* ৫/১৫, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৫১।
[৩০] *তদেব* ২/৪৫, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪২।
[৩১] *তদেব* ২/৩২, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৯।
[৩২] *তদেব* ২/৫০, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৪।
[৩৩] *তদেব* ২/৬৬, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৮।
[৩৪] *তদেব* ২/৬৯, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৯।
[৩৫] *তদেব* ২/৫২, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৪।
[৩৬] *তদেব* ২/৫১, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৪।
[৩৭] *তদেব* ২/৬২, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৭।
[৩৮] *মহাভারতম্* (বিশ্ববাণী প্রকাশনী) ৩২৮/২৬৭, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৬৬৭।
[৩৯] *তদেব* ৬৬/৪৫, পৃষ্ঠাঙ্ক ৬৮৪।
[৪০] *তদেব* ৩২৮/২৬০, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৬৬৫।
[৪১] *তদেব* ৬৬/৫৬, পৃষ্ঠাঙ্ক ৬৮৫।
[৪২] *তদেব* ৩২৮/২৭৬, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৬৬৯।
[৪৩] *তদেব* ৩২৮/২৫৫, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৬৬৩।
[৪৪] তত্রৈব।
[৪৫] *মহাভারতম্* (বিশ্ববাণী প্রকাশনী) ৩২৮/২৭৮, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৬৬৯।
[৪৬] তত্রৈব।
[৪৭] *মহাভারতম্* (বিশ্ববাণী প্রকাশনী) ৬৬/৫১, পৃষ্ঠাঙ্ক ৬৮৩।
[৪৮] *তদেব* ৩২৮/২৬৫, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৬৬৬।
[৪৯] *তদেব* ৩৭৮/৪৫, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৬২৩।
[৫০] *তদেব* ৩২৮/৩০১, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৬৭৪।
[৫১] *তদেব* ৬৬/৬০, পৃষ্ঠাঙ্ক ৬৮৬।
[৫২] *তদেব* ৩২৮/২৫৬, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৬৬৪।
[৫৩] *তদেব* ৩২৮/২৭১, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৬৬৮।

[৫৪] *তদেব* ৬৬/৫২, পৃষ্ঠাঙ্ক ৬৮৩।
[৫৫] *তদেব* ৬৬/৫৯, পৃষ্ঠাঙ্ক ৬৮৬।
[৫৬] *তদেব* ৩২৮/২৭৯, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৬৬৯।
[৫৭] *তদেব* ৬৬/৫৪, পৃষ্ঠাঙ্ক ৬৮৪।
[৫৮] *তদেব* ৩২৭/৪১, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৬২২।
[৫৯] *তদেব* ৩২৮/২৯২, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৬৭৩।
[৬০] *তদেব* ৬৬/৫৬, পৃষ্ঠাঙ্ক ৬৮৫।
[৬১] *তদেব* ৩২৭/৩৭, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৬২০।
[৬২] তত্রৈব।
[৬৩] *মহাভারতম্* (বিশ্ববাণী প্রকাশনী) ৬৬/৫২, পৃষ্ঠাঙ্ক ৬৮৩।
[৬৪] *তদেব* ২০৭/৩৭, পৃষ্ঠাঙ্ক ২০৫৩।
[৬৫] *তদেব* ৬৬/৫৭, পৃষ্ঠাঙ্ক ৬৮৫।
[৬৬] *তদেব* ৩২৭/৪২, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৬২৩।
[৬৭] *তদেব* ৬৬/৫০, পৃষ্ঠাঙ্ক ৬৮২।
[৬৮] তত্রৈব।
[৬৯] *তদেব* ২০১/১৬, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৯৭১।
[৭০] *তদেব* ৩২৮/২৯৭, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৬৭৩।
[৭১] *তদেব* ৬৬/৪৯, পৃষ্ঠাঙ্ক ৬৮১।
[৭২] *তদেব* ৩২৭/৩৮, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৬২০।
[৭৩] *তদেব* ৩২৮/২৮০, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৬৬৯।
[৭৪] তত্রৈব।
[৭৫] *মহাভারতম্* (বিশ্ববাণী প্রকাশনী) ৬৬/৪৯, পৃষ্ঠাঙ্ক ৬৮১।
[৭৬] *তদেব* ৬৬/৫৯, পৃষ্ঠাঙ্ক ৬৮৬।
[৭৭] *তদেব* ৩২৭/৩৯-৪০, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৬২১।
[৭৮] *তদেব* ৬৬/৫৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ৬৮৩।
[৭৯] *তদেব* ৩২৮/২৭৪-২৭৫, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৬৬৮।
[৮০] *তদেব* ৩২৮/২৫৭, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৬৬৪।
[৮১] তত্রৈব।
[৮২] *তদেব* ৩২৮/২৭৭, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৬৬৯।
[৮৩] *তদেব* ৩২৮/২৬১-২৬২, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৬৬৫।
[৮৪] তত্রৈব।
[৮৫] *তদেব* ৬৬/৫৮, পৃষ্ঠাঙ্ক ৬৮৬।
[৮৬] *তদেব* ৬৬/৫৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ৬৮৩।
[৮৭] *তদেব* ৩২৮/২৬৩-২৬৪, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৬৬৫।
[৮৮] *তদেব* ৩২৮/২৫৪, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৬৬৩।

***

পঞ্চম অধ্যায়

বেদমীমাংসা ও *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থে নির্বচন

৫.০. ভূমিকা

বৈদিক যুগের মূল সাহিত্যসম্ভার চতুর্বেদাদিশাস্ত্রে দুরূহ ঋষিচিন্তনের তথাকথিত উষর ভূমিতে নির্বিঘ্ন অবতরণের মাধ্যম হিসাবে নির্বচন পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়, যা বেদব্যাখ্যার ধারাকে আরও সহজ ও প্রাঞ্জল রূপ প্রদান করে। এই পদ্ধতি শুধু তৎকালীন সাহিত্যেরই অঙ্গ ছিলনা, পরবর্তী লৌকিকসাহিত্য অবধি এর অবিচ্ছিন্ন ধারা প্রবাহিত হয়েছে এবং এই প্রবহমানতাকে আরও গতি প্রদান করেছে উনবিংশ শতকে ভারতীয় মনীষীদের বেদব্যাখ্যায় নির্বচনের প্রয়োগ-বৈশিষ্ট। তাঁদের মধ্যে দুই অন্যতম প্রণম্য ও সর্বাগ্রগণ্য হলেন শ্রীমৎ অনির্বাণ মহোদয় এবং স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। *বেদমীমাংসা* গ্রন্থের রচয়িতা হলেন শ্রীমৎ অনির্বাণ এবং স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী মহোদয় *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থ রচনা করেন। উভয় গ্রন্থের বেদব্যাখ্যায় প্রাপ্ত নির্বচন আলোচ্য শোধপ্রবন্ধের আকরস্বরূপ।

প্রাথমিকভাবে গ্রন্থকার ও গ্রন্থ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর বিবেচ্য বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে-

৫.১. গ্রন্থপরিচয়

শ্রীমৎ অনির্বাণের এক অনন্য সৃষ্টি হল *বেদমীমাংসা* গ্রন্থ। এটি তিনটি খণ্ডে ও তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে বেদব্যাখ্যার পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা বিদ্যমান। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৈদিক সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ের আনুমানিক অর্ধাংশ আলোচিত হয়েছে। এখানে বৈদিক দেবতাদের সাধারণ পরিচয় এবং পৃথিবী ছাড়া পৃথিবীস্থান দেবতাদের বিস্তৃত বিবরণ লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয় খণ্ড পৃথিবীস্থান দেবতাদের স্বরূপ আলোচনার প্রসঙ্গ শেষ করে অন্তরিক্ষস্থান দেবতাদের প্রধান তথা বৈদিকদের পরম দেবতা ইন্দ্রদেবের স্বরূপ আলোচনাতেই সমৃদ্ধ হয়েছে।

৫.১.১. *বেদমীমাংসা* গ্রন্থে নির্বচন

বেদমীমাংসা গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে অর্থাৎ সমগ্র তৃতীয় অধ্যায়ে বৈদিক দেবতা বিষয়ে আলোচনাকালে এমন কিছু শব্দ পাওয়া যায়, যেগুলি যৌগিক এবং পারিভাষিক উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হয়। এইরকম শব্দের প্রয়োগ সুপ্রচুর হওয়ায় তাদের তাৎপর্যনির্ণয়ে নিরুক্তি একটা প্রধান অবলম্বন। যদিও আচার্য অনির্বাণ *বেদমীমাংসা* নামক বেদব্যাখ্যামূলক গ্রন্থটি বঙ্গভাষায় রচনা করায় (দেবতার বিশেষণমূলক) শব্দগুলির নিরুক্তি বাংলাভাষাতেই প্রদর্শিত হয়েছে। নিরুক্তি বা ব্যুৎপত্তিগুলির সামগ্রিক বিশ্লেষণ দ্বারা শব্দগুলির উৎসসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাক-

অবিতা

রক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ দেবতার আর এক বিশেষণ হল 'অবিতা'। এই নামের কারণ সম্পর্কে *বেদমীমাংসা* গ্রন্থে বলা হয়েছে-

> পরম মমতায় আমাদের আগলে আছেন বলে অবিতা।[১]

বিমর্শ

নিরুক্তিস্থিত 'আগলে আছেন' এই বাক্যাংশের অর্থ হল 'রক্ষা করেন'। 'অবিতা' শব্দস্থিত √অব্-ধাতুর অর্থ রক্ষা করা অর্থাৎ রক্ষণার্থক √অব্-ধাতু থেকে 'অবিতা' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। দেবতা আমাদের রক্ষা করেন তাই তিনি 'অবিতা'।

অসুর

'অসুর' হল দেবতার অতিপ্রাচীন এক সাধারণ সংজ্ঞা। এই বিশেষণের কারণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

> স্থাণুত্ব এবং চরিষ্ণুতা তাঁর মধ্যে এক হয়ে আছে বলে তিনি অসুর।[২]

বিমর্শ

দেবতার নিজের মধ্যেই নিজেকে ধারণ করা বা অবস্থান করা হল 'স্থাণুত্ব' এবং বিবিধ সৃষ্টিরূপে বর্ধন বা বিচরণশীলতাকে গ্রন্থকার 'চরিষ্ণুতা' শব্দ দ্বারা অভিহিত করেছেন। এই দুই গুণ একীভূত হয়ে বিদ্যমান থাকায় দেবতাকে 'অসুর' সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। শ্রীমৎ অনির্বাণ 'অসু' শব্দের সাথে অস্ত্যর্থে 'র'-প্রত্যয় যোগে 'অসুর' শব্দের উৎপত্তি সিদ্ধ করেছেন, যেখানে 'অসু'-শব্দ √অস্-ধাতু থেকে নিষ্পন্ন এবং √অস্-ধাতুর অর্থ নিক্ষেপ করা ও বিকিরণ করা। এছাড়াও √অস্-ধাতুর দ্বারা 'থাকা'র ব্যঞ্জনাও স্বীকার করেছেন – অসু (< √অস্ 'নিক্ষেপ করা, বিকিরণ করা'; √অস্ 'থাকা'র ব্যঞ্জনাও আছে) + অস্ত্যর্থে 'র'।

অসুর

দেবতাদের অসুরত্ব প্রতিপাদনস্বরূপ শ্রীমৎঅনির্বাণ বলেছেন-

> শব্দটির ব্যুৎপত্তি বিক্ষেপার্থক 'অস্' ধাতু হতে, যা থেকে প্রাণবাচী 'অসু' শব্দ এসেছে।[৩]

বিমর্শ

'অসুর' শব্দের মূল হিসাবে গ্রন্থকার *অসু ক্ষেপণে* ধাতুর উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে √অস্-ধাতু থেকে 'অসু' নামক প্রাণবাচক শব্দেরও উৎপত্তি হয়েছে (√অস্-ধাতু + উন্ = অসু)।

আদিত্য

শ্রীমৎঅনির্বাণ *বেদমীমাংসা* গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে বৈদিক দেবতা বিষয়ে আলোচনাকালে প্রথমেই দেবতার স্বরূপ সম্পর্কে আলোকপাত করেন। সেখানে আকাশের সূর্যকে দেবতার স্বরূপ জ্যোতির প্রতীক বলা হয়েছে এবং অখণ্ডিতা, অবন্ধনা অদিতির পুত্র হিসাবে পরিচয় জ্ঞাপন করে বলা হয়েছে-

> সূর্য আদিত্য কিনা অদিতির পুত্র। অদিতি সংজ্ঞার অর্থ অখণ্ডিতা, অবন্ধনা।[৪]

বিমর্শ

গ্রন্থকার সূর্যের আদিত্য নামের হেতুস্বরূপ বলেছেন আনন্ত্যস্বরূপিণী আকাশ যাঁর প্রতীক সেই অদিতির পুত্র হওয়ায় সূর্য 'আদিত্য'। ব্যাকরণগত শব্দগঠন-প্রক্রিয়া অনুযায়ী 'অদিতি' শব্দের সাথে অপত্যার্থে 'ঞ্য'-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে

'আদিত্য' শব্দটি উৎপন্ন হয়, যার অর্থ 'অদিতির পুত্র'। অতএব বলা যায় *বেদমীমাংসা* গ্রন্থের প্রণেতা 'আদিত্য' শব্দের অভিপ্রেত অর্থ প্রাপ্তির জন্য ব্যাকরণের সহায়তা নিয়েছেন।

ঈশান

তাঁর (একব্রাত্য মহাদেবের) 'ঈশান' নামের কারণ হিসাবে বলেছেন-

> তিনি দেবতাদের ঈশ্বরত্ব লাভ করলেন। (তাইতো) তিনি ঈশান হলেন।[৫]

বিমর্শ

মহাদের আর এক নাম 'ঈশান' কারণ তিনি দেবতাদেরও ঈশ্বর। অতএব *ঈশ ঐশ্বর্যে* ধাতু থেকে 'ঈশান' নামের উৎপত্তি অনুমান করা যায় (√ঈশ্-ধাতু + 'চানশ্'-প্রত্যয় = ঈশান)।

উর্বশী

অনিবাধ বৈপুল্যের সংজ্ঞাবাচক বিভিন্ন শব্দের ব্যাখ্যাবসরে 'উর্বশী' শব্দ গৃহীত হয়েছে। গ্রন্থকার শব্দটির অর্থ করেছেন-

> উরু বা বৈপুল্যকে অধিকার করে আছেন যিনি তিনি উর্বশী।[৬]

বিমর্শ

'বৈপুল্যের অধিকারী' শব্দের সমানার্থক শব্দ ব্যাপ্ত্যকারী। উরু বা বৈপুল্যের অধিকারী অর্থাৎ ব্যাপ্তকারী এক অজ্ঞাতনাম্নী দেবী হলেন 'উর্বশী'। অতএব 'উরু' শব্দপূর্বক ব্যাপ্ত্যর্থক √অশ্-ধাতু (*অশূঙ্ ব্যাপ্তৌ*) থেকে 'উর্বশী' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে।

ঋতবান্

বেদমীমাংসা গ্রন্থে বিদ্যমান দেবতার এক অন্যতম বিশেষণ হল 'ঋতবান্'। দেবতাদের ঋতবান্ বলার কারণ হিসাবে গ্রন্থকার বলেছেন-

> এথেকেই (অনাদি স্থিতি থেকেই) তাঁর বিসৃষ্টি বা উপচে পড়া- ঋতের ছন্দে, যেমন নিসর্গে দেখি 'ঋতু'-চক্রের আবর্তনে; অতএব তিনি 'ঋতবান্'।[৭]

বিমর্শ

ঋতের ছন্দে অনাদি স্থিতি থেকে দেবতার বিবিধ সৃষ্টিরূপ চরিষ্ণুতা গুণের জন্যই তাঁকে 'ঋতবান্' বলা হয়েছে। 'ঋতমস্যাস্তি'- এই বিগ্রহবাক্য দ্বারা অস্ত্যর্থে মতুপ্-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'ঋতবান্' শব্দ নিষ্পন্ন হয়।

কবি

দৃশ্যমান জগৎ হল কাব্য। এই শব্দময় কাব্যের কবি হিসাবে *বেদমীমাংসা*-কার দেবতাকে বিশেষিত করেছেন। হেতুস্বরূপ বলেছেন-

> তাঁর (দেবতার) দৃষ্টি সৃষ্টির আকূতিতে প্রসর্পিত, তাই তিনি কবি।[৮]

বিমর্শ

'কবি'-শব্দের নির্বচন থেকে অনুমান করা যায় √কু-শব্দে ধাতু থেকে 'কবি' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। √কু-ধাতুর সাথে 'ইন্'-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'কবি' এই রূপটি সিদ্ধ হয়।

কবিক্রতু

দেবতার কর্মভিত্তিক বিশেষণগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখের দাবি রাখে 'কবিক্রতু' শব্দ। শ্রীমৎ অনির্বাণকৃত এই শব্দের ব্যুৎপত্তিটি হল-

> তাঁর (দেবতার) ক্রান্তদর্শী কবিচেতনা এই ক্রতুর উৎস বলে তিনি কবিক্রতু।[৯]

বিমর্শ

গ্রন্থকারের মতে দেবতা সূর্যের ন্যায় আলো ও তাপবিশিষ্ট। তাঁর এই তাপ বা তপঃ হল চিৎ-শক্তি, যেটি ক্রতু নামেও অভিহিত হয়েছে। ক্ষিতিশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'ক্রতু' শব্দের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বলেছেন- "ক্রতু from কৃ to do means strength, power, might."[১০] অর্থাৎ তাঁর মতে 'ক্রতু' শব্দের অর্থ 'শক্তি', 'সামর্থ্য' বা 'ক্ষমতা'। 'কবি' শব্দের অর্থ 'জ্ঞানী' বা 'ক্রান্তদর্শী'। দেবতার কবিচেতনাই তাঁর তপঃ-রূপ চিৎ-শক্তির উৎস। অতএব 'কবি' ও 'ক্রতু' শব্দদ্বয় যুক্ত হয়ে 'কবিক্রতু' শব্দ উৎপন্ন হয়েছে। 'কবিঃ ক্রতুর্যস্য সঃ' এইরূপ বিগ্রহবাক্য করে বহুব্রীহিসমাস দ্বারা শব্দটি পাওয়া যায়।

কেতু

দেবতা-অগ্নির কেতুত্ব নির্ধারণস্বরূপ *বেদমীমাংসা* গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে বলেছেন-

> এমনি করে উৎসর্গভাবনায় সবার জীবনকে চিন্ময় করেন তিনি, তাই তিনি বিশ্বের 'কেতু'।[১১]

বিমর্শ

তিন লোকে অগ্নির আততন সকলের জীবনকে চিন্ময় করে তোলে। সেইজন্য তিনি 'কেতু' নামে প্রসিদ্ধ। তদনুসারে *চিতি সংজ্ঞানে* ধাতু থেকে 'কেতু' শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনুমান করা যায় (√চিত্-ধাতু > কেতু)।

ক্ষিতি

পৃথিবীর মৃন্ময়ীরূপে অপর এক সাধারণ সংজ্ঞা ক্ষিতি। শব্দটির অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন-

> 'ক্ষিতি'- যাতে সবার 'নিবাস'।[১২]

বিমর্শ

সকলের বাসস্থান বা নিবাস হওয়ায় 'ক্ষিতি' এই নাম। অতএব নিবাসার্থক √ক্ষি-ধাতু (*ক্ষি নিবাসগত্যোঃ*) থেকে 'ক্ষিতি' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। √ক্ষি-ধাতুর উত্তর 'ক্তিন্'-প্রত্যয় যোগ করে এটি নিষ্পন্ন হয় (√ক্ষি-ধাতু + 'ক্তিন্' = ক্ষিতি)।

চিত্রভানু

দেবতা অগ্নির এক অন্যতম বিশেষণ 'চিত্রভানু'। এই নামের কারণ প্রসঙ্গে অনির্বাণাচার্য বলেছেন-

> চিন্ময় সূর্যের মতো চোখের সামনে তিনি (অগ্নি) অপাবৃত করলেন তাঁর ভানু। তাই তিনি চিত্রভানু।[১৩]

বিমর্শ

চিত্তিতে যা অনুভূত হয় সেটি-ই চিত্র। অগ্নি তাঁর ভানু অপাবৃত করলেন অর্থাৎ চিত্রিত করলেন। সেইহেতু তিনি 'চিত্রভানু'। সমাসবদ্ধ পদ হিসাবে চিত্র ও ভানু শব্দ যুক্ত হয়ে শব্দটি ব্যুৎপন্ন করা যায় (চিত্র + ভানু = চিত্রভানু)।

জাতবেদা

আচার্য অনির্বাণ অগ্নি দেবতার স্বরূপ, গুণ ও কর্ম সম্বন্ধে বর্ণনাকালে যজ্ঞের প্রথমে আবির্ভূত দিব্য অগ্নির এক বিশিষ্ট সংজ্ঞা উল্লেখ করেন, সেটি হল 'জাতবেদা'। তাঁর এই নামের কারণ হিসাবে বলেছেন-

> দেবলোকে পিতৃলোকে বা মর্ত্যলোকে যা কিছু জাত বা প্রাদুর্ভূত হয়, তাকে যিনি জানেন তিনি জাতবেদা।[১৪]

বিমর্শ

যা কিছু জন্মায় বা উৎপন্ন হয় সেই জাত সকলের জ্ঞাতা হলেন অগ্নি দেবতা। তাই তিনি 'জাতবেদা' (জাতবেদস্)। অতএব 'জাত' শব্দপূর্বক জ্ঞানার্থক √বিদ্-ধাতু (*বিদ জ্ঞানে* ধাতু) থেকে 'জাতবেদা' শব্দের উৎপত্তি সংকেত পাওয়া যায়।

ধীর

জ্ঞানবান্ হিসাবে দেবতার ওপর এক বিশেষণ হল 'ধীর'। এই শব্দের অর্থপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলেছেন-

> নিখিল ধী বা বিজ্ঞানের উৎস বলে তিনি ধীর।[১৫]

বিমর্শ

'ধী অস্যাস্তি ইতি'- এইরূপ ব্যুৎপত্তি দ্বারা অস্ত্যর্থে 'ধী'-শব্দের সাথে 'র'-প্রত্যয় যুক্ত করে 'ধীর' শব্দ ব্যুৎপন্ন হয়।

পুরুষ্টুত

ইন্দ্রদেবের সর্বজনীনত্ব বা প্রাধান্যের জ্ঞাপক দুই বিশেষণ 'পুরুহূত' ও 'পুরুষ্টুত'। অন্তিরিক্ষস্থান দেবতাদের সাধারণ পরিচয় প্রদর্শনের সময় এই দু'টি বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে। 'পুরুষ্টুত' শব্দের অর্থ করেছেন-

> (পুরুহূত শব্দের) অনুরূপ আর একটি বিশেষণ হল 'পুরুষ্টুত'- সবাই যাঁর স্তব গায়।[১৬]

বিমর্শ

সকলের দ্বারা ইন্দ্র স্তুত হন, সবাই তাঁর স্তুতি করেন তাই তিনি 'পুরুষ্টূত'। 'পুরু'-শব্দপূর্বক স্তুত্যর্থক √স্তু-ধাতু থেকে 'পুরুষ্টূত' নামের উৎপত্তির সন্ধান পাওয়া যায়।

পুরুহূত

ইন্দ্রদেবের সর্বজনীনত্ব বা প্রাধান্যের জ্ঞাপক দুই বিশেষণ 'পুরুহূত' ও 'পুরুষ্টুত'। অন্তরিক্ষস্থান দেবতাদের সাধারণ পরিচয় প্রদর্শনের সময় এই দু'টি বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে। 'পুরুহূত' শব্দের অর্থ করেছেন-

ইন্দ্রের একটি বহুপ্রযুক্ত বিশেষণ হল 'পুরুহূত'- অনেকে বা সবাই যাঁকে ডাকে।[১৭]

বিমর্শ

সকলেই তাঁকে আহ্বান করায় ইন্দ্র-দেব 'পুরুহূত' নাম প্রাপ্ত হন। এখানে 'পুরু' এই শব্দ √হ্বেঞ্-ধাতুর সাথে যুক্ত হয়ে শব্দটির উৎপত্তির সহায়ক হয়।

পুরোহিত

অগ্নি দেবতার স্বরূপ, গুণ ও কর্ম বিষয়ে আলচনাকালে তাঁর পুরোহিতত্ব বর্ণনায় বলা হয়েছে-

> মুখ্য আধান হল গুহাশয়ন হতে তাঁকে চেতনার পুরোভাগে স্থাপন করা অর্থাৎ তাঁর সম্পর্কে নিত্য সচেতন থাকা। অগ্নি তখন আমাদের জীবন-যজ্ঞের পুরোহিত।[১৮]

বিমর্শ

চেতনার পুরোভাগে স্থাপিত অগ্নি মানবের জীবন রূপ যজ্ঞের 'পুরোহিত'। অতএব 'পুরস্' এই অব্যয় পূর্বক √স্থা-ধাতুর সহিত 'ক্ত'-প্রত্যয় সংযোগে 'পুরোহিত' শব্দের উৎপত্তি সিদ্ধ হয় (পুরস্- √স্থা ধাতু + ক্ত = পুরোহিত)।

পৃশ্নি

শ্রীমৎঅনির্বাণ মরুদ্-গণের বর্ণনার সময় তাঁদের 'পৃশ্নিমাতর' এই অভিধায় অভিহিত করেছেন। 'পৃশ্নি'-শব্দের অর্থপ্রসঙ্গে নিরুক্তস্থিত অর্থকে সমীচীন মনে করে বলেছেন-

> আকাশ এবং আলো অথবা আকাশভরা আলো সব-কিছুকে ছুঁয়ে আছে, জড়িয়ে আছে; তাই আদিত্য এবং দ্যৌঃ 'পৃশ্নি'।[১৯]

বিমর্শ

'ছুঁয়ে থাকা' এই ক্রিয়াপদের দ্বারা 'স্পর্শ করা' অর্থ দ্যোতিত হয়। অতএব √স্পৃশ্-ধাতু থেকে 'পৃশ্নি' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে (√স্পৃশ্-ধাতু + নি-প্রত্যয় = পৃশ্নি)। এছাড়াও 'জড়িয়ে আছে' ক্রিয়াপদের অর্থ 'ব্যাপ্ত করে আছে'। সুতরাং 'প্র' এই উপসর্গপূর্বক ব্যাপ্ত্যর্থক √অশ্-ধাতু থেকেও শব্দটি ব্যুৎপাদিত হয় (প্র- √অশ্-ধাতু > পৃশ্নি)।

প্রচেতাঃ (প্রচেতস্)

অন্তরিক্ষস্থান বর্গের দেবতাসমূহের পরিচয় প্রদানে ব্যাপৃত শ্রীমৎঅনির্বাণ রুদ্রদেবতাকে প্রচেতাঃ নামে উল্লেখ করে, এই নামকরণের হেতু প্রদর্শন করেছেন, তাঁর উক্তিটি হল-

> তিনি (রুদ্র) 'প্রচেতাঃ'- চেতনার সমুদ্রবৎ বিস্ফারণ।[২০]

বিমর্শ

চেতনার সমুদ্রের ন্যায় বিস্ফারণ ঘটায় রুদ্র-দেব 'প্রচেতস্' বা 'প্রচেতাঃ' অর্থাৎ প্রকৃষ্ট চেতনার অধিকারী হওয়ায় এই নাম তিনি প্রাপ্ত হন। সুতরাং 'প্র' এই উপসর্গপূর্বক *চিতি সংজ্ঞানে* ধাতুর সাথে 'অসুন্'-প্রত্যয় সংযোগে 'প্রচেতস্' শব্দের উৎপত্তি সংকেতিত হয় (প্র-√চিত্-ধাতু + 'অসুন্'-প্রত্যয় = প্রচেতস্)।

প্রচেতাঃ

তৃতীয় অধ্যায়ে দেবতার রূপ,গুণ ও কর্ম বিষয়ে আলোচনাকালে শ্রীমৎ অনির্বাণ 'প্রচেতাঃ' শব্দের উল্লেখ করেছেন। দেবতাকে 'প্রচেতাঃ' বলার কারণস্বরূপ বলেছেন-

> তিনি চিন্ময় তাঁর চেতনা আলোর মত ছড়িয়ে আছে সর্বত্র, তাই তিনি প্রচেতাঃ।[২১]

বিমর্শ

দেবতার সর্বত্র চিৎময়তা বা চেতনাময়তারূপ গুণের প্রাধান্য থাকায় তাঁকে 'প্রচেতস্' বা 'প্রচেতাঃ' নামে অভিহিত করা হয়। বহুব্রীহিসমাসনিষ্পন্ন হিসাবে 'প্রকৃষ্টং চেতঃ যস্য সঃ'- এই বিগ্রহবাক্য দ্বারা 'প্রচেতস্' শব্দ উৎপন্ন হয় (প্র-√চিৎ-ধাতু + 'অসুন্'-প্রত্যয় = প্রচেতস্)। এই শব্দের প্রথমার একবচনের রূপ হল 'প্রচেতাঃ'।

ভূমি

অনির্বাণ মহোদয় মৃন্ময়ী পৃথিবীর সাধারণ পরিচয় প্রদানকালে 'ভূমি' এবং 'ক্ষিতি' এই দুই সংজ্ঞার উল্লেখ করে অর্থ প্রদর্শন করেছেন। 'ভূমি' নামের অর্থ করেছেন-

> 'ভূ' বা 'ভূমি'- যাতে সবকিছু 'হচ্ছে'।[২২]

বিমর্শ

'ভূমি' নামের ব্যাখ্যা থেকে √ভূ-ধাতুর উত্তর 'মি'-প্রত্যয় সংযোগে শব্দটির উৎপত্তির সংকেত পাওয়া যায় (√ভূ-ধাতু + 'মি'-প্রত্যয় = ভূমি)।

মনুর্হিত

অগ্নিসমিন্ধন আলোচনাবসরে মানবের আদিপিতা মনুর দ্বারা নিহিত অগ্নিকেই 'মনুর্হিত' বলা হয়েছে, সেটি যথা-

> বিশ্বজনের জন্য এই অগ্নিকে তাদের মধ্যে জ্যোতিরূপে নিহিত করলেন মনুই, তাই এই অগ্নির এই সংজ্ঞা হল মনুর্হিত।[২৩]

বিমর্শ

পূর্বোক্ত বর্ণনা থেকে মনুর্হিত শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে অনুমান করা যায়। 'মনুনা হিত' এই বিগ্রহবাক্য দ্বারা 'মনু' শব্দ সহযোগে √ধা-ধাতুর সঙ্গে 'ক্ত'-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে মনুর্হিত নামের উৎপত্তি হয় (মনু -√ধা-ধাতু + ক্ত = মনুর্হিত)।

মহাদেব

রুদ্রদেব বা শিব 'মহাদেব' নামে বেশি পরিচিত। গ্রন্থকার তাঁর এই অভিধার কারণরূপে বলেছেন-

> তিনি (শিব) মহান হলেন। তাইতো তিনি মহাদেব হলেন।[২৪]

বিমর্শ

শিবের মহাদেবত্বের কারণ তিনি মহান হয়েছিলেন। সেইজন্য 'মহান্ চ অসৌ দেব' এইরূপ ব্যাসবাক্য দ্বারা কর্মধারয়সমাস নিষ্পন্ন পদ হিসাবে নামটির ব্যুৎপত্তি করা যায় (মহান্ + দেব = মহাদেব)।

বিদ্বান্ ও বিশ্ববেদাঃ

দেবতার 'বিদ্বান্' ও 'বিশ্ববেদা' এই দুই বিশেষণের কারণ হিসাবে বলেছেন-

> দেবতা সবকিছু খুঁটিয়ে দেখেন এবং জানেন। তাই তিনি বিদ্বান্, বিশ্ববেদাঃ।[২৫]

বিমর্শ

দেবতার সর্ববিৎ-রূপ গুণের পরিচয়প্রদানস্বরূপ পূর্বোক্ত বিশেষণদ্বয় প্রযুক্ত হয়েছে। জ্ঞানার্থক √বিদ্-ধাতু থেকে 'বিদ্বান্' নামক শব্দের উৎপত্তি এবং 'বিশ্ব'-শব্দ 'সর্ব'-শব্দের সমানার্থক অর্থাৎ সব-কিছুর জ্ঞাতা হওয়ায় দেবতা 'বিশ্ববেদাঃ'। অতএব শব্দটি 'বিশ্ব' এই শব্দপূর্বক √বিদ্-ধাতু থেকে নিষ্পন্ন করা যায়।

বিশ্বভূ

মঘবা ইন্দ্রের একটি অন্যতম বিশেষণ হল 'বিশ্বভূ'। শ্রীমৎ অনির্বাণ ইন্দ্রের স্বরূপ বর্ণনাকালে বলেছেন-

> তিনি (ইন্দ্র) বিশ্বভূ অর্থাৎ তিনিই এই বিশ্ব হয়েছেন।[২৬]

বিমর্শ

√ভূ-ধাতুর অর্থ 'হওয়া' অর্থাৎ ভবতি ইতি 'ভূ'। বৈদিক দেবতা ইন্দ্র বিশ্ব হয়েছেন তাই তিনি বিশ্বভূ। অতএব 'বিশ্বং ভবতি য স বিশ্বভূ'- এইভাবে পদটি উৎপন্ন হয়।

বিশ্বরূপ

ইন্দ্র দেবতার স্বরূপ বর্ণনাকালে তাঁকে 'বিশ্বরূপ' আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়েছে। বিচিত্র মায়ায় তিনি বহুরূপ ধারণ করে বিশ্বরূপ হয়ে সর্বব্যাপক ও সর্বনিয়ন্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। বলা হয়েছে-

> যিনি সর্বব্যাপ্ত সর্বগত সর্বনিয়ন্তা, তিনিই সবকিছু হয়েছেন তিনি বিশ্বরূপ।[২৭]

বিমর্শ

'সর্ব' শব্দের পর্যায়বাচী শব্দ হল 'বিশ্ব'। ইন্দ্রই সবকিছু হয়েছেন অর্থাৎ এই বিশ্বে যা-কিছু বিদ্যমান সব-ই তিনি, সব-কিছু তাঁরই প্রতিরূপ তাই তিনি 'বিশ্বরূপ'। অতএব শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে বলা যায়- 'সর্বং অর্থাৎ বিশ্বং রূপং যস্য সঃ বিশ্বরূপঃ'।

বিশ্বরূপ

ইন্দ্রদেবতার রূপের বর্ণনাকালে 'বিশ্বরূপ' শব্দের উৎপত্তিস্বরূপ বলা হয়েছে-

> তাঁহাতে বিশ্বের এই-যে বিসৃষ্টি বাইরে কিংবা ভিতরে, তা-ই তাঁর রূপ। তিনি বিশ্বরূপ।[২৮]

বিমর্শ

বাহির ও অভ্যন্তর সহ বিশ্বই ইন্দ্রের রূপ, তাই তিনি 'বিশ্বরূপ'। নামটির উৎপত্তি প্রসঙ্গে বলা যায়- 'বিশ্বং রূপং যস্য স বিশ্বরূপ' অর্থাৎ বিশ্ব ও রূপ শব্দদ্বয় মিলিত হয়ে উৎপন্ন হয়।

বিশ্বানর

অগ্নির সর্বব্যাপক স্বরূপের বর্ণনাকালে 'বিশ্বানর' বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে। এর কারণ হিসাবে বলা হয়েছে-

অন্তর্যামিরূপে সব মানুষের মধ্যেই তিনি, তাই দেবতা বিশ্বানর।[২৯]

বিমর্শ

'বিশ্বানর' শব্দের নিরুক্তিস্থিত 'অন্তর্যামি' শব্দটি 'অন্তর্' শব্দ পূর্বক ণিজন্ত √যম্-ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। √যম্-ধাতুর একটি অর্থ 'যাওয়া'। সকল মানুষের মধ্যেই অবস্থান, সমস্ত মানুষের মধ্যে গমন অর্থের সমান হিসাবে পরিগণিত হয়। অতএব 'বিশ্ব' ও 'নর' শব্দের সাথে যুক্ত √যম্-ধাতু 'বিশ্বানর' শব্দের উৎপত্তির উৎস হিসাবে বিবেচিত হয়।

বৃষা

দেবতার সদাবর্ষণকারী শক্তির প্রশংসাস্বরূপ 'বৃষা' এই বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে। শব্দটির ব্যুৎপত্তি যথা-

নিরন্তর নির্ঝরিত তাঁর শক্তি, তাই তিনি বৃষা।[৩০]

বিমর্শ

দেবতার শক্তি নিরন্তর ঝরিত হয় অর্থাৎ সর্বদা বর্ষিত হয়, সেইজন্য তিনি 'বৃষা'। অতএব অনুমান করা যায়, বর্ষণার্থক √বৃষ্-ধাতু থেকে 'বৃষা' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

শম্বর

দেবতার সংখ্যা নিয়ে আলোচনার সময় বৃত্রের নাম উল্লেখ করে তাঁর নামান্তর 'শম্বর'-এর হেতু স্বরূপ বলা হয়েছে-

ইন্দ্রবিরোধী বৃত্রের এক নাম 'শম্বর'- 'শম্'কে আবৃত করে আছে বলে।[৩১]

বিমর্শ

'শম্' শব্দের অর্থ 'পুর'। বৃত্র তার আবরণ শক্তির দ্বারা তিন লোক বা চেতনার তিন ভূমিকে আবৃত করে রাখেন। সেইজন্য তিনি 'শম্বর'। অতএব 'শম্' এই শব্দপূর্বক আবরণার্থক √বৃ-ধাতুর (*বৃঞ্ আবরণে* ধাতু) সাথে + 'অচ্'-প্রত্যয় যুক্ত করে 'শম্বর' নামের ব্যুৎপত্তি নিশ্চিত করা যায়।

সৎপতি

গুণবাচক শব্দ প্রসঙ্গে বর্ণিত অন্যতম একটি বিশেষণ হল 'সৎপতি'। এই শব্দের অর্থপ্রকাশক নির্বচনটি হল-

তিনি (দেবতা) সৎ-স্বরূপ বা সত্য। তাঁর সত্তাতেই জগতে যা-কিছু 'ভূত' অর্থাৎ হয়ে আছে তা সৎ, কেননা এসবই তাঁর বিসৃষ্টি; তিনি সর্বভূতের পতি, অতএব সৎপতি।[৩২]

বিমর্শ

এই জগতে উৎপন্ন সবকিছুই সৎ-স্বরূপ কারণ সৎ বা সত্যরূপ দেবতার সত্তাতেই সমস্ত-কিছু উৎপন্ন হয়েছে। অতএব 'সতাম্ পতিঃ সৎপতিঃ'- এইভাবে পদটি নিষ্পন্ন করা যায়।

সৎপতি

অন্তরিক্ষস্থান বর্গের দেবতাসমূহের পরিচয় প্রদানে ব্যাপৃত শ্রীমৎঅনির্বাণ রুদ্রদেবতাকে সৎপতি নামে উল্লেখ করে, এই নামকরণের হেতু প্রদর্শন করেছেন, তাঁর উক্তিটি হল-

তিনি (রুদ্র) সৎপতি'- বিশ্বে যা-কিছু আছে, অধিষ্ঠানরূপে তার অধীশ্বর; আবার যা-কিছু হচ্ছে, তিনি তারও পিতা।[৩৩]

বিমর্শ

অস্তিত্বময়তার অধীশ্বর হওয়ায় রুদ্র 'সৎ-পতি'। অস্তিত্বময় সকলের পিতা হিসাবেও তিনি 'সৎ-পতি'। সুতরাং 'সতাং পতি' এবং 'সতাং পিতা' এইরূপ ব্যাসবাক্য দ্বারা 'সৎপতি' সংজ্ঞার বিশ্লেষণ সম্ভব (সৎ + পতি, সৎ + পিতা = সৎ-পতি)।

সধস্থ

দেবতা বহু হলেও তাঁরা যে কোনো বিরোধ করেননা, সবাই একসঙ্গে একই অধিকরণে বিরাজ করেন সেই বিষয়ে আলোকপাতকালে 'সধস্থ' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'সধস্থ' সংজ্ঞার কারণ হিসাবে গ্রন্থকার বলেছেন-

তাঁরা সবাই এক জায়গায় এসে মিলিত হন, তাঁদের সেই মিলনস্থানের পারিভাষিক সংজ্ঞা হল 'সধস্থ'।[৩৪]

বিমর্শ

দেবতারা নিজেদের সহাবস্থান হেতু 'সধস্থ' নামে প্রসিদ্ধ। নির্বচন অনুসারে সধস্থ শব্দ সহ শব্দ পূর্বক √স্থা-ধাতুর উত্তর 'ক'-প্রত্যয় সংযুক্ত হয়ে উৎপন্ন হয় (সহ -√স্থা-ধাতু + 'ক'-প্রত্যয় = সধস্থ)।

সপ্তবধ্রি

ঋষি অত্রির পৃথিবীসূক্ত আলোচনাপর্বে তাঁর 'সপ্তবধ্রি' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই অভিধার কারণস্বরূপ *বেদামীমাংসা*-কার বলেছেন-

তিনি (অত্রি) 'সপ্তবধ্রি' অর্থাৎ তাঁর মধ্যে আছে সাতটি বধ বা শীর্ষণ্য প্রাণের স্তিমিতি।[৩৫]

বিমর্শ

ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'সপ্তবধ্রি' শব্দ বিশ্লেষণ করে 'সপ্তন্' ও 'বধ্রি' এই শব্দদ্বয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। অতএব বলা যায় এই শব্দদুটি যুক্ত হয়েই 'সপ্তবধ্রি' নামের উৎপত্তি হয়েছে।

সবাধ

বেদমীমাংসা গ্রন্থের প্রণেতা বিশ্বদেবগণের উদ্দেশ্যে ঋষি অত্রির আকূতি বর্ণানাকালে অনিবাধ শব্দের উল্লেখ করেন এবং তার বিপরীতশব্দরূপে 'সবাধ' শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়ে ব্যুৎপত্তিগত অর্থও ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেছেন-

অনিবাধের বিপরীত একটি সংজ্ঞা হল 'সবাধ'... ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হল যার মধ্যে 'বাধ' বা চেতনার সঙ্কোচ আছে।[৩৬]

বিমর্শ

'সবাধ' শব্দের সাধারণ অর্থ 'ঋত্বিক্'। গ্রন্থকার এই শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তির আশ্রয় নিয়েছেন। সংস্কৃত ভাষায় সম্ভাব্য ব্যুৎপত্তি যথা- 'বাধেন সহ বর্তমান সবাধ'।

সহস্বান্

দেবতার বীরত্ব প্রকাশক এক অন্যতম বিশেষণ হল সহস্বান্। এই শব্দের নামকরণের কারণ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলেছেন-

তিনি বীর, সব বাধাকে দলিত করেন বলে সহস্বান্।[৩৭]

বিমর্শ

ষহ মর্ষণে ধাতুর সাথে 'অসুন্'-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নিষ্পন্ন 'সহঃ' বা 'সহস্' শব্দের অর্থ 'বল'। দেবতা বীর অর্থাৎ বলবান্ হওয়ায় তিনি সমস্ত বাধাকে দূর করতে সক্ষম। 'সহস্ অস্যাস্তীতি' এইরূপ ব্যুৎপত্তি দ্বারা 'সহস্বান্' শব্দ উৎপন্ন হয়।

সুদানু

সুষ্ঠু দাতার পরিচায়ক দেবতার ওপর এক বিশেষণ 'সুদানু' শব্দ। গ্রন্থকার এইপ্রসঙ্গে বলেছেন-

তাঁর সমস্ত সম্পদ্ আমাদের তিনি ঢেলে দেন বলে সুদানু।[৩৮]

বিমর্শ

দেবতার কাছে যা প্রার্থনা করি তিনি মুক্তহস্তে সবকিছুই প্রদান করেন। 'সুদানু' শব্দ দেবতার সুষ্ঠু দানের ইঙ্গিত বহন করছে। অতএব বলা যায় 'সু' এই উপসর্গপূর্বক দানার্থক √দা-ধাতু থেকে 'সুদানু' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে।

স্বধাবান্

দেবতার ওপর একটি গুণবাচক বিশেষণ হল 'স্বধাবান্'। তাঁর এই নামের কারণস্বরূপ বলা হয়েছে-

এই অনাদি স্থিতিতে তিনি আপনাতে আপনি আছেন, তা-ই তাঁর স্ব-ধা; অতএব তিনি স্বধাবান্।[৩৯]

বিমর্শ

দেবতা অনাদি স্থিতিরূপ নিজের মধ্যেই নিজেকে ধারণ করে আছেন, সেটিই তাঁর 'স্বধা' অর্থাৎ স্বধাবিশিষ্ট হওয়ায় তিনি 'স্বধাবান্'। 'স্বধা অস্য অস্তীতি' এইরূপ বিগ্রহবাক্য দ্বারা 'স্বধা' শব্দের সাথে অস্ত্যর্থে 'মতুপ্'-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'স্বধাবান্' শব্দের উৎপত্তি হয়।

হরিকেশ

ইন্দ্র দেবতার রূপের বর্ণনা হিসাবে 'হরিকেশ', হরি ইত্যাদি নামান্তর উল্লেখ করে কী হেতু এই নামকরণ তার উত্তরে *বেদামীমাংসা* গ্রন্থের প্রণেতা বলেছেন-

তিনি (ইন্দ্র) 'হরিকেশ' অর্থাৎ তাঁর চুল সোনালী।[৪০]

বিমর্শ

সোনালী বর্ণ অর্থাৎ পীত বর্ণবিশিষ্ট কেশসমূহ অর্থাৎ চুল থাকায় তিনি 'হরিকেশ'। শব্দটি 'হরিবর্ণা কেশাঃ যস্য স' এইরূপ বিগ্রহবাক্য দ্বারা বহুব্রীহিসমাস নিষ্পন্ন হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় (হরি + কেশ = হরিকেশ)।

৫.১.২. উপসংহার

বিংশ শতকে রচিত হলেও বা বাংলা ভাষায় লিখিত হলেও বৈদিকদেবতাসমূহ বৈদিক নির্বচনের ছত্রছায়ায় ভিন্ন অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত হয়েছে এবং এখানেও যাস্কাচার্যের নির্বচনপদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

৫.২. *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থে নির্বচন

৫.২.১. গ্রন্থকার ও তাঁর সাহিত্যচর্চা

বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য বৈদিক ধর্মের প্রকৃতার্থ উদ্ঘাটনের নিমিত্ত যিনি সারাজীবন ব্যয় করেছেন তিনি হলেন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। প্রকৃত নাম ছিল মূলশঙ্কর তিওয়ারি। তাঁর মূল লক্ষ্যই ছিল চার বেদ ও সংহিতা অনুসরণে সমাজ তৈরি করা। তবে তিনি কিন্তু বৈদিক দেবতাবাদে আস্থাশীল ছিলেননা। *নিরুক্ত*-কারসম্মত তিন দেবতা অথবা যাজ্ঞিকগণের তথাকথিত বহুদেবতাবাদ তিনি স্বীকার করেননা। তিনি অদ্বৈতবেদান্তী ছিলেন। বেদের দেবতামণ্ডলীর এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরনিষ্ঠ ব্যাখ্যা করেছেন এবং মন্ত্রের দেবতাবাচক সকল শব্দের অর্থ পরমাত্মা বা পরমেশ্বরপরত্বে ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রায় উনষাট বছরের জীবদ্দশায় তিনি অনেক প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থ রচনা করেছেন। তবে বেদভাষ্যকার হিসাবে তাঁর প্রসিদ্ধি অধিক। কয়েকটি বেদবিষয়ক গ্রন্থ হল- *ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা, ঋগ্বেদভাষ্য* (৭/৬১/১,২), *যজুর্বেদভাষ্য, সত্যার্থপ্রকাশ, পঞ্চমহাযজ্ঞবিধি, বেদাঙ্গপ্রকাশ* ইত্যাদি।

৫.২.১.১. *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থের বিষয়বস্তু

বলা যায় এই গ্রন্থটি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী মহোদয়কে অমরত্ব প্রদান করেছে। সত্যার্থপ্রকাশ অর্থাৎ সত্য অর্থের উন্মোচন। গ্রন্থটি ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম (ত্রুটিমুক্তরূপে) প্রকাশিত হয়। তিনি ঋষির হৃদয় নিয়ে এই গ্রন্থে অবৈদিক মত ও সিদ্ধান্ত যুক্তি ও শাস্ত্র-প্রমাণের ভিত্তিতে খণ্ডন করেছেন। বৈদিক ধর্ম সত্যের জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠুক এই ভাবনা থেকেই *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থের উৎপত্তি। গ্রন্থটি দুটি অর্ধে বিভক্ত এবং অধ্যায়গুলি সমুল্লাস নামে পরিচিত। পূর্বার্ধে দশটি সমুল্লাস এবং উত্তরার্ধে চারটি সমুল্লাস নিয়ে মোট চোদ্দটি সমুল্লাস বিদ্যমান। প্রতিটি সমুল্লাসের বিষয় নিম্নরূপ-

প্রথম সমুল্লাস- ঈশ্বরের ওঙ্কারাদি নামের ব্যাখ্যা।
দ্বিতীয় সমুল্লাস- সন্তানদের শিক্ষা।
তৃতীয় সমুল্লাস- ব্রহ্মচর্য্য, পঠন-পাঠন ব্যবস্থা, সত্যাসত্য গ্রন্থের নাম এবং পঠনপাঠনের রীতি।
চতুর্থ সমুল্লাস- বিবাহ ও গৃহাশ্রমের ব্যবহার।
পঞ্চম সমুল্লাস- বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসবিধি।
ষষ্ঠ সমুল্লাস- রাজধর্ম।
সপ্তম সমুল্লাস- বেদ ও ঈশ্বর বিষয়।
অষ্টম সমুল্লাস- জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় বর্ণনা।
নবম সমুল্লাস- বিদ্যা, অবিদ্যা, বন্ধ এবং মোক্ষের ব্যাখ্যা।
দশম সমুল্লাস- আচার, অনাচার এবং ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিষয়।
একাদশ সমুল্লাস- আর্যাবর্তীয় মত-মতান্তরের খণ্ডন-মণ্ডন বিষয়।
দ্বাদশ সমুল্লাস- চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন মতের বিষয়।

ত্রয়োদশ সমুল্লাস- খ্রীষ্টীয় মতের বিষয়।
চতুর্দশ সমুল্লাস- মুসলমান মতের বিষয়।

সত্যার্থপ্রকাশ নামক গ্রন্থের পূর্বার্ধের অন্তর্গত প্রথম সমুল্লাসে ঈশ্বরের একশত নামের ব্যাখ্যা হিসাবে যে নির্বচনের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে সেগুলির মধ্যে প্রথম পঞ্চাশটি শব্দ আলোচ্য শোধপ্রবন্ধের আকরস্বরূপ।

৫.২.১.২. নির্বচন-বিমর্শ

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁর *সত্যার্থপ্রকাশ* নামক গ্রন্থের প্রথম সমুল্লাসে বিভিন্ন বৈদিক মন্ত্রে প্রাপ্ত ওঙ্কাকারাদি নামের পরমেশ্বর অর্থে যে ব্যাখ্যা প্রদর্শন করেছেন তা বৈদিক নির্বচনশৈলীরই পরিচয় বহন করে। প্রায় একশত নামের ব্যাখ্যার দ্বারা এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিবিধ স্বরূপ ও মহিমা বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। নিম্নে সেই সমস্ত ঈশ্বরনামব্যাখ্যা তথা নির্বচনগুলি বিশ্লেষণপূর্বক আধুনিক যুগের নির্বচনকার হিসাবে স্বামী দয়ানন্দসরস্বতীর ভূমিকা বিষয়ে আলোকপাত করা যাক।

অক্ষরম্

পরমেশ্বরকে 'অক্ষর' নামে অভিহিত করার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে-

> যঃ সর্বমশ্নুতে ন ক্ষরতি ন বিনশ্যতি তদক্ষরম্।[৪১]

যিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত, অবিনাশী অর্থাৎ যার বিনাশ হয়না তিনিই অক্ষর নামক পরমেশ্বর।

বিমর্শ

'অক্ষর' শব্দের নিরুক্তিতে দেখা যায়, সর্বব্যাপী এবং অবিনাশী এই দুটি বিশেষ কারণেই ঈশ্বরকে 'অক্ষর' নামে অভিহিত করা হয়েছে। দুটি কারণই ব্যাকরণগত সংস্কার অনুসারে ব্যাখ্যাত হয়েছে। প্রথম নির্বচন অনুসারে ব্যাপ্ত্যর্থক √অশ্-ধাতু থেকে 'অক্ষর' শব্দের উৎপত্তি। √অশ্-ধাতুর সাথে 'সরন্'-প্রত্যয় যুক্ত করে 'অক্ষর' শব্দ সিদ্ধ হয়, সম্পূর্ণরূপে ব্যাকরণসম্মত। দ্বিতীয় কারণ অনুসারেও 'ন ক্ষরতি যৎ তৎ অক্ষরম্' এইরূপ বিগ্রহ দ্বারা নির্বচনটি সিদ্ধ হয়। এটিও ব্যাকরণগত শব্দগঠন প্রক্রিয়ার অনুরূপ।

অগ্নি

ঈশ্বরকে 'অগ্নি' নামে অভিহিত করে একাধিক উৎস থেকে শব্দটির উৎপত্তির সন্ধান দেওয়া হয়েছে, সেগুলি হল-

> অঞ্চু গতিপূজনযোঃ অগ, অগি গতেস্ত্রয়োঽর্থাঃ জ্ঞানং গমনং প্রাপ্তিশ্চেতি। পূজনং নাম সৎকারঃ। যোঽঞ্চতি অচ্যতেঽগত্যঙ্গত্যেতি, বা সোঽযমগ্নিঃ।[৪২]

অর্থাৎ 'অগ্নি' শব্দটি গত্যর্থক ও পূজার্থক √অঞ্চ্-ধাতু থেকে অথবা গত্যর্থক √অগ্-ধাতু (ও ইণ্-ধাতু) থেকে নিষ্পন্ন। এখানে 'গতি' শব্দের তিনটি অর্থ জ্ঞান, গমন ও প্রাপ্তি। পূজা শব্দের অর্থ সৎকার। সেই ঈশ্বর অগ্নি যিনি জ্ঞান স্বরূপ, জানার, পাওয়ার এবং পূজা করার যোগ্য।

বিমর্শ

দয়ানন্দসরস্বতী মহোদয় গত্যর্থক ও পূজার্থক √অঞ্চ্-ধাতু এবং গত্যর্থক √অগ্-ধাতু থেকে অগ্নি শব্দের উৎপত্তি সিদ্ধ করেছেন। ব্যাকরণ অনুসারে "অঙ্গের্নলোপশ্চ" (উণাদি ৪/৫০) সূত্র দ্বারা গত্যর্থক √অগ্-ধাতু (*অগি গত্যর্থে,* ভ্বাদিগণ) থেকে অগ্নি শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। অতএব তিনি অগ্নি শব্দের ব্যুৎপত্তিতে একদিকে যেমন ব্যাকরণগতপদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তেমনি বৈদিক পরম্পরা অনুসারে অগ্নির অন্যান্য ক্রিয়ার সাথে সমানতা বজায় রেখে শব্দটির নিষ্পত্তি ঘটিয়েছেন।

অদিতি ও আদিত্য

পরমেশ্বরের 'অদিতি' ও 'আদিত্য' এই নামদ্বয় একত্রে ব্যাখ্যাত হয়েছে। সেগুলি হল-

> ন বিদ্যতে বিনাশো যস্য সোঽযমদিতিঃ অদিতিরেব আদিত্যঃ।[৪৩]

যাঁর কখনও বিনাশ হয় না, তিনিই এই অদিতি, অদিতিই আদিত্য।

বিমর্শ

বিনাশ না হওয়ায় 'অদিতি' এই নাম। শব্দটি 'নঞ্' পূর্বক 'দীঙ্ ক্ষয়ে' ধাতুর উত্তর 'ক্তিন্' প্রত্যয় সংযুক্ত করে ব্যুৎপন্ন হয় (ন– *দীঙ্ ক্ষয়ে* ধাতু + ক্তিন্ প্রত্যয় = অদিতি)। এই শব্দটিই পুনরায় তদ্ধিতপ্রত্যয়ান্ত হিসাবে আদিত্য নামে রূপান্তরিত হয়।

অন্ন

'অন্ন' শব্দের সাধারণ অর্থ ওদন, ভক্ষ্যদ্রব্য ইত্যাদি। তথাপি গ্রন্থকার *তৈত্তিরীয়োপনিষদে* উক্ত পরমেশ্বর বাচক নিরুক্তি প্রসঙ্গে বলেছেন-

> অদ্যতেঽত্তি চ ভূতানি তস্মাদন্নং তদুচ্যতে।[৪৪]

স্বয়ং প্রাণিসমূহের ভোগ্য এবং নিজে প্রাণিদেহবর্গকে ভক্ষণ করেন বলে তিনি অন্ন নামে কথিত হন।

বিমর্শ

নিরুক্তিটির বিশ্লেষণ দ্বারা স্পষ্টতই অনুমান করা যায় 'অদ্ ভক্ষণে' ধাতু থেকে 'অন্ন' শব্দের ব্যুৎপত্তির চেষ্টা করা হয়েছে। ব্যাকরণ অনুসারেও √অদ্-ধাতুর সাথে 'ক্ত' প্রত্যয় সংযোগ করে 'অন্ন' নামের উৎপত্তি হয়।

অর্যমা (অর্যমন্)

'অর্যমা' নামের ব্যুৎপত্তি স্বরূপ বলা হয়েছে-

> যোঽর্যান্ স্বামিনো ন্যায্যাধীশান্ মিমীতে মান্যান্ করোতি সোঽর্যমা।[৪৫]

যিনি ন্যায়কারী মনুষ্যদের মান্য, পাপ ও পুণ্যকামীর পাপ ও পুণ্যের ফলের নিয়মকর্তা সেই পরমেশ্বরই 'অর্যমন্ বা অর্যমা'।

বিমর্শ

নির্বচনকার শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে যে রূপরেখা প্রদর্শিত হয়েছে তা ব্যাকরণগত শব্দগঠন প্রক্রিয়ার অনুকরণমাত্র। ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে √ঋ-ধাতুর সাথে 'যৎ'-প্রত্যয় যুক্ত করে স্বামী বা বৈশ্য অর্থে ব্যবহৃত 'অর্য' শব্দ উৎপন্ন হয়। এই শব্দপূর্বক √মা-ধাতুর উত্তর 'কনিন্' এই প্রত্যয় যোগে 'অর্যমন্' শব্দ সিদ্ধ হয়।

আকাশ

গ্রন্থকার 'আকাশ' শব্দের দ্বারাও পরমেশ্বরকে দ্যোতিত করেছেন। এই নামের নিরুক্তি সম্পর্কে তাঁর অভিমত যথা-

যঃ সর্বতঃ সর্বং জগৎ প্রকাশযতি স আকাশঃ।[৪৬]

যিনি সকল দিক থেকে সমগ্র জগৎকে প্রকাশ করেন সেই পরমাত্মাই 'আকাশ'।

বিমর্শ

সমগ্র জগতের প্রকাশক হিসাবে পরমাত্মাকে 'আকাশ' বলা হয়েছে। উক্ত নিরুক্তি থেকে 'কাশৃ দীপ্তৌ' ধাতুর সংকেত পাওয়া যায়। 'সর্বতঃ' অর্থাৎ 'আ' এই উপসর্গপূর্বক √কাশ্-ধাতুর সাথে 'অচ্'-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'আকাশ' রূপটি পাওয়া যায়। বলা যায়, এখানেও 'আকাশ' শব্দের ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তিতে গ্রহণ করা হয়েছে।

আচার্য

শিক্ষাগুরু, বেদাধ্যাপক অর্থে শব্দটি অধিক প্রচলিত। ঈশ্বরও সকলের আচার্য, কারণ-

যঃ আচারং গ্রাহযতি সর্বা বিদ্যা বোধযতি স আচার্য ঈশ্বরঃ।[৪৭]

অর্থাৎ যিনি সত্য আচরণ গ্রহণ করান, সকল বিদ্যা প্রাপ্ত করিয়ে থাকেন সেই ঈশ্বর আচার্য।

বিমর্শ

ঈশ্বর বোধক 'আচার্য' শব্দও 'চর গতিভক্ষণযো ধাতু' থেকে উৎপন্ন হয়। 'আ' এই উপসর্গ পূর্বক √চর্-ধাতুর সাথে 'ণ্যৎ'-প্রত্যয় যুক্ত করে 'আচার্য' শব্দ ব্যুৎপন্ন হয়।

আত্মা (আত্মন্)

'আত্মা' শব্দ স্বয়ং, ব্রহ্ম, দেহ, জীব, সূর্য প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয় তথাপি ব্রহ্মস্বরূপ শব্দটির ব্যাখ্যাটি হল-

অত সাতত্যগমনে। যোঽততি ব্যাপ্নোতি স আত্মা।[৪৮]

'অত সাতত্যগমনে' ধাতু থেকে 'আত্মা' শব্দ উৎপন্ন হয়। যিনি সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত করে আছেন সেই পরমেশ্বর 'আত্মা' নামে পরিচিত।

বিমর্শ

সত্যার্থপ্রকাশ নামক গ্রন্থে ঈশ্বরের 'পরমাত্মা' নামের নির্বচনে প্রথমে 'আত্মা' শব্দের উৎপত্তি ও পরে 'পরমাত্মা' শব্দের নিষ্পত্তি বর্ণিত হয়েছে। √অত্ ধাতুর সাথে 'মনিন্'-প্রত্যয় যোগ করে 'আত্মন্' শব্দ উৎপন্ন হয়। তার প্রথমার একবচনের রূপ 'আত্মা'।

ইন্দ্র

'ইন্দ্র' নামের ব্যাখ্যায় পরমেশ্বরের ইন্দ্রত্ব প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে বলা গ্রন্থকার বলেছেন-

য ইন্দতি পরমৈশ্বর্যবান্ ভবতি স ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরঃ।[৪৯]

যিনি পরম ঐশ্বর্যশালী তিনিই পরমেশ্বর ইন্দ্র।

বিমর্শ

ব্যুৎপত্তিস্থিত 'ইন্দতি' ক্রিয়াপদটি 'ইদি পরমৈশ্বর্যে' ধাতুর রূপ। অতএব √ইদি বা √ইন্দ্ ধাতুর সাথে 'রন্'-প্রত্যয় যুক্ত করে 'ইন্দ্র' শব্দ উৎপন্ন হয়। এটি ব্যাকরণ দ্বারা সিদ্ধ নিয়ম অনুসারেই প্রতিষ্ঠিত।

ঈশ্বর

আচার্য্য দয়ানন্দ সরস্বতী *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থে পরমেশ্বরের 'ঈশ্বর' নামের ব্যাখ্যাস্বরূপ বলেছেন-

য ঈষ্টে সর্বৈশ্বর্যবান্ বর্ততে স ঈশ্বরঃ।[৫০]

যিনি প্রভুত্ব করেন, ঐশ্বর্যবান সেই পরমাত্মাই 'ঈশ্বর' নামে অভিহিত হন।

বিমর্শ

সত্যার্থপ্রকাশ গ্রন্থে 'ঈশ্বর' শব্দ √ঈশ্-ধাতু থেকে '(*ঈশ ঐশ্বর্যে* অদাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১০২০) নিষ্পন্ন হয়েছে। গ্রন্থকারের মতে √ঈশ্-ধাতুর সাথে 'বরচ্' এই কৃৎপ্রত্যয় যুক্ত হয়ে নির্বচনান্তর্গত শব্দটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্যাকরণ অনুসারেও "স্থেশভাসপিসকসো বরচ্" এই পাণিনীয় সূত্র দ্বারা 'ঈশ্বর' শব্দের উৎপত্তি হয়। অতএব ব্যাকরণ অনুসারেই নির্বচন করা হয়েছে।

উরুক্রম

'উরুক্রম' শব্দ বৈদিক সাহিত্যে বিষ্ণুদেবতা নামান্তর বিশেষ। গ্রন্থকার শব্দটির ব্যাখ্যা প্রদানকালে বলেছেন-

উরুর্মহান্ ক্রমঃ পরাক্রমো যস্য স উরুক্রমঃ।[৫১]

মহান পরাক্রম যাঁর সেই তিনি অর্থাৎ মহান পরাক্রমশালী হওয়ায় তিনি উরুক্রম নাম প্রাপ্ত হন।

বিমর্শ

ঈশ্বরের 'উরুক্রমঃ' নামের নির্বচনও 'উরুঃ ক্রমঃ যস্য সঃ'- এইরূপ বহুব্রীহিসমাস নিষ্পন্ন হিসাবে ব্যাকরণের সংস্কারকে উৎস ধরেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

ওম্

গ্রন্থের প্রারম্ভেই 'ওম্ খং ব্রহ্ম' এই যজুর্বেদীয় মন্ত্রান্তর্গত 'ওম্' এই শব্দ বা নামের উৎপত্তির কারণস্বরূপ বলেছেন-

অবতীত্যোম্।[৫২]

'অবতি' অর্থাৎ রক্ষা করেন বলে ওম্।

বিমর্শ

'অবতি' ক্রিয়াপদটি 'ওম্' শব্দের উৎপত্তির মূলস্বরূপ। 'অবতেষ্টিলোপশ্চ' এই ঔণাদিক সূত্র অনুসারে √অব্-ধাতুর উত্তর 'মন্'-প্রত্যয় যুক্ত করে 'ওম্' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। এখানেও ব্যাকরণগত উপায় অবলম্বনেই শব্দটি বুৎপন্ন হয়েছে।

কুবের

সাধারণভাবে কুবের হলেন 'যক্ষরাজ'। এখানে তিনি পরমেশ্বরের বাচক। প্রাসঙ্গিক উক্তিটি হল-

যঃ সর্বং কুম্বতি স্বব্যাপ্ত্যাচ্ছাদযতি স কুবেরো জগদীশ্বরঃ।[৫৩]

যিনি নিজের ব্যাপ্তি দ্বারা সকলকে আচ্ছাদিত করেন সেই জগদীশ্বরের নাম 'কুবের'।

বিমর্শ

'কুম্বতি' ক্রিয়াপদ 'কুবি আচ্ছাদনে' ধাতুর অন্তর্গত। অতএব 'কুবি আচ্ছাদনে' ধাতুর সাথে 'এরক্' প্রত্যয় যুক্ত করে ব্যাকরণগত গঠন প্রক্রিয়া দ্বারাই কুবের শব্দের পরমেশ্বরত্ব দ্যোতিত হয়েছে (*কুবি আচ্ছাদনে* ধাতু + এরক্-প্রত্যয় = কুবের)।

কেতু

নবম গ্রহবিশেষ, শত্রু, চিহ্ন, পতাকা প্রভৃতি অর্থের বোধক এই 'কেতু' শব্দ। দয়ানন্দ সরস্বতীর মতে পরমেশ্বর হিসাবেও শব্দটির ব্যাখ্যা করা যায়, সেটি হল-

কিত নিবাসে রোগাপনযনে চ। যশ্চিকিৎসযতি চিকিৎসতি বা স কেতুরীশ্বরঃ।[৫৪]

√কিত্-ধাতু নিবাসার্থ এবং রোগ-পরিত্যাগ অর্থে প্রযুক্ত হয়। যিনি সকল রোগ হতে মুক্ত করান বা যিনি স্বয়ং রোগরহিত সেই ঈশ্বর 'কেতু' নামে পরিচিত।

বিমর্শ

সত্যার্থপ্রকাশ গ্রন্থে পরমেশ্বরবাচক 'কেতু' শব্দ দয়ানন্দ মহোদয় কর্তৃক √কিত্-ধাতু থেকে নিষ্পাদিত হয়েছে অর্থাৎ √কিত্-ধাতু > কেতু' এইভাবে পদটি উৎপন্ন হয়। এটি ব্যাকরণগত শব্দগঠন প্রক্রিয়া ও তদ্বারা জাত অর্থের বোধক না হওয়ায় ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়ম অনুসরণ করেছে।

গুরু

'গুরু' একাধিক অর্থে প্রযুক্ত হয়। কয়েকটি অন্যতম হল- আচার্য, অধ্যাপক, মন্ত্রোপদেষ্টা, পূজনীয় ব্যক্তি, ভারী, মহৎ ইত্যাদি। ঈশ্বরও সকলের গুরু, কারণস্বরূপ বলা হয়েছে-

গৃ শব্দে। যো ধর্মান্ শব্দান্ গৃহ্নাত্যুপদিশতি স গুরুঃ।[৫৫]

অর্থাৎ √গৃ-ধাতু শব্দের বোধক। যিনি সর্ববিদ্যাযুক্ত বেদসমূহের উপদেষ্টা সেই পরমেশ্বর তাঁর এই গুণের জন্যই সকলের 'গুরু'।

বিমর্শ

গ্রন্থকার √গৃ-শব্দে ধাতু থেকে 'গুরু' শব্দের উৎপত্তি প্রদর্শন করেছেন। অতএব শব্দার্থক √গৃ-ধাতুর উত্তর 'কু'-প্রত্যয় সংযোগে 'গুরু' এই নামের সৃষ্টি হয়।

চন্দ্র

চাঁদ, কর্পূর, স্বর্ণ, মুক্তা, শ্রেষ্ঠ প্রভৃতি চন্দ্রের পর্যায়বাচী শব্দ। এখানে ঈশ্বর অর্থে প্রয়োগ করে বলা হয়েছে-

যশ্চন্দতি চন্দযতি বা স চন্দ্রঃ।[৫৬]

যিনি সকলকে আহ্লাদিত করেন বা সকলের আনন্দস্বরূপ তিনি অর্থাৎ সেই ঈশ্বর 'চন্দ্র'।

বিমর্শ

'চদি আহ্লাদনে' ধাতু থেকে 'চন্দ্র' শব্দের উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে। অতএব √চন্দ্-ধাতু + ণিচ্ + রক্ = চন্দ্র)। এটি ব্যাকরণসিদ্ধ উপায়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

জল

পরমেশ্বরের 'জল' নামের ব্যাখ্যাস্বরূপ দয়ানন্দ মহোদয় বলেছেন-

জলতি ঘাতযতি দুষ্টান্, সংঘাতযতি অব্যক্তপরমাণ্বাদীন্ তদ্ব্রহ্ম জলম্।[৫৭]

যিনি দুষ্টদের দণ্ডদান করেন, অব্যক্ত পরমাণু প্রভৃতির পরস্পর বিয়োগ সাধন করেন সেই ব্রহ্ম হলেন 'জল'।

বিমর্শ

পরমেশ্বরের উদকধর্মীতার পরিচয় প্রদানের নিমিত্ত তাঁকে 'জল' নামে অভিহিত করা হয়েছে। 'জল' শব্দের ব্যুৎপত্তিতে 'জলতি' ক্রিয়াপদের উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায় ঘাতকার্থক √জল্-ধাতুর সহিত 'অচ্'-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে শব্দশাস্ত্র অনুসারেই 'জল' শব্দের উৎপত্তি সিদ্ধ হয়েছে (√জল্-ধাতু + 'অচ্'-প্রত্যয় = জল)।

দিব্য

ঈশ্বরের 'দিব্য' নামের ব্যাখ্যায় গ্রন্থকার বলেছেন-

দ্যুষু শুদ্ধেষু পদার্থেষু ভবো দিব্যঃ।[৫৮]

শুদ্ধপদার্থে উৎপন্ন হওয়ায় 'দিব্য' এই নাম।

বিমর্শ

ব্যাকরণ অনুসারে 'তত্র ভবঃ' অর্থে যৎপ্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'দিবি ভবঃ দিব্যঃ' এইরূপ সিদ্ধ হয়।

দেব

'দেব' শব্দ দেবতা, ঈশ্বর, রাজা, ইন্দ্রিয়, দীপ্তি প্রভৃতি অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়। দয়ানন্দ তাঁর সত্যার্থপ্রকাশ নামক গ্রন্থে বিবিধ অর্থের বোধক বলেছেন। সেগুলি যথা-

যো দীব্যতি ক্রীডতি স দেবঃ। বিজিগীষতে স দেবঃ। ব্যবহারযতি স দেবঃ। যশ্চরাচরং জগৎ দ্যোতযতি, যঃ স্তুযতে বা স দেবঃ। যো মোদযতি স দেবঃ। যো মাদ্যতি স দেবঃ। যঃ স্বাপযতি স দেবঃ। য কামযতে কাম্যতে বা স দেবঃ। যো গচ্ছতি গম্যতে বা স দেবঃ।[৫৯]

অর্থাৎ যিনি নিজের স্বরূপে নিজেই ক্রীড়া করেন তিনি দেব। যিনি সর্ব বিজিয়ীর ইচ্ছা পোষণ করেন তিনি দেব। (ন্যায়, অন্যায়) সকল ব্যবহারের জ্ঞাতা ও উপদেষ্টা হওয়ায় তিনি দেব। যিনি চর ও অচর জগৎ-কে প্রকাশ করেন বা যিনি স্তুত হন তিনি দেব। যিনি আনন্দিত করেন তিনি দেব। যিনি স্বয়ং আনন্দস্বরূপ তিনি দেব। যিনি প্রলয়কালে অব্যক্ত অবস্থায় সকল জগৎ-কে নিদ্রিত করেন তিনি দেব। যিনি কামনার যোগ্য তিনি দেব। যিনি জ্ঞানস্বরূপ তিনি দেব।

বিমর্শ

√দিব্-ধাতু যতগুলি অর্থের বোধক হয় সমস্ত অর্থেই 'দেব' শব্দের পরমেশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতএব *দিবুক্রীড়াবিজিগীষাব্যবহারদ্যুতিস্তুতিমোদমদস্বপ্নকান্তিগতিষু* ধাতুর সাথে 'অচ্'-প্রত্যয় সংযোগে 'দেব' শব্দের যে ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ গঠন বিদ্যমান সেটিই এখানে সংকেতিত হয়েছে।

নারায়ণ

'নারায়ণ' 'বিষ্ণু' দেবতার এক অন্যতম নাম। দয়ানন্দ সরস্বতী মহোদয় পরমেশ্বরের বাচক হিসাবে *মনুসংহিতা* ও *মহাভারতে* উল্লিখিত 'নারায়ণ' শব্দের নির্বচন উল্লেখ করে বলেছেন-

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
তা যদস্যাযনং পূর্বং তেন নারাযণঃ স্মৃতঃ।।[৬০]

জলরাশি নারা এই নামে উক্ত হয়, এই জলরাশিসমূহ নর অর্থাৎ পরমাত্মার পুত্র। সৃষ্টির পূর্বে সেই নার বা নারা আমার (শ্রীকৃষ্ণের) আশ্রয় ছিল। এইজন্যই আমি (তিনি) নারায়ণ নামে পরিচিত হই।

বিমর্শ

নিরুক্তটির বিশ্লেষণ থেকে জ্ঞাত হওয়া যায় নারা অর্থাৎ জলরাশিসমূহ শ্রীকৃষ্ণের অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় হওয়ায় তিনি 'নারায়ণ' নাম প্রাপ্ত হয়েছেন অর্থাৎ 'নার অযনং যস্য সঃ' এইরূপ বিগ্রহ করে শব্দটির উৎপত্তি সিদ্ধ হয়।

পরমাত্মা (পরমাত্মন্)

'পরমাত্মা' নাম পরমেশ্বরবাচক। গ্রন্থকার উক্ত অর্থে ব্যাখ্যাস্বরূপ বলেছেন-

পরশ্চাসাবাত্মা চ য আত্মভ্যো জীবেভ্যঃ সূক্ষ্মেভ্যঃ পরোঽতিসূক্ষ্মঃ স পরমাত্মা।[৬১]

আত্মাস্বরূপ যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং যিনি জীব প্রভৃতি সূক্ষ্ম আত্মা অপেক্ষা অতিসূক্ষ্ম সেই তিনিই 'পরমাত্মা'।

বিমর্শ

সত্যার্থপ্রকাশ নামক গ্রন্থে ঈশ্বরের 'পরমাত্মা' নামের নির্বচনে প্রথমে 'আত্মা' শব্দের উৎপত্তি ও পরে 'পরমাত্মা' শব্দের নিষ্পত্তি বর্ণিত হয়েছে। √অত্ ধাতুর সাথে 'মনিন্'-প্রত্যয় যোগ করে 'আত্মন্' শব্দ উৎপন্ন হয়। অনন্তর

‘পরমশ্চাসৌ আত্মন্ চেতি’ এইরূপ বিগ্রহবাক্য দ্বারা কর্মধারয়-সমাস নিষ্পন্ন পদরূপে ‘পরমাত্মা’ শব্দটি সিদ্ধ হয় এবং এটি সম্পূর্ণরূপে ব্যাকরণগত শব্দগঠনপ্রক্রিয়ার অন্তর্গত (পরম + আত্মন্ = পরমাত্মন্)।

পরমেশ্বর

পরমেশ্বরের পরমেশ্বরত্ব প্রসঙ্গে দয়ানন্দ মহোদয় বলেছেন-

> য ঈশ্বরেষু সমর্থেষু পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ স পরমেশ্বরঃ।[৬২]

যিনি ঈশ্বরদের মধ্যে অর্থাৎ সমর্থবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যাঁর তুল্য কেউ নেই তিনি পরমেশ্বর।

বিমর্শ

ব্যুৎপত্তি আলোচনার দ্বারা ‘পরম’ ও ‘ঈশ্বর’ শব্দদ্বয়ের সংযোগে ‘পরমেশ্বর’ শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। ‘পরমশ্চাসৌ ঈশ্বরশ্চেতি’ এইরূপ বিগ্রহ বাক্য দ্বারা শব্দগঠন প্রক্রিয়া অনুসারে শব্দটির উৎস সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায় (পরম + ঈশ্বর = পরমেশ্বর)।

পিতা

‘পিতা’ হলেন জনক ও পালক। পরমেশ্বরও সকলের ‘পিতা’। তাঁর এই পিতৃত্বের প্রমাণস্বরূপ *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থে বলা হয়েছে-

> পা রক্ষণে, যঃ পাতি সর্বান্ স পিতা।[৬৩]

অর্থাৎ √পা-ধাতু রক্ষণার্থক। যিনি সকলকে রক্ষা করেন সেই পরমাত্মা ‘পিতা’ নামে অভিহিত হন।

বিমর্শ

‘পিতা’ শব্দ রক্ষণার্থক √পা-ধাতুর সাথে ‘তৃচ্’-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে গঠিত হয়। ‘পিতা’ সকলের রক্ষক। পরমেশ্বরও সমান গুণের জন্যই সকলের ‘পিতা’, সকলের রক্ষক। পূর্বোক্ত ব্যাকরণগত সংস্কার অবলম্বনেই দয়ানন্দ মহোদয় পরমেশ্বর বাচক ‘পিতা’ শব্দের নিরুক্তি করেছেন।

পিতামহ

‘পিতামহ’ শব্দের অর্থ পিতার পিতা। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাও এই অভিধায় অভিহিত হন। ঈশ্বরের পিতামহত্ব প্রতিষ্ঠাকালে দয়ানন্দ মহোদয় বলেছেন-

> যঃ পিতৃণাং পিতা স পিতামহঃ।[৬৪]

অর্থাৎ যিনি পিতৃগণেরও পিতা সেই পরমেশ্বর হলেন সকলের ‘পিতামহ’।

বিমর্শ

গ্রন্থকার মনে করেন ‘ঈশ্বর’ পিতামহ কারণ তিনি পিতাদেরও পিতা। অতএব ‘পিতৃ’ শব্দের সাথে ‘ডামহ’ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে শব্দগঠন প্রক্রিয়া অনুসারেই পরমেশ্বরের পিতামহত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় (পিতৃ + ডামহ = পিতামহ)।

পৃথিবী

‘পৃথিবী’ শব্দ সাধারণত ভূমি, পৃথিবী অর্থে প্রযুক্ত হয়। আলোচ্য বৈদিক গ্রন্থে ব্যাখ্যাস্বরূপ বলা হয়েছে-

যঃ প্রথতে সর্বং জগদ্বিস্তৃণোতি তস্মাৎস পৃথিবী।[৬৫]

যিনি সমগ্র জগৎ বিস্তৃত করেন বা বিস্তৃত সমগ্র জগতের যিনি কর্তা সেই পরমেশ্বর হলেন ‘পৃথিবী’।

বিমর্শ

সত্যার্থপ্রকাশ গ্রন্থের প্রণেতা ‘পৃথিবী’ শব্দের ব্যুৎপত্তিতে বিস্তারার্থক √প্রথ্-ধাতু থেকে নিষ্পন্ন ‘প্রথতে’ ক্রিয়াপদের উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ তাঁর মতে √প্রথ্-ধাতু থেকেই পৃথিবী শব্দের উৎপত্তি। “প্রথেঃ ষিবন্ষবন্ধনঃ সম্প্রসারণং চ” (উণাদিসূত্র ১/১৫০) সূত্র অনুসারে উক্ত ধাতুর সাথে ‘ষিবন্’-প্রত্যয় ও ঙীষ্-প্রত্যয় যোগে ‘পৃথিবী’ শব্দ উৎপন্ন হয়। গ্রন্থকার ঈশ্বরের পৃথিবীত্ব প্রতিপাদনে ব্যাকরণগত শব্দটির ব্যাকরণগত গঠন ও অর্থকে অনুসরণ করেছেন।

প্রপিতামহ

সাধারণভাবে পিতামহের পিতা হলেন প্রপিতামহ। পরমেশ্বরও সকলের প্রপিতামহ। তার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে-

যঃ পিতামহানাং পিতা স প্রপিতামহঃ।[৬৬]

অর্থাৎ পিতামহদের পিতা হওয়ায় তিনি ‘প্রপিতামহ’ নামে প্রসিদ্ধ।

বিমর্শ

‘প্রপিতামহ’ প্রাদিতৎপুরুষ সমাসের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ‘প্রগতঃ পিতামহঃ’ এইরূপ ব্যাসবাক্য দ্বারা ‘প্রপিতামহ’ নামটি উৎপন্ন হয়েছে।

প্রাজ্ঞঃ

ঈশ্বরের অপর এক মহিমান্বিত নাম হল ‘প্রাজ্ঞ’। তাঁকে প্রাজ্ঞ নামে অভিহিত করার কারণ ব্যাখ্যাকালে বলা হয়েছে-

যঃ প্রকৃষ্টতয়া চরাচরস্য জগতো ব্যবহারং জানাতি স প্রজ্ঞঃ, প্রজ্ঞ এব প্রাজ্ঞঃ।[৬৭]

যিনি প্রকৃষ্টরূপে যথাযথভাবে সমস্ত চরাচর জগদ্ব্যাপার জানেন, তিনি প্রজ্ঞ, প্রজ্ঞই ‘প্রাজ্ঞ’ নাম প্রাপ্ত হয়।

বিমর্শ

সত্যার্থপ্রকাশ গ্রন্থে বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখ্যাকালে পরমেশ্বরের ‘প্রাজ্ঞ’ নাম উল্লেখ করে শব্দটির যে অর্থ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে ব্যাকরণসম্মত। ‘যঃ প্রকৃষ্টতয়া জানাতি সঃ প্রজ্ঞঃ’ এইভাবে সমাসের দ্বারা ‘প্রজ্ঞঃ’ পদটি সিদ্ধ হয় এবং ‘প্রজ্ঞঃ এব’ এইরূপ বিগ্রহ দ্বারা ‘প্রজ্ঞ’ শব্দের উত্তর স্বার্থে ‘অণ্’-প্রত্যয় যুক্ত করে ‘প্রাজ্ঞঃ’ এই রূপটি পাওয়া যায়।

বন্ধু

মিত্র, জ্ঞাতি ইত্যাদি 'বন্ধু' শব্দের সমানার্থক। এটি ঈশ্বরেরও বাচক। দয়ানন্দ মহোদয়ের মতে 'বন্ধু' ঈশ্বরের এক অন্যতম নাম। এই শব্দ দ্বারা ঈশ্বর নাম বোঝানোর জন্য তিনি বলেছেন-

বন্ধ বন্ধনে। যঃ স্বস্মিন্ চরাচরং জগদ্বধ্নাতি, বন্ধুবদ্ধর্মাত্মানাং সুখায সহায়ো বা বর্ততে স বন্ধুঃ।[৬৮]

অর্থাৎ √বন্ধ্-ধাতু বন্ধনার্থক। যিনি স্বয়ং চরাচর জগৎ-কে নিয়ম দ্বারা বদ্ধ রেখেছেন, বন্ধুর ন্যায় ধর্মাত্মাদের সুখের সহায়ক হন তিনি (পরমেশ্বর) বন্ধু নামে প্রসিদ্ধ হন।

বিমর্শ

'বন্ধু' শব্দটি ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়- √বন্ধ্-ধাতুর সাথে 'উ'-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে গঠিত হয়। *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থেও ঈশ্বর বাচক 'বন্ধু' শব্দ এই পদ্ধতি অবলম্বনেই সিদ্ধ হয়েছে।

বুধ

পণ্ডিত, গ্রহবিশেষ প্রভৃতি অর্থে 'বুধ' শব্দের অধিক প্রয়োগ বিদ্যমান। তথাপি পরমাত্মা অর্থে এটির ব্যবহারস্বরূপ বলা হয়েছে-

যো বুধ্যতে বোধ্যতে বা স বুধ।[৬৯]

যিনি নিজেই বোধ-স্বরূপ এবং জীবসমূহের বোধের কারণ সেই পরমাত্মা 'বুধ' নামে প্রসিদ্ধ হন।

বিমর্শ

'বুধ অবমনে' ধাতু 'বুধ' শব্দের মূল হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। ব্যাকরণ অনুসারে √বুধ্-ধাতুর সহিত 'ক'-প্রত্যয় যুক্ত করে ব্যুৎপন্ন করা যায় (√বুধ্ + ক = বুধ)।

বৃহস্পতি

'বৃহস্পতি' শব্দ সাধারণভাবে গ্রহবিশেষ ও দেবগুরু অর্থে প্রযুক্ত হয়। *সত্যার্থপ্রকাশ* নামক বেদবিষয়ক গ্রন্থে দয়ানন্দ সরস্বতী প্রদত্ত 'বৃহস্পতি' নামের পরমেশ্বর বিধায়ক ব্যাখ্যাটি হল-

যো বৃহতামাকাশাদীনাং পতিঃ স্বামী পালযিতা স বৃহস্পতি।[৭০]

যিনি আকাশাদি বৃহতের পতি, স্বামী পালনকর্তা সেই ঈশ্বর 'বৃহস্পতি' নামে অভিহিত হন।

বিমর্শ

'বৃহস্পতি' শব্দের নির্বচনটি ব্যাকরণগত সংস্কার অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'বৃহতাং পতি' এইরূপ বিগ্রহ দ্বারা 'বৃহৎ' শব্দপূর্বক *পা রক্ষণে* ধাতুর সাথে 'ডতি'-প্রত্যয় যোগে 'বৃহস্পতি' রূপ পাওয়া যায়।

ব্রহ্ম

পরমেশ্বরের 'ব্রহ্ম' নামের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

সর্বেভ্যো বৃহত্বাদ্ব্রহ্ম।[৭১]

সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বলে 'ব্রহ্ম' ঈশ্বরের নাম।

বিমর্শ

'ব্রহ্ম' শব্দের নামকরণেও হেতুবাচক সুবন্ত পঞ্চমান্ত 'বৃহৎ' শব্দ বিদ্যমান। ঈশ্বর সকল ভূতসমূহ অপেক্ষা বৃহৎ বা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হওয়ায় তিনি 'ব্রহ্ম' নামে অভিহিত হন। *বৃহ বৃদ্ধৌ* ধাতুর সাথে 'অতি'-প্রত্যয় যুক্ত করে 'বৃহৎ' নামের উৎপত্তি। এখানে নামকরণ গুণগত। অতএব বৃহ্-ধাতুই 'ব্রহ্ম' নামের উৎস। ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়ম অবলম্বনেই শব্দটি সৃষ্টি হয়েছে।

মঙ্গল

'মঙ্গল' শব্দ শুভ, গ্রহ বিশেষ, অভিষ্টার্থসিদ্ধি ইত্যাদি অর্থেও প্রযুক্ত হয়। ঈশ্বর বাচক অর্থে শব্দটির ব্যাখ্যা হল-

যো মঙ্গতি মঙ্গযতি বা স মঙ্গলঃ।[৭২]

অর্থাৎ যিনি মঙ্গলস্বরূপ অথবা মঙ্গলকারক সেই পরমেশ্বরের নাম মঙ্গল।

বিমর্শ

গ্রন্থকার 'মগি গত্যর্থে' ধাতুর সাথে 'অলচ্'-প্রত্যয় যুক্ত করে 'মঙ্গেরলচ্' (উণাদিসূত্র ৫/৭০) সূত্র দ্বারা 'মঙ্গল' শব্দ সিদ্ধ করেছেন (√মঙ্গ্-ধাতু + 'অলচ্'-প্রত্যয় = মঙ্গল)। এটি ব্যাকরণগত শব্দগঠন প্রক্রিয়ার-ই অনুরূপ।

মাতা

'মাতা' শব্দের অর্থ জননী। পরমেশ্বরকেও 'মাতা' বলা হয়। তাঁর মাতৃত্ব প্রতিষ্ঠাস্বরূপ বলা হয়েছে-

যো মিমীতে মানযতি সর্বাঞ্জীবান্ স মাতা।[৭৩]

অর্থাৎ যিনি সকল জীবের সুখ ও উন্নতি কামনা করেন সেই পরমেশ্বরই সকলের মাতা।

বিমর্শ

গ্রন্থকার মাতা শব্দের ব্যাখ্যায় 'মিমীতে' ও 'মানযতি' দুটি ক্রিয়াপদ উল্লেখ করেছেন। প্রথম ক্রিয়াপদ *মাঙ্ মানে শব্দে চ* ধাতুর রূপ এবং *মান পূজাযাম্* ধাতুর ণিজন্তে দ্বিতীয়টি পাওয়া যায়। অতএব উভয় ধাতুর সাথে 'তৃচ্'-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'মাতৃ' শব্দ উৎপন্ন হয়। এই প্রাতিপদিক বা শব্দের প্রথমার একবচনের রূপ হল 'মাতা'।

মিত্র

বন্ধু ও সূর্য উভয় অর্থেই প্রযুক্ত 'মিত্র' শব্দ বর্তমান বৈদিক গ্রন্থে পরমেশ্বরের বাচক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটির পরমেশ্বরত্ব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

মেদ্যতি স্নিহ্যতি স্নিহ্যতে বা স মিত্রঃ।[৭৪]

সকলকে স্নেহ করেন বা সকলের দ্বারা প্রীত হন তাই তিনি মিত্র নামে অভিহিত হন।

বিমর্শ

দয়ানন্দসরস্বতী মহাশয় 'মিত্র' শব্দের উৎপত্তিতে *ञिञ् मिदा स्नेहने* ধাতুর উল্লেখ করেছেন। ব্যাকরণ অনুসারেও এই √মিদ্-ধাতুর সাথে ঔণাদিক 'ক্ত্র'-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'মিত্র' শব্দটি গঠিত হয়। প্রাসঙ্গিক সূত্রটি হল- 'অমিচিমিশসিভ্যঃ ক্ত্রঃ' (উণাদিসূত্র ৪/১৬৫)।

যজ্ঞ

'যজ্ঞ' নামের সাধারণ অর্থ 'যাগ'। পরমেশ্বর অর্থে শব্দটির ব্যাখ্যা হল-

> যজ দেবপূজাসঙ্গতিকরণদানেষু। যো যজতি বিদ্বদ্ভিরিজ্যতে বা স যজ্ঞঃ।[৭৫]

√যজ্-ধাতু দেবপূজা, সঙ্গতিকরণ ও দানার্থক। যিনি জাগতিক পদার্থসমূহকে সংযুক্ত করেন বা যিনি বিদ্বানগণের পূজ্য। তিনি যজ্ঞ নামক পরমেশ্বর।

বিমর্শ

গ্রন্থকার √যজ্-ধাতু থেকে পরমেশ্বর বোধক 'যজ্ঞ' শব্দের উৎপত্তি বর্ণনা করেছেন। অতএব তাঁর মতে √যজ্-ধাতুর উত্তর 'নঙ্'-প্রত্যয় যুক্ত করে ব্যাকরণগত সংস্কার দ্বারাই পদটি সৃষ্টি হয়েছে।

রাহু

'রাহু' শব্দ গ্রহবিশেষ, সিংহিকার পুত্র দানব ইত্যাদি অর্থে অধিক প্রচলিত। এটি আবার পরমেশ্বর অর্থেও প্রযুক্ত হয়। ঈশ্বররূপে এই নামের ব্যুৎপত্তি হল-

> যো রহতি পরিত্যজতি দুষ্টান্ রাহযতি ত্যজযতি বা স রাহুরীশ্বরঃ।[৭৬]

অর্থাৎ যিনি দুষ্টদের ত্যাগ করেন এবং অন্যকে পরিত্যাগ করান সেই ঈশ্বর হলেন রাহু।

বিমর্শ

'রহতি' ও 'রাহযতি' ক্রিয়াপদদুটি √রহ্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। অতএব √রহ্-ধাতু থেকে 'রাহু' শব্দের উৎপত্তির সংকেত প্রদান করা হয়েছে। √রহ্-ধাতুর সহিত 'উণ্'-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'রাহু' শুব্দ গঠিত হয়।

রুদ্র

'রুদ্র' শব্দ শ্রবণমাত্রেই একাদশ রুদ্র, শিবের অপর নাম, বহ্নি প্রভৃতি অর্থের বোধ হয়। বর্তমান অধ্যায়ে পরমেশ্বর বাচক হিসাবে দয়ানন্দ মহোদয়ের অভিমত ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়-

> যো রোদযত্যন্যাযকারিণো জনান্ স রুদ্রঃ।[৭৭]

যিনি অন্যায়কারী মানুষদের রোদন করান তিনিই রুদ্র।

বিমর্শ

স্বামী দয়ানন্দসরস্বতী ঈশ্বরের 'রুদ্র' রূপের বর্ণনায় তাঁকে অন্যায়কারীর রোদনকারক হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। তদনুসারে ণিজন্ত √রুদ্-ধাতু থেকে 'রুদ্র' শব্দের ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ হয়। ব্যাকরণ অনুসারে √রুদ্-ধাতুর সাথে 'রক্'-প্রত্যয় যুক্ত করে 'রুদ্র' শব্দ গঠিত হয়। গ্রন্থকার ব্যাকরণ অনুসারেই ঈশ্বরের রুদ্রত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন।

বরুণ

ঈশ্বরের 'বরুণ' নামের ব্যাখ্যাস্বরূপ *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থকার বলা হয়েছে-

যঃ সর্বান্ শিষ্টান্ মুমুক্ষূন্ধর্মাত্মনো বৃণোত্যথবা যঃ শিষ্টৈর্মুমুক্ষভির্ধর্মাত্মাভির্ধ্রিযতে বর্য্যতে বা স বরুণঃ পরমেশ্বরঃ।[৭৮]

যিনি সমস্ত শিষ্টপুরুষ, মুক্তিকামী ও ধর্মাত্মাদের বরণ করেন অথবা সকল শিষ্ট, মুমুক্ষু এবং ধর্মাত্মাগণের যিনি ইষ্ট সেই পরমেশ্বর 'বরুণ' নামে পরিচিত হন।

বিমর্শ

'বরুণ' নামের ব্যুৎপত্তি অনুসারে *বৃঞ্-বরণে* ধাতু ও *বর ঈপ্সায়াম্* ধাতুর ঔণাদিক উনন্ প্রত্যয় যুক্ত করে শব্দটি নিষ্পন্ন করা যায়। পরন্তু √বৃঞ্-ধাতুর উত্তর 'উনন্'-প্রত্যয় সংযোগে পাপ্ত 'বরুণ' শব্দ ব্যাকরণসিদ্ধ।

বসু

'বসু' সাধারণভাবে রত্ন, ধন, স্বর্ণ, কিরণ, অগ্নি, জল, গণদেবতাবিশেষ প্রভৃতির পর্যায়বাচক শব্দ হিসাবে পরিচিত। বর্তমান গ্রন্থে 'বসু' শব্দ পরমেশ্বরত্বের জ্ঞাপক হিসাবে যেভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে, তা হল-

বসন্তি ভূতানি যস্মিন্নথবা যঃ সর্বেষু বসতি স বসুরীশ্বরঃ।[৭৯]

যাঁতে আকাশাদি ভূতসকল বাস করেন অথবা যিনি সকলের মধ্যে বাস করেন সেই ঈশ্বর বসু নামে অভিহিত হন।

বিমর্শ

গ্রন্থকার নিবাসার্থক *বস নিবাসে* ধাতু থেকে 'বসু' শব্দের নিষ্পত্তি করেছেন। ব্যাকরণ অনুসারেও √বস্-ধাতুর উত্তর ঔণাদিক 'উ'-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বসু শব্দ গঠিত হয়।

বায়ু

সত্যার্থপ্রকাশ গ্রন্থের রচয়িতা পরমেশ্বরকে 'বায়ু' নামে বর্ণনা করে শব্দটির ব্যাখ্যাস্বরূপ বলেছেন-

যো বাতি চরাচরং জগদ্ধরতি বলিনাং বলিষ্ঠঃ স বায়ুঃ।[৮০]

যিনি প্রবাহিত হন, চরাচর জগৎকে ধারণ করেন এবং যিনি সকল বলবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই পরমেশ্বরের নাম 'বায়ু'।

বিমর্শ

'বায়ু' নামের ব্যাখ্যা থেকে √বা-ধাতুর সাথে ঔণাদিক 'উণ্'-প্রত্যয় যুক্ত করে নামটির প্রতিষ্ঠা সম্ভব। অতএব ব্যাকরণ অবলম্বনে শব্দটি ব্যাখ্যাত হয়েছে।

বিরাট্

পরমেশ্বর 'বিরাট্' নামেও ব্যাখ্যাত হয়েছেন। এই নামের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে-

যো বিবিধং নাম চরাঽচরং জগদ্ রাজযতি প্রকাশযতি স বিরাট্।[৮১]

যিনি বিবিধ অর্থাৎ বহু প্রকারের জগৎকে প্রকাশিত করেন এইজন্য 'বিরাট্' এই নাম।

বিমর্শ

'বি' এই উপসর্গপূর্বক *রাজৃ দীপ্তৌ* ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্'-প্রত্যয় যুক্ত করে 'বিরাট্' রূপটি পাওয়া যায়। বিবিধরূপে জগৎকে আলোকিত বা প্রকাশিত করায় পরমেশ্বরের 'বিরাট্' এই নাম হয়েছে। অতএব নির্বচনান্তর্গত 'বিরাট্' শব্দটিও ব্যাকরণ অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিশ্ব

'বিশ্ব' নামের ব্যুৎপত্তিতে বলা হয়েছে-

> বিশন্তি প্রবিষ্টানি সর্বাণ্যাকাশাদীনি ভূতানি যস্মিন্ যো বাকাশাদিষু সর্বেষু ভূতেষু প্রবিষ্টঃ স বিশ্ব ঈশ্বর।[৮২]

যাতে আকাশাদি সকল ভূত প্রবেশ করে অথবা যিনি এই আকাশাদি সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন। সেই ঈশ্বর 'বিশ্ব' নামে পরিচিত।

বিমর্শ

দয়ানন্দসরস্বতী মহোদয় 'বিশ্ব' শব্দের উৎপত্তিতে প্রবেশার্থক √বিশ্-ধাতুর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 'অশূপ্রুশিলটিকণিখটিবিশিভ্যঃ ক্বন্' (উণাদিসূত্র ১/১৫১) এই সূত্র দ্বারা √বিশ্-ধাতুর সাথে 'ক্বন্' প্রত্যয় যুক্ত করে 'বিশ্ব' নাম নিষ্পন্ন হয়। অতএব তিনি ব্যাকরণসম্মত উপায়েই 'বিশ্ব' শব্দের নির্বচন প্রদর্শন করেছেন।

বিষ্ণু

'বিষ্ণু' শব্দ 'অগ্নি', 'পরমেশ্বর', 'বসুদেবতা', 'ধর্মশাস্ত্রকার মুনিবিশেষ' প্রভৃতি অর্থে প্রযুক্ত হয়। *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থে পরমেশ্বর অর্থে শব্দটির ব্যাখ্যা হিসাবে বলা হয়েছে-

> বেবেষ্টি ব্যাপ্নোতি চরাচরং জগত্ স বিষ্ণুঃ পরমাত্মা।[৮৩]

যিনি দৃশ্যমান চর এবং অচর রূপ জগৎকে ব্যাপ্ত করে আছেন সেই পরমাত্মাই 'বিষ্ণু'।

বিমর্শ

'বিষ্ণু' শব্দের নির্বচনেও ব্যাকরণের অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। ব্যাপ্ত্যর্থক √বিষ্-ধাতুর উত্তর 'নু'-প্রত্যয় যোগে 'বিষ্ণু' শব্দ উৎপন্ন হয়, যা শব্দশাস্ত্র অনুগত ব্যুৎপত্তি হিসাবে পরিগণিত হয়।

শনৈশ্চর

গ্রহবিশেষ অর্থে 'শনৈশ্চর' শব্দের প্রচলন বিদ্যমান। *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে-

> চরগতিভক্ষণযো। যঃ শনৈশ্চরতি স শনৈশ্চরঃ।[৮৪]

অর্থাৎ গতি ও ভক্ষণার্থক চর্-ধাতু। যিনি ধীরে ধীরে গমন করেন তিনিই শনৈশ্চর ঈশ্বর।

বিমর্শ

শনৈশ্চর নামের উৎপত্তি প্রসঙ্গে গ্রন্থকার স্বয়ং উৎসের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর মতে *চর গতিভক্ষণয়োঃ* ধাতু থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। 'শনৈস্' এই অব্যয়পূর্বক √চর্-ধাতুর সাথে 'অচ্'-প্রত্যয় সহযোগে ব্যুৎপন্ন হয় 'শনৈশ্চর' নাম (শনৈস্ -√চর্-ধাতু + 'অচ্'-প্রত্যয় = শনৈশ্চর)।

শুক্র

দৈত্যগুরু, গ্রহবিশেষ, দেহজ ধাতুবিশেষ প্রভৃতির বোধক এই 'শুক্র' শব্দ। ঈশ্বরের বোধক হিসাবে শব্দটির ব্যুৎপত্তি হল-

যঃ শুচ্যতি শোচযতি বা স শুক্রঃ।[৮৫]

যিনি পবিত্রস্বরূপ এবং জীবসমূহকে পবিত্র করেন তিনি 'শুক্র' নামক পরমেশ্বর।

বিমর্শ

ব্যাখ্যা অনুসারে *ঈশুচির্ পূতীভাবে* ধাতু থেকে 'শুক্র' শব্দ উৎপন্ন হয়। ব্যাকরণগত শব্দগঠন পদ্ধতি অনুযায়ী শব্দটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অর্থাৎ √শুচ্-ধাতুর সাথে রক্-প্রত্যয়ের সংযোগে গঠিত হয় (√শুচ্-ধাতু + 'রক্'-প্রত্যয় = শুক্র)।

সবিতা

'সবিতা' বা 'সবিতৃ' সূর্য্য, জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বর প্রভৃতি অর্থে বিদ্যমান। পরমেশ্বর অর্থে 'সবিতা' শব্দের নির্বচন প্রসঙ্গে বর্তমান গ্রন্থে বলা হয়েছে-

অভিষবঃ প্রাণিগর্ভবিমোচনং চোৎপাদনম্। যশ্চরাচরং জগৎ সুনোতি সূতে ব্যোৎপাদযতি স সবিতা পরমেশ্বরঃ।[৮৬]

অভিষব শব্দের অর্থ প্রসব বা উৎপাদন করা। যিনি সকল জগৎ প্রসব করেন বা উৎপন্ন করেন সেই পরমেশ্বরের নাম 'সবিতা'।

বিমর্শ

অর্থগত বিশ্লেষণ দ্বারা প্রসবার্থক √সূ-ধাতু থেকে 'সবিতৃ' শব্দের উৎপত্তির সংকেত পাওয়া যায়। *ষূঞ্ অভিষবে* বা *ষূঞ্ প্রাণিগর্ভবিমোচনে* ধাতুর সাথে 'তৃচ্'-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ব্যাকরণসম্মত পদ্ধতিতে ব্যুৎপন্ন হয়।

স্বরাট্

দয়ানন্দ সরস্বতী মহোদয়ের মতানুসারে ঈশ্বরের 'স্বরাট্' নামের কারণ তিনি স্বয়ং বিরাজমান, কেউ তাঁকে সৃষ্টি বা উৎপন্ন করেনি। হেতুস্বরূপ তাঁর উক্তিটি হল-

যঃ স্বযং রাজতে স স্বরাট্।[৮৭]

অর্থাৎ যিনি স্বয়ং অর্থাৎ নিজেই বিরাজ করেন তিনিই স্বরাট্।

বিমর্শ

'স্বরাট্' শব্দটি ব্যাকরণগত শব্দগঠন প্রক্রিয়া অনুসারেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (স্ব- *রাজৃ দীপ্তৌ* ধাতু + 'ক্বিপ্'-প্রত্যয় = স্বরাট্)।

হিরণ্যগর্ভঃ

ঈশ্বরের নামসমূহের ব্যাখ্যায় দয়ানন্দ মহোদয় 'হিরণ্যগর্ভ' নামটিও উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে পরমেশ্বর 'হিরণ্যগর্ভ', কারণ-

> যো হিরণ্যানাং সূর্যাদীনাং তেজসাং গর্ভ উৎপত্তিনিমিত্তমধিকরণং স হিরণ্যগর্ভঃ।[৮৮]

অর্থাৎ যিনি সূর্য্যাদি তেজোময় পদার্থসমূহের গর্ভ অর্থাৎ উৎপত্তি ও নিবাসস্থান হওযায় তিনি 'হিরণ্যগর্ভ' নামে পরিচিত।

বিমর্শ

উক্ত নির্বচনে ঈশ্বরকে 'হিরণ্যগর্ভ' শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হয়েছে কারণ তিনি সূর্য প্রভৃতি তৈজস পদার্থের গর্ভ অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান। নির্বচন অনুসারে 'হিরণ্যানাং গর্ভঃ যঃ সঃ হিরণ্যগর্ভঃ'- এইরূপ বহুব্রীহিসমাস নিষ্পন্ন হিসাবে শব্দটি ব্যুৎপন্ন হয়। অতএব ব্যাকরণ অনুসারেই নির্বচন করা হয়েছে।

হোতা

'হোতা' শব্দের দ্বারা ঋগ্বেদাভিজ্ঞ পুরোহিত ও হোমকর্তাকে বোঝায়। ঈশ্বরবাচক হিসাবে শব্দটির ব্যুৎপত্তি হল-

> হু দানাদনযোঃ, আদানে চেত্যেকে। যো জুহোতি স হোতা।[৮৯]

যিনি দেয় পদার্থের দাতা এবং গ্রহণ করার যোগ্য পদার্থসমূহের গ্রাহক তিনি 'হোতা'।

বিমর্শ

ব্যাকরণ অনুসারে √হু-ধাতুর সাথে 'তৃন্'-প্রত্যয় যুক্ত করে 'হোতা' শব্দের উৎপত্তি হয়। পরমেশ্বর এর দ্যোতক হোতা শব্দটিও এখানে তদনুসারেই সিদ্ধ হয়েছে।

৫.২.১.৩ উপসংহার

পরমেশ্বর অর্থে প্রযুক্ত শব্দগুলি ঈশ্বরের বিবিধ গুণ ও কর্মের পরিচায়ক। কয়েকটি ব্যতিরিক্ত সমস্ত শব্দই ব্যাকরণগত শব্দগঠন প্রক্রিয়া অনুসারেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিছু শব্দ বিদ্যমান যেগুলি ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তি ও ধ্বনিতাত্ত্বিক উভয় পদ্ধতি অনুসারেই ব্যাখ্যাত হয়েছে, যা নির্বচনধর্মীতার পরিচয় প্রকাশ করে।

তথ্যপঞ্জি

[১] *বেদমীমাংসা* ২/৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৮।

[২] তত্রৈব।

[৩] *বেদমীমাংসা* ২/৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮০।
[৪] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৩।
[৫] *তদেব* ৩/৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৩১।
[৬] *তদেব* ২/৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৮।
[৭] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৮।
[৮] তত্রৈব।
[৯] তত্রৈব।
[১০] Kshitish Chandra Chatterji (Ed.), *Vedic Selections* 1/1/5, Page 42.
[১১] *বেদমীমাংসা* ২/৩,পৃষ্ঠাঙ্ক ১৬৮।
[১২] *তদেব* ৩/৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৪।
[১৩] *তদেব* ২/৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৩২।
[১৪] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ১১৫।
[১৫] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৮।
[১৬] *তদেব* ৩/৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৪৮।
[১৭] তত্রৈব।
[১৮] *তদেব* ২/৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৬৬।
[১৯] *তদেব* ৩/৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ৯৯।
[২০] *তদেব* ২/৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৮।
[২১] *তদেব* ৩/৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ১২৪।
[২২] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৪।
[২৩] *তদেব* ২/৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৫৮।
[২৪] *তদেব* ৩/৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৩১।
[২৫] *তদেব* ২/৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৮।
[২৬] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৯।
[২৭] *তদেব* ৩/৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৯৪।
[২৮] *তদেব* ২/৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৯।
[২৯] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৮।
[৩০] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৮।
[৩১] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮৫।
[৩২] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৮।
[৩৩] *তদেব* ৩/৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ১২৪।
[৩৪] *তদেব* ২/৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮৬।
[৩৫] *তদেব* ৩/৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ২২।
[৩৬] *তদেব* ২/৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৫।
[৩৭] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৮।
[৩৮] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৯।
[৩৯] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৮।

[৪০] *তদেব* ৩/৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৯০।

[৪১] দুর্গা প্রসাদ (সম্পা.), *সত্যার্থপ্রকাশঃ* (প্রথম-অধ্যায়), পৃষ্ঠাঙ্ক ৭১।

[৪২] ধর্মপাল আর্য (সম্পা.), *সত্যার্থপ্রকাশঃ* (প্রথমসমুল্লাস), পৃষ্ঠাঙ্ক ৩।

[৪৩] দুর্গা প্রসাদ (সম্পা.), *সত্যার্থপ্রকাশঃ* (প্রথম অধ্যায়), পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৪।

[৪৪] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৫।

[৪৫] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৯।

[৪৬] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৬।

[৪৭] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৯।

[৪৮] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮১।

[৪৯] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৮।

[৫০] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৭।

[৫১] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৫।

[৫২] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৭।

[৫৩] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৯।

[৫৪] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮০।

[৫৫] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮১।

[৫৬] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮০।

[৫৭] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৯।

[৫৮] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৩।

[৫৯] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৮।

[৬০] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮০।

[৬১] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৮।

[৬২] তত্রৈব।

[৬৩] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮১।

[৬৪] তত্রৈব।

[৬৫] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৯।

[৬৬] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮১।

[৬৭] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৫।

[৬৮] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮১।

[৬৯] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮০।

[৭০] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৭।

[৭১] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭১।

[৭২] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮০।

[৭৩] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮১।

[৭৪] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৬।

[৭৫] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮০।

[৭৬] তত্রৈব।

[৭৭] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৯।

[৭৮] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৬।

[৭৯] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৯।

[৮০] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৫।

[৮১] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৪।

[৮২] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৫।

[৮৩] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৭।

[৮৪] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮০।

[৮৫] তত্রৈব।

[৮৬] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৮।

[৮৭] ধর্মপাল আর্য (সম্পা.), *সত্যার্থপ্রকাশঃ* (প্রথমসমুল্লাস), পৃষ্ঠাঙ্ক ৩।

[৮৮] দুর্গা প্রসাদ (সম্পা.), *সত্যার্থপ্রকাশঃ* (প্রথম-অধ্যায়), পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৫।

[৮৯] *তদেব*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮১।

***

ষষ্ঠ অধ্যায়

নির্বাচিত বৈদিকগ্রন্থসমূহে *মহাভারতে* প্রাপ্ত কতিপয় দেববাচক শব্দের তুলনাত্মক আলোচনা

৬.০. ভূমিকা

ধর্মকেন্দ্রিক বৈদিকসাহিত্যের এক বিশেষ অঙ্গ বিভিন্ন দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তুতি, মহিমা-কীর্তন ও যাগযজ্ঞ। সেখানে বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে কৃত একাধিক সূক্তের মাধ্যমে যেমন তাঁদের স্বরূপ সম্পর্কে জানা যায়, তেমনি তৎকেন্দ্রিক বিভিন্ন গ্রন্থে যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি বিষয় আলোচনাকালে তৎসম্পর্কিত বিভিন্ন শব্দের অর্থবোধের জন্য সেখানেই শব্দগুলির নির্বচন করা হয়েছে। সেই একই পদ্ধতি পরবর্তী সাহিত্যেও অনুসৃত হয়েছে। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য নির্বাচিত গ্রন্থগুলি হল-*ছান্দোগ্যোপনিষদ্, নিরুক্ত, বৃহদ্দেবতা, মহাভারত, সত্যার্থপ্রকাশ ও ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা*। এই গ্রন্থগুলিতে একাধিক দেববাচক শব্দের একাধিক নির্বচন প্রদর্শিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন গ্রন্থে প্রাপ্ত নির্বচনসমূহ সংশ্লিষ্ট দেবতাবর্গের স্বরূপ সম্পর্কেই আমাদের অবহিত করে। এক্ষেত্রে আলোচ্য দেবতাবাচক সাতটি শব্দ হল- 'অগ্নি', 'আদিত্য', 'জাতবেদাঃ', 'রুদ্র', বরুণ', 'বিষ্ণু' ও 'হিরণ্যগর্ভ'। দেবতার স্বরূপ উদ্ঘাটক নির্বচনগুলির তুলনাত্মক আলোচনায় ব্যাপৃত হওয়া যাক-

৬.১. অগ্নি

উষ্ণস্পর্শবিশিষ্ট তত্ত্বকে তেজ বলা হয়। এই তেজ তিন প্রকার, যথা- সূর্যরূপ, বিদ্যুদ্রূপ, পার্থিব রূপ। এই তিন তেজ অগ্নিস্বরূপ। এদের মধ্যে পার্থিব তেজরূপ অগ্নির স্থান হল পৃথিবী – "অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানঃ"।[১] সূর্য অগ্নি, বিদ্যুৎ অগ্নি ও পার্থিব অগ্নি এই তিন অগ্নির মধ্যে প্রকৃতিগত দিক থেকে কিছু ভিন্নতা দেখা যায়। সূর্য অগ্নি স্বতঃপ্রকাশিত হয়, এটি প্রদীপ্ত হওয়ার জন্য কোনো ইন্ধনের প্রয়োজন হয়না। বিদ্যুৎ অগ্নি জলরূপ ইন্ধনে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু কাষ্ঠাদি দ্বারা শান্ত হয়। পার্থিব অগ্নি কাষ্ঠাদি দ্বারা উদ্দীপ্ত হয় কিন্তু জল দ্বারা শান্ত হয়। *নিরুক্তে* বলা হয়েছে- "উদকেন্ধনঃ শরীরোপশমনঃ...উদকোপশমনঃ শরীরদীপ্তিঃ"।[২] অগ্নির তিনটি মুখ্য গুণ- উষ্ণতা, দাহকতা ও প্রকাশশীলতা। অগ্নির মুখ্য বা প্রধান কর্মও তিনটি- হবিঃ বহন করা, দেবতাদের আবাহন করা, দৃষ্টিবিষয়ক প্রকাশ প্রদান করা। অগ্নি দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বেদে অগ্নিকে আবার দেবতাদের মুখ, বাসস্থান, সেনানী, পোষক, পুরোহিত, হোতা ইত্যাদিও বলা হয়। কাষ্ঠাদি দ্বারা ব্যক্ত অগ্নি ভোজনাদি পরিপাক করে, উদরস্থ অগ্নি ভুক্ত দ্রব্যকে রসাদিতে পরিবর্তিত করে।

৬.১.১. অগ্নি শব্দের নির্বচনসমূহ ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

ব্রাহ্মণোত্তর সাহিত্যের একাধিক গ্রন্থে অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে অসংখ্য স্তুতিময় সূক্ত দৃষ্ট হয় এবং অগ্নি শব্দের নামকরণের কারণস্বরূপ একাধিক নির্বচনও দেখা যায়, নির্বচনগুলি হল-

নির্বচন কৃত শব্দ	আকরগ্রন্থ	নির্বচন

অগ্নি	*নিরুক্ত*	"অগ্নিঃ কস্মাত্। অগ্রণীর্ভবতি, অগ্রং যজ্ঞেষু প্রণীযতে, অঙ্গং নযতি সন্নমমানঃ। অক্লোপনো ভবতীতি স্থৌলাষ্ঠীবির্ন ক্লোপযতি ন স্নেহযতি। ত্রিভ্য আখ্যাতেভ্যো জাযত ইতি শাকপূণিঃ। ইতাদক্তাদ্দগ্ধাদ্বা নীতাত্, স খল্বেতেরকারমা-দত্তে গকারমনক্তের্বা দহতের্বা, নীঃ পরঃ"।[৩] [অর্থাৎ অগ্নি অগ্রণী দেবতাদের মধ্যে প্রধান বা দেবতাদের অগ্রণী অর্থাৎ সেনানী। অগ্রে অর্থাৎ প্রথমেই যজ্ঞসমূহে প্রণীত হয়। সন্নত হয়ে অঙ্গতা প্রাপ্ত করায় বা আত্মসাৎ করে। স্থৌলাষ্ঠীবির মতে অগ্নি অক্লোপন অর্থাৎ যা স্নিগ্ধ করেনা, রুক্ষতা সম্পাদন করে। শাকপূণির মতে অগ্নি শব্দটি তিনটি ধাতুর (ক্রিয়াপদ) সমাহারে উৎপন্ন হয়েছে, √ইণ্-ধাতু, √অঞ্জ্-ধাতু বা √দহ্-ধাতু, √নী-ধাতু থেকে। গত্যর্থক √ইণ্ ধাতু থেকে এসেছে অকার। ব্যঞ্জনার্থক √অঞ্জ্-ধাতু থেকে অথবা √দহ্ ধাতু থেকে গকার এসেছে। প্রাপণার্থক √নী ধাতু থেকে এসেছে 'নি']।
	বৃহদ্দেবতা	নীযতেঽযং নৃভির্যস্মান্নযত্যস্মাদসৌ চ তম্। তেনেমৌ চক্রতুঃ কর্ম সনামানৌ পৃথক্ পৃথক্।।[৪] [এই অগ্নি (পার্থিব) যেহেতু মানুষের দ্বারা নীয়মান হয় এবং এই অগ্নি (দিব্য) মনুষ্যকে এই জগৎ সংসার থেকে নিয়ে যায়, তাই অগ্নি এই সমান নামে অভিহিত হলেও উভয়েই পৃথক পৃথক কর্ম সম্পন্ন করে]। জাতো যদগ্রে ভূতানাম্ অগ্রণীরধ্বরে চ যত্। নাম্না সংনযতে বাঙ্গং স্তুতোঽগ্নিরিতি সূরিভিঃ।।[৫] [যেহেতু সকল ভূতবর্গের অগ্রে অর্থাৎ পূর্বে জাত হয়েছেন তাই অগ্নি বলা হয়। যজ্ঞকর্মে অগ্রণী হওয়ায় তিনি অগ্নি। অগ্নি নিজের অঙ্গকে একীভূত করে নেয় অর্থাৎ অগ্নি তার নিকটস্থিত সব পদার্থকে নিজের অঙ্গে পরিণত করে বা দাহ্যরূপে আত্মসাৎ করে, তাই সে অগ্নি]।
	সত্যার্থপ্রকাশ	"অঞ্চু গতিপূজনয়োঃ অগ, অগি, গতেস্ত্রযোঽর্থাঃ জ্ঞানং গমনং প্রাপ্তিশ্চেতি পূজনং নাম সৎকারঃ। যোঽঞ্চতি অচ্যতেঽগত্যঙ্গত্যেতি বা সোঽযমগ্নিঃ"।[৬] [অর্থাৎ অগ্নি শব্দটি গত্যর্থক ও পূজার্থক √অঞ্চ্-ধাতু থেকে অথবা গত্যর্থক √অগ্-ধাতু (ও √ইণ্-ধাতু) থেকে নিষ্পন্ন। এখানে 'গতি' শব্দের তিনটি অর্থ 'জ্ঞান', 'গমন' ও 'প্রাপ্তি'। 'পূজা' শব্দের অর্থ 'সৎকার'। সেই ঈশ্বর 'অগ্নি' যিনি জ্ঞান স্বরূপ, জানার, পাওয়ার এবং পূজা করার যোগ্য]।

যাস্কাচার্য তাঁর *নিরুক্ত* গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে দেবতাসমাম্নায়ের প্রত্যেক পদের আনুপূর্বিক ব্যাখ্যাকালে প্রথমেই পৃথিবীস্থান-দেবতা অগ্নির ব্যাখ্যা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি পূর্বাচার্যদের মত উল্লেখ করে অগ্নি শব্দের নামকরণের একাধিক কারণ পরিবেশন করেছেন নির্বচন পদ্ধতিতে। প্রশ্নবোধক কিম্ শব্দের (পুংলিঙ্গ অথবা নপুংসক লিঙ্গ) হেতুবাচক পঞ্চমান্ত 'কস্মাত্' শব্দ উল্লেখ করে বলেছেন- অগ্নিঃ কস্মাত্? অর্থাৎ কেন অগ্নি এই নামকরণ? তার উত্তরে বলেছেন- "অগ্রণীর্ভবতি। অগ্রং যজ্ঞেষু প্রণীযতে। অঙ্গং নযতি সন্নমমানঃ। অক্লোপনো ভবতীতি স্থৌলাষ্ঠীবিঃ। ন ক্লোপযতি ন স্নেহযতি। ত্রিভ্য আখ্যাতেভ্যো জাযতে ইতি শাকপূণিঃ। ইতাত্ অক্তাত্ দগ্ধাদ্বা নীতাত্। স খল্বেতেরকারমাদত্তে গকারমনক্তের্বা দহতের্বা নীপরঃ"[৭] অর্থাৎ 'অগ্নি' অগ্রণী দেবতাদের মধ্যে প্রধান বা দেবতাদের অগ্রণী অর্থাৎ সেনানী। স্কন্দস্বামীর মতে- "অগ্নিরগ্রণী প্রধানো দেবতানাম্"।[৮] অতএব বলা যায় অগ্র শব্দ √নী ধাতুর সাথে যুক্তে হয়ে অগ্রণী = অগ্নি শব্দ জাত হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণস্বরূপ বলা হয়েছে, অগ্রে অর্থাৎ প্রথমেই যজ্ঞসমূহে প্রণীত হয়। যজ্ঞ করতে গেলে অগ্নিপ্রণয়ন-ই প্রথম কার্য। এই প্রসঙ্গে স্কন্দস্বামী বলেছেন বলেছেন- "অগ্রং প্রথমং যজ্ঞেষু কর্তব্যেষু তাদর্থ্যেন প্রণীযতে"।[৯] দুর্গাচার্যের মতটি হল- "ন তাবৎ কিঞ্চিদপ্যন্যৎ ক্রিযতে যাবদযং ন প্রণীযতে ইতি"।[১০] অতএব এখানেও 'অগ্র' শব্দের সাথে √নী-ধাতু যুক্ত করে 'অগ্র + নী' থেকে 'অগ্নি' শব্দ সিদ্ধ হয়। Paolo visigalli তাঁর "Words In and Out of History: Indian Semantic Derivation (Nirvacana) and Modern Etymology in Dialogue" নামক প্রবন্ধে উপরে আলোচিত নির্বচনদুটিকে একটি নির্বচনের মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর মতে যাস্ক 'অগ্নিপ্রণয়ন' কর্মে অগ্নির ভূমিকাকে মাথায় রেখেই বলেছেন- "Why Agni [i.e., why is Agni called 'Agni']? He is the agraṇī ('led-in-the-front') [i.e.,] 'agra-ly' (firstly) he is praṇī-ed (led) in the sacrifices".[১১] Visigalli এর মতে যাস্কাচার্য এই নির্বচনে ধ্বনিপরিবর্তনের দ্বারাই 'অগ্নি' এই পরোক্ষ শব্দের সাথে অন্তর্নিহিত প্রত্যক্ষ শব্দ 'অগ্রণী'-র সম্পর্ক স্থাপন করে 'অগ্রণী' শব্দ থেকেই 'অগ্নি' শব্দ সিদ্ধ করেছেন। 'অগ্র' শব্দের 'র' এর লোপ হয়েছে। এর ফলে অগ্র শব্দের পরবর্তী 'নী' এর ণত্ববিধানের নিয়মানুসারে বিকার প্রাপ্ত মূর্দ্ধন্য 'ণ্' পূর্বাবস্থা অর্থাৎ দন্ত্য ন্ প্রাপ্ত হয় এবং 'নী' এর ঈ-কার ই-কারে পরিবর্তিত হয় (অগ্রণী > অগ্ নী > অগ্নি)।

পরবর্তী নির্বচনে বলা হয়েছে "অঙ্গং নযতি সন্নমমানঃ"[১২] অর্থাৎ সন্নত হয়ে অঙ্গতা প্রাপ্ত করায় বা আত্মসাৎ করে। তৃণ, কাষ্ঠ প্রভৃতিতে অগ্নি সন্নত হলে সেগুলিকে দাহ্যরূপে আত্মসাৎ করে। দুর্গাচার্য 'সন্নত' শব্দের অর্থ করেছেন 'আশ্রিত'- "যত্র তৃণে কাষ্ঠে বা সন্নমত্যাশ্রয়তি তত্র সন্নমমান এবাত্মনোঽঙ্গতাং নযত্যাত্মসাৎসর্বং করোতি ভস্মীকরোতীত্যর্থঃ"।[১৩] তিনি আরও বলেছেন- "যত্রাযং লৌকিকে বৈদিকে বার্থে সাধনত্বেন সন্নময়ত্যাত্মানং তত্র সন্নমমান এবাত্মানং প্রধানীকৃত্য সর্বমন্যদঙ্গমাত্মনোঽঙ্গতাং নযতি"।[১৪] যে বৈদিক বা লৌকিক কর্মে অগ্নি সন্নত হয় অর্থাৎ সাধনতা প্রাপ্ত হয় তাতে নিজেকে প্রধান করে অন্য সবই অঙ্গীভূত বা অপ্রধান করে। অতএব বলা যায় অঙ্গ + √নী-ধাতু থেকেও অগ্নি শব্দ নিষ্পন্ন করা যায়। ভিসিগাল্লি (Paolo Visigalli) এখানে 'অঙ্গানী' ('অঙ্গ' এবং 'নী' এর যৌগিক রূপ) শব্দ থেকে 'অগ্নি' শব্দ নিষ্পন্ন বলেছেন- অঙ্গাণী > অগানী (ঙ্ লোপ করে) > অগ্ নী (আ লোপ) > অগ্ নি (স্বরবর্ণের হ্রস্বতা) > অগ্নি।

আচার্য যাস্ক তাঁর পূর্বাচার্য স্থৌলাষ্ঠীবির মতও উল্লেখ করেছেন, সেটি হল- "অক্লোপনো ভবতীতি স্থৌলাষ্ঠীবিঃ। ন ক্লোপযতি ন স্নেহযতি"।[১৫] স্থৌলাষ্ঠীবির মতে 'অগ্নি' অক্লোপন অর্থাৎ যা স্নিগ্ধ করেনা, রুক্ষতা সম্পাদন করে। রুক্ষতা সম্পাদন অগ্নির একটি ধর্ম। তাঁর মতে অক্লোপন = অগ্নি, ণিজন্ত √ক্লূযী ধাতু (*ক্লূযী শব্দে উন্দে*

চ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ৫১৪) থেকে নিষ্পন্ন। Max Deeg নিরুক্তস্থিত "অথাপ্যন্তব্যাপত্তির্ভবতি"[১৬] -এই ধ্বনিপরিবর্তনের নিয়মানুসারে 'অক্নূ' থেকে 'অগ্নি' পদ নিষ্পন্ন করেছেন (অক্নূ > অগ্নি)।

শাকপূণির মতে অগ্নি শব্দটি তিনটি ধাতুর (ক্রিয়াপদ) সমাহারে উৎপন্ন হয়েছে- "ত্রিভ্য আখ্যাতেভ্যো জাযত ইতি শাকপূণিঃ।। ইতাত্-অক্তাদ্দগ্ধাদ্বা-নীতাত্।। স খল্বেতে-রকারমাদত্তে, গকারমনক্তের্বা দহতের্বা, নীঃ পরস্তস্যৈষা ভবতি"।[১৭] তাঁর মতে গত্যর্থক √ই ধাতু থেকে এসেছে অকার। ব্যঞ্জনার্থক √অঞ্জ্-ধাতু থেকে অথবা √দহ্-ধাতু থেকে গকার এসেছে (√অঞ্জ/√দহ্ > গকার)। প্রাপণার্থক √নী-ধাতু থেকে এসেছে 'নি' এই অন্তিমাংশ (নী > নি)। স্কন্দস্বামীর মতে √নী ধাতুর উত্তর 'ডি'-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'নি' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। 'অগ্নি' শব্দের মধ্যে পূর্বোক্ত তিন ধাতুর অর্থই বিদ্যমান- অগ্নি গতিসম্পন্ন, অগ্নি পদার্থব্যঞ্জক অথবা পদার্থদাহক, অগ্নি হবিঃ প্রাপক অর্থাৎ দেবতাদের উদ্দেশ্যে হবিঃ নিয়ে যায়। অতএব 'অ + গ্ + নি = অগ্নি'। বৈয়াকরণ মতে 'অঙ্গের্নলোপশ্চ' (উণাদিসূত্র ৪/৫০) সূত্রানুসারে √অঙ্গ ধাতুর উত্তর 'নি'-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'অগ্নি' পদটি সিদ্ধ হয় (অঙ্গ + নি = অগ্নি)।

শৌনকাচার্য তাঁর *বৃহদ্দেবতা* গ্রন্থে তিন প্রকার 'অগ্নি' সম্পর্কে আলোচনাকালে প্রথমেই 'অগ্নি' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন বলেছেন- "নীযতেঽযং নৃভির্যস্মান্ নযত্যস্মাদসৌ চ তম্। তেনেমৌ চক্রতুঃ কর্ম সনামানৌ পৃথক্ পৃথক্"[১৮] অর্থাৎ এই অগ্নি (পার্থিব) যেহেতু মানুষের দ্বারা নীয়মান হয় এবং এই অগ্নি (দিব্য) মনুষ্যকে এই জগৎ সংসার থেকে নিয়ে যায়, তাই অগ্নি এই সমান নামে অভিহিত হলেও উভয়েই পৃথক পৃথক কর্ম সম্পন্ন করে। এখানে অগ্নি শব্দের আংশিক নির্বচন লক্ষ্য করা যায়। 'নযতি' এবং 'নীযতে' উভয় ক্রিয়াপদ-ই √নী ধাতু নিষ্পন্ন। অতএব 'অগ্নি' শব্দের দ্বিতীয়াংশ 'নি' এর সাথে প্রাপণার্থক √নী-ধাতুর সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও দ্বিতীয় অধ্যায়েও 'অগ্নি' শব্দের নির্বচন প্রদর্শন করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে- "জাতো যদগ্রে ভূতানাম্ অগ্রণীরধ্বরে চ যত্। নাম্না সংনযতে বাঙ্গং স্তুতোঽগ্নিরিতি সূরিভিঃ"[১৯] অর্থাৎ ঋষিগণ দ্বারা অগ্নি নামে স্তুত হওয়ার তিনটি কারণ বলা হয়েছে, প্রথমত- যেহেতু সকল ভূতবর্গের অগ্রে অর্থাৎ পূর্বে জাত হয়েছেন তাই 'অগ্নি' বলা হয়। অতএব তিনি ভূতবর্গের অগ্রণী এই অর্থ গ্রহণ করে, 'অগ্র' শব্দের সাথে √নী ধাতু যুক্ত করে 'অগ্নি' শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করা যায় (অগ্র + নী = অগ্নি)। দ্বিতীয়ত যজ্ঞকর্মে অগ্রণী হওয়ায় তিনি অগ্নি। এখানে যজ্ঞের পূর্বে অগ্নিপ্রণয়ন কর্ম দ্যোতিত হয়েছে। অতএব 'অগ্র' শব্দের সাথে √নী-ধাতু যুক্ত করে অগ্নি শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করা যায় (অগ্র + নী = অগ্নি)। আবার যেহেতু অগ্রণী শব্দটি উল্লেখ আছে তাই অগ্রণী শব্দ থেকেও প্রত্যক্ষভাবে ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়ম অনুসারে অগ্নি শব্দ নিষ্পন্ন করা যায় (অগ্রণী > অগ্নি)। তৃতীয়ত বলা হয়েছে অগ্নি নিজের অঙ্গকে একীভূত করে নেয় অর্থাৎ অগ্নি তার পার্শ্বস্থিত সব পদার্থকে নিজের অঙ্গে পরিণত করে বা দাহ্যরূপে আত্মসাৎ করে, তাই সে অগ্নি। এখানেও 'সংনযতে' ক্রিয়াপদ 'অঙ্গং' শব্দ থেকে অঙ্গ ও √নী-ধাতু গ্রহণ করে 'অগ্নি' শব্দ সিদ্ধ করা যায় (অঙ্গ + √নী-ধাতু = অগ্নি)।

সত্যার্থপ্রকাশ গ্রন্থেও ঈশ্বরের নামসমূহ ব্যাখ্যাকালে ঈশ্বর বাচক অগ্নি শব্দের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বলেছেন জ্ঞানস্বরূপ, সর্বজ্ঞ, জানার, পাওয়ার এবং পূজা করার যোগ্য সেই পরমেশ্বর-ই অগ্নি- "যোঽঞ্চতি অচ্যতেঽগত্যঙ্গত্যেতি বা সোঽযমগ্নিঃ"[২০] অর্থাৎ গত্যর্থক ও পূজার্থক √অঞ্চ্-ধাতু (*অঞ্চু গতিপূজনয়োঃ,* পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১৮৮), অগি ধাতু (*অগি গত্যর্থে,* পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১৪৬), √ইণ্ ধাতু (*ইণ গতৌ,* পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১০৪৫) থেকে অগ্নি শব্দ সিদ্ধ হয়। গতি ও পূজা শব্দদ্বয়ের অর্থও উল্লেখ করা হয়েছে- "গতেস্ত্রযোঽর্থাঃ জ্ঞানং গমনং প্রাপ্তিশ্চেতি। পূজনং নাম সৎকারঃ"।[২১]

৬.১.২. নির্বচনগুলির তুলনা

- যাস্কাচার্য বিরচিত *নিরুক্তগ্রন্থে* যে অগ্নি শব্দের নির্বচন প্রদর্শিত হয়েছে সেই অগ্নি হলেন পৃথিবীস্থান দেবতা, *বৃহদ্দেবতা* গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে কৃত নির্বচক অগ্নি শব্দটি যথাক্রমে পার্থিব অগ্নি ও দিব্য অগ্নির বাচক এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে অগ্নি পার্থিব অগ্নি। কিন্তু *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থে অগ্নি পরমেশ্বরের নামান্তর।
- *নিরুক্তস্থিত* নির্বচনের প্রথমেই 'কস্মাৎ' এই প্রশ্নবোধক শব্দ উল্লেখ করে নির্বচনটি বর্ণিত হয়েছে, যেটি নিরুক্তকারের নির্বচনপদ্ধতির এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু *বৃহদ্দেবতা* ও *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থে এই বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত।
- তিনটি গ্রন্থেই এক-ই শব্দের নির্বচনে একাধিক সংখ্যক কারণ উল্লেখিত হয়েছে। তাই অগ্নি শব্দের নির্বচনটি অনেকার্থক নির্বচন নামে অভিহিত করা যায়।
- *নিরুক্তে* এবং *বৃহদ্দেবতা* গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে অবস্থিত নির্বচনগুলিতে অগ্নি শব্দের পূর্ণ বিশ্লেষণ দ্বারা নির্বচন করা হয়েছে, তাই এগুলিকে পূর্ণ নির্বচন বলা যায়। কিন্তু *বৃহদ্দেবতা* গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের নির্বচনে শুধুমাত্র 'অগ্নি' শব্দের অন্তিমাংশেরই নির্বচন করা হয়েছে এবং *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থে অগ্নি শব্দের প্রথমাংশের নির্বচন করা হয়েছে। অতএব উক্ত নির্বচনগুলি আংশিক বা অপূর্ণ নির্বচন বলা যায়।
- যাস্ককৃত নির্বচনগুলির সাথে *বৃহদ্দেবতার* দ্বিতীয় অধ্যায়ে অবস্থিত নির্বচনগুলির অধিকাংশের অর্থগত সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। উভয়েই যজ্ঞে অগ্নির অগ্রগামিত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, সেই সঙ্গে সকল বস্তুকে দহন শক্তির দ্বারা আত্মসাৎ করা রূপ ধর্মকে মাথায় রেখে উভয়েই তদর্থক নির্বচন প্রস্তুত করেছেন। কিন্তু যাস্কাচার্য অগ্নিকে দেবতাদের অগ্রণী বললেও আচার্য শৌনক অগ্নিকে সর্বভূতের অগ্রণী বলেছেন।
- শাকপূণির মতে অগ্নি শব্দ একাধিক ধাতুর সামাহারে সৃষ্ট। অতএব এটি একাধিক ধাতুজ নির্বচন। এখানে ক্রিয়ার সাথে শব্দের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান।
- *বৃহদ্দেবতায়* অবস্থিত √নী-ধাতু থেকে অগ্নি শব্দ নিষ্পন্ন করেছেন। √নী-ধাতুর সাথে অগ্নি শব্দের অন্তিমাংশের সাদৃশ্য বিদ্যমান,*সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থেও অঞ্চতি, অচ্যতে ক্রিয়াপদের সাথে অগ্নি শব্দের আদ্যংশের ধ্বনিগত সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকলেও তিনটি গ্রন্থেরই ক্রিয়াপদের সাথে অগ্নি শব্দের ধ্বনিসাম্যের বাহুল্য রয়েছে।
- *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থে গত্যর্থক ও পূজার্থক √অঞ্চ-ধাতু থেকে অগ্নি শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে, যা অন্য গ্রন্থগুলিতে অনুপস্থিত।

৬.২. আদিত্য

বৈদিকবাঙ্ময়ে প্রাথমিকভাবে যে তেত্রিশ প্রকার দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায় সেখানে 'আদিত্য' দ্বাদশ সংখ্যক অর্থাৎ গণদেবতারূপে প্রতিভাত হয়েছেন। বৈদিকসংহিতায় আদিত্যদেবতার উদ্দেশ্যে বিশেষ কোনো স্তুতি লক্ষ্য করা যায়না ঠিকই, তবে বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রন্থে তিনি ভিন্ন ভিন্ন রূপে ধরা দিয়েছেন। *বৃহদারণ্যকোপনিষদে* সংবৎসরের অবয়বস্বরূপ দ্বাদশ মাসই দ্বাদশ আদিত্য। গণদেবতা অষ্টবসুর মধ্যে আদিত্য পঞ্চমস্থানে বিদ্যমান। *ছান্দোগ্যোপনিষদে* প্রাণসমূহকে 'আদিত্য' নাম দেওয়া হয়েছে। *নিরুক্ত* নামক নির্বচনগ্রন্থেও 'আদিত্য' একদিকে যেমন সূর্যেরই পোশাকি নাম অন্যদিকে দেবমাতা অদিতির পুত্র আদিত্য

এই পরিচয়েও আভূষিত হয়েছেন। এতদ ব্যতিরিক্ত অন্যান্য সংহিতা ও ব্রাহ্মণগ্রন্থে তিনি পূর্বোক্ত স্বরূপেই উল্লেখিত হয়েছেন।

৬.২.১. আদিত্য শব্দের নির্বচনসমূহ ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

নিম্নলিখিত একাধিক স্থানে আদিত্য শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে একাধিক নির্বচন লক্ষিত হয়, সেগুলি যথা-

নির্বচিত শব্দ	আকরগ্রন্থ	নির্বচন
আদিত্য	*ছান্দোগ্যোপনিষদ্*	প্রাণা বাবাদিত্যা এতে হীদং সর্বমাদদতে।[২২] [প্রাণসমূহ-ই আদিত্য, কারণ এরাই ভূতবর্গকে আদান বা গ্রহণ করে]।
	নিরুক্ত	আদিত্যঃ কস্মাত্। আদত্তে রসান্, আদত্তে ভাসং জ্যোতিষাম্। আদীপ্তো ভাসেতি বা। অদিতেঃ পুত্রঃ ইতি বা।[২৩] ['আদিত্য' নাম কেন হল। রশ্মিসমূহ দ্বারা ভৌমরস গ্রহণ করে, চন্দ্রাদি জ্যোতির্ময় পদার্থসমূহের জ্যোতি গ্রহণ করে অর্থাৎ আদিত্যের উদয়ে তাদের প্রভা নাশ হয়। নিজের দীপ্তিতে সমাবৃত হয়। অদিতির পুত্র তাই তাঁর নাম 'আদিত্য'।]
	সত্যার্থপ্রকাশ	অদিতি দো অবখণ্ডনে ন বিদ্যতে বিনাশো যস্য সোঽযমদিতিঃ, অদিতিরেব আদিত্যঃ।[২৪] [অদিতি শব্দ 'দো অবখণ্ডনে' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। যাঁর কোনো বিনাশ নেই তিনিই অদিতি। অদিতিই আদিত্য।]

ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রাণসমূহকে 'আদিত্য' বলা হয়েছে যেহেতু এগুলি ভূতবর্গকে আদান বা গ্রহণ করে। নির্বচনগত বিশ্লেষণ থেকে 'আ' এই উপসর্গ পূর্বক দানার্থক √দা-ধাতু থেকেই 'আদিত্য' শব্দ নিষ্পন্ন বলা যায় (আ - √দা-ধাতু = আদিত্য)।

নিরুক্ত-কার 'আদিত্য' শব্দের নির্বচনে একাধিক কারণ উল্লেখ করেছেন। এখানেও তিনি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেই নির্বচনটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। নির্বচনটি হল- "আদিত্যঃ কস্মাত্। আদত্তে রসান্, আদত্তে ভাসং জ্যোতিষাম্। আদীপ্তো ভাসেতি বা। অদিতেঃ পুত্রঃ ইতি বা"।[২৫] প্রথমেই বলা হয়েছে- 'আদিত্য' নাম কেন হল। পরবর্তী বাক্যসমূহে তার উত্তরে প্রথমেই বলা হয়েছে- আদিত্য নিজের রশ্মিসমূহ দ্বারা ভৌমরস গ্রহণ করে। দ্বিতীয়ত বলেছেন- আদিত্য চন্দ্রাদি জ্যোতির্ময় পদার্থসমূহের জ্যোতিও গ্রহণ করে অর্থাৎ আদিত্যের উদয়ে তাদের প্রভা নাশ হয় তৃতীয় কারণ হিসাবে বলেছেন- আদিত্য নিজের দীপ্তিতে সমাবৃত হয়। চতুর্থ হেতু হল, তিনি অদিতির পুত্র তাই তাঁর নাম 'আদিত্য'। প্রথম দুই কারণে 'আদত্তে' ক্রিয়াপদ থেকে 'আ' উপসর্গ পূর্বক √দা ধাতু থেকে

'আদিত্য' শব্দ নিষ্পন্ন করেছেন গ্রন্থকার। এছাড়াও পরের বিকল্পে 'আ' উপসর্গ পূর্বক √দীপ্-ধাতু থেকে 'আদিত্য' শব্দের উৎপত্তি বলা হয়েছে। অবশেষে অদিতির পুত্ররূপে 'অদিতেঃ অপত্যং পুমান্' এই বিগ্রহ দ্বারা (অদিতি + ঞ্য = আদিত্য) এইভাবে পদটি ব্যাকরণানুসারে সিদ্ধ হয়।

সত্যার্থপ্রকাশ গ্রন্থে 'আদিত্য' শব্দের নির্বচন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- "অদিতি দো অবখণ্ডনে ন বিদ্যতে বিনাশো যস্য সোঽযমদিতিঃ, অদিতিরেব আদিত্যঃ"[২৬] অর্থাৎ অদিতি শব্দ √দো-ধাতু (*দো অবখণ্ডনে* পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১১৪৮) থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। যাঁর কোনো বিনাশ নেই তিনিই অদিতি। নঞ্ অর্থে 'অ' এই উপসর্গপূর্বক √দো-ধাতুর সাথে 'ক্তিন্'-প্রত্যয় যুক্ত হয় (অ - √দো-ধাতু + তি)। তারপর 'দো' এর 'ও' 'ই' তে পরিণত হয় (অ-দি+তি = অদিতি)। এইভাবে 'অদিতি' পদটি গঠিত হয়। 'অদিতি' শব্দের উত্তর ভাবার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় (ষ্যঞ্) যুক্ত হয়ে 'আদিত্য' পদটি নিষ্পন্ন হয়। ঈশ্বরকে খণ্ডিত বা বিনাশ করা যায় না। এই অবিনাশী ধর্মের জন্যই তিনি 'আদিত্য'।

৬.২.২. নির্বচনগুলির তুলনা

- *ছান্দোগ্যোপনিষদে* প্রাণসমূহ (ইন্দ্রিয়গণ ও প্রাণবায়ু) 'আদিত্য' নামে অভিহিত হয়েছেন কিন্তু *নিরুক্তে* নির্বচনস্থিত 'আদিত্য' শব্দ সূর্যের দ্যোতক এবং *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থে ঈশ্বরের নাম স্বরূপ।
- *ছান্দোগ্যোপনিষদ্* এবং *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থে 'আদিত্য' শব্দের নির্বচন একটি করে অর্থের প্রকাশক কিন্তু *নিরুক্তে* নির্বচনকৃত 'আদিত্য' শব্দ অনেকগুলি অর্থের বাহক।
- *ছান্দোগ্যোপনিষদে* দেখা যাচ্ছে 'আদিত্য' ভূতবর্গকে আদান করায় 'আদিত্য'। *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থে অদিতিই 'আদিত্য' নামে অভিহিত হয়েছে কিন্তু *নিরুক্তে* একাধিক কারণে তার নাম 'আদিত্য'। রশ্মিসমূহ দ্বারা ভৌমরস আদান করায় 'আদিত্য', চন্দ্রাদি পদার্থের জ্যোতি আদান করায় করায় তার নাম 'আদিত্য', নিজ দীপ্তিতে আদীপ্ত হওয়ায় সে আদিত্য আবার অদিতির পুত্র বলে 'আদিত্য'। আবার *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থে অবিনাশক হওয়ায় ঈশ্বর 'আদিত্য'।
- উপনিষদে তাঁর বিশেষ বিশেষ কর্মানুসারে নামকরণ করা হয়েছে কিন্তু *নিরুক্তে* তাঁর কর্মের সাথে বিশেষ গুণানুসারে অপত্য অর্থে নামকরণ করা হয়েছে। *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থেও বিশেষ গুণানুসারে নামকরণ করা হয়েছে।
- উপনিষদের নির্বচনে আ উপসর্গ পূর্বক √দা-ধাতু থেকে নিষ্পন্ন করা হয়েছে অর্থাৎ এখানে উপসর্গযুক্ত শব্দ হিসাবে নির্বচনটি করা হয়েছে কিন্তু *নিরুক্তে* 'আ' উপসর্গ পূর্বক √দা-ধাতু, 'আ' উপসর্গ পূর্বক √দীপ্-ধাতু, 'আ' উপসর্গ পূর্বক √দা-ধাতু ও √ইণ্-ধাতু নিষ্পন্ন হওয়ায় উপসর্গ যুক্ত একাধিক ধাতু দ্বারাও পদটি সিদ্ধ হয়েছে। *সত্যার্থপ্রকাশে* প্রত্যক্ষভাবে শব্দজ হলেও পরোক্ষভাবে অবশ্যই উপসর্গ পূর্বক ধাতু থেকে শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে বলা যায়।
- *নিরুক্তে* ও *সত্যার্থপ্রকাশ* উভয় গ্রন্থেই একই তদ্ধিতান্ত শব্দ আদিত্য ভিন্নভাবে উৎপন্ন হয়েছে। *নিরুক্তে* অদিতির পুত্র হিসাবে 'অদিতি + ঞ্য' এইভাবে তদ্ধিতান্ত শব্দরূপে নির্বচন করা হয়েছে কিন্তু *সত্যার্থপ্রকাশ গ্রন্থে* ভাবার্থে 'অদিতি + ষ্যঞ্' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'আদিত্য' শব্দটি নিষ্পন্ন করা যায়, এগুলি তাদ্ধিত নির্বচন নামেও পরিচিত।
- *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থে আদিত্য শব্দের নির্বচনে 'ন বিদ্যতে বিনাশো যস্য' এর অর্থ করা হয়েছে যাকে বিনাশ অর্থাৎ খণ্ডন করা যায়না। এইভাবে অর্থান্তর ঘটিয়ে *দো অবখণ্ডনে* ধাতু দ্বারা পদটি সিদ্ধ করে মূল শব্দের সাথে ক্রিয়ার মূলস্বরূপ ধাতুর ধ্বনি সাদৃশ্য ঘটানো হয়েছে, যেটি নির্বচনের এক বিশেষ

পদ্ধতি। কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থগুলিতে ক্রিয়াপদের সাথে আদিত্য শব্দের ধ্বনিগত সাদৃশ্য প্রত্যক্ষভাবেই বিদ্যমান।

৬.৩. জাতবেদা

বৈদিক সাহিত্যের একাধিক স্থানে 'জাতবেদা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। জাতবেদা শব্দের দ্বারা মূলত অগ্নিকেই (দেবতাকে) দ্যোতনা করা হয়। *ঐতরেয়ব্রাহ্মণে* অগ্নিমন্থনমন্ত্র আলোচনাকালে 'জাতবেদা' শব্দের দ্বারা আহ্বনীয় অগ্নিকে বোঝানো হয়েছে, আগ্নিমারুতশস্ত্রের অন্তর্গত জাতবেদার উদ্দিষ্ট সূক্তের বিধানকালে অগ্নিকেই 'জাতবেদা' বলা হয়েছে। আবার পুরোরুক্ নামক নিবিৎ মন্ত্রের বিধান কালে ব্রহ্মবাদীদের মতানুসারে প্রাণকেই 'জাতবেদা' বলা হয়েছে। *শতপথব্রাহ্মণে*ও প্রাণকে 'জাতবেদা' বলা হয়েছে। *নিরুক্তে*ও 'জাতবেদা' শব্দের দ্বারা পার্থিব অগ্নিকেই উল্লেখ করা হয়েছে।

৬.৩.১. জাতবেদস্ শব্দের নির্বচনসমূহ ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

ব্রাহ্মণ উত্তরকালে এই 'জাতবেদা' শব্দের অর্থপ্রসঙ্গে দুটি নির্বচন দর্শিত হয়, সেগুলি হল-

নির্বচিত শব্দ	আকরগ্রন্থ	নির্বচন
জাতবেদস্	*বৃহদ্দেবতা*	যদ্বিদ্যতে হি জাতঃ সঞ্ জাতৈর্যদ্বাত্র বিদ্যতে। তেনেমৌ তুল্যনামানৌ উভৌ লোকৌ সমাপ্নুতঃ।।[২৭] [যেটি (পার্থিব অগ্নি) জাত হওয়ার পর-ই জানা যায় অথবা যেটি (দিব্য অগ্নি) এখানে পৃথিবীলোকে জীবের দ্বারা জ্ঞাতব্য হয় বা জানা যায়। এইভাবে এই দুই অগ্নি সমান নামবিশিষ্ট অর্থাৎ 'জাতবেদস্' হয়ে পার্থিব ও দিব্য উভয়লোককে পৃথক পৃথক ভাবে ব্যাপ্ত করে আছে।] ভূতানি বেদ যজ্জাতো জাতবেদাথ কথ্যতে। যচ্চৈষ জাতবিদ্যোঽভূদ্ বিত্তং জাতোঽধিবেত্তি বা।।[২৮] [যেহেতু জন্ম নেওয়ার পর অগ্নি ভূতসমূহকে জানেন, তাই তাঁকে 'জাতবেদস্' বলা হয়। আবার যেহেতু যে অগ্নি 'জাতবিদ্য' হয়েছিলেন, জন্ম নেওয়ার পর তা অধিবেত্তি হয়] বিদ্যতে সর্বভূতৈর্হি যদ্বা জাতঃ পুনঃ পুনঃ। তেনৈষ মধ্যভাগেন্দ্রো জাতবেদা ইতি স্তুতঃ।[২৯] [যেহেতু বার বার জন্মগ্রহণ করায় প্রাণীরা তাঁকে জানতে পারে]

	নিরুক্ত	জাতবেদাঃ কস্মাত্। জাতানি বেদ, জাতানি বৈনং বিদুঃ। জাতে জাতে বিদ্যত ইতি বা। জাতবিত্তো বা জাতধনঃ। জাতবিদ্যো বা জাতপ্রজ্ঞানঃ।[৩০] [জাতবেদাঃ নামের হেতু কী? জাত বা উৎপন্ন সমস্ত কিছুকেই ইনি জানেন অথবা উৎপন্ন প্রাণীমাত্রই এনাকে জানেন অথবা যা যা উৎপন্ন সেই সমস্ততেই তিনি বিদ্যমান আছেন অথবা ইনি জাতবিত্ত বা জাতধন- তাঁর থেকেই ধন উৎপন্ন হয় অথবা ইনি জাতবিদ্য অর্থাৎ জাতপ্রজ্ঞান, ইনি নৈসর্গিক প্রজ্ঞানবিশিষ্ট।]

আচার্য শৌনক তাঁর *বৃহদ্দেবতা* গ্রন্থে 'জাতবেদা' শব্দটি অগ্নির রূপভেদ হিসাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে পার্থিব অগ্নি ও দিব্য অগ্নিকে 'জাতবেদস্' নামে অভিহিত করেছেন। এই শব্দের ব্যুৎপত্তি করেছেন-

যদ্বিদ্যতে হি জাতঃ সঞ্ জাতৈর্যদ্বাত্র বিদ্যতে।
তেনেমৌ তুল্যনামানৌ উভৌ লোকৌ সমাপ্নুতঃ।।[৩১]

যেটি (পার্থিব অগ্নি) জাত হওয়ার পর-ই জানা যায় অথবা যেটি (দিব্য অগ্নি) এখানে পৃথিবীলোকে জীবের দ্বারা জ্ঞাতব্য হয় বা জানা যায়। এইভাবে এই দুই অগ্নি সমান নামবিশিষ্ট অর্থাৎ 'জাতবেদস্' হয়ে পার্থিব ও দিব্য উভয়লোককে পৃথক পৃথক ভাবে ব্যাপ্ত করে আছে। এখানে জাত শব্দ দুটি অর্থের দ্যোতক, প্রথমটি উৎপন্ন বা জন্মগ্রহণ বোঝাচ্ছে এবং অপরটি জাত বা উৎপন্ন জীবের বোধক। অতএব এখানে জাত শব্দ জ্ঞানার্থক √বিদ্ ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পদটি নিষ্পন্ন হয়েছে (জাত-√বিদ্-ধাতু জ্ঞানার্থক)।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'জাতবেদস্' সম্পর্কে বলা হয়েছে- যেহেতু জন্ম নেওয়ার পর অগ্নি ভূতসমূহকে জানেন, তাই তাঁকে 'জাতবেদস্' বলা হয়। অতএব এখানে 'জাত' শব্দের দ্বারা অগ্নির উৎপন্ন হওয়া জ্ঞাপিত হয়েছে। অতএব এই নির্বচনে 'জাত - √বিদ্ ধাতুকে (জ্ঞানার্থক) শব্দটির মূল বলা যায়। আবার যেহেতু যে অগ্নি 'জাতবিদ্য' অর্থাৎ যাতে বিদ্যার (বেদের) জন্ম হয়েছে, অথবা যেহেতু জন্ম নেওয়ার পর তা অধিবেত্তি হয়, অথবা যেহেতু বার বার জন্মগ্রহণ করায় প্রাণীরা তাঁকে জানতে পারে, (অতএব মধ্যম-স্থান ইন্দ্রের মতো) এই অগ্নির 'জাতবেদস্' রূপে স্তুতি করা হয়- "ভূতানি বেদ যজ্জাতো জাতবেদাথ কথ্যতে। যচ্চৈষ জাতবিদ্যোঽভূদ্ বিত্তং জাতোঽধিবেত্তি বা।। বিদ্যতে সর্বভূতৈর্হি যদ্বা জাতঃ পুনঃ পুনঃ। তেনৈষ মধ্যভাগেন্দ্রো জাতবেদা ইতি স্তুতঃ"।।[৩২] 'জাতবিদ্য' শব্দের ক্ষেত্রে 'জাত + বিদ্যা' এই শব্দদ্বয় মূলস্বরূপ চিহ্নিত করা যায়, পরবর্তী নির্বচনটি জাত ও বিত্ত (জাত+ বিত্ত) শব্দদ্বয় নিষ্পন্ন বলা যায়। সমাসান্তর্গত বিগ্রহের ন্যায় শৌনকাচার্য 'জাতবেদস্' শব্দের নির্বচন করেছেন। নির্বচনগুলি ক্রিয়ার আধারেই প্রতিষ্ঠিত।

*নিরুক্ত*কার প্রশ্নোত্তরের আঙ্গিকে 'জাতবেদস্' শব্দের পাঁচটি নির্বচন করেছেন। যেমন- "জাতবেদাঃ কস্মাত্। জাতানি বেদ, জাতানি বৈনং বিদুঃ। জাতে জাতে বিদ্যত ইতি বা। জাতবিত্তো বা জাতধনঃ। জাতবিদ্যো বা জাতপ্রজ্ঞানঃ"[৩৩] অর্থাৎ জাত বা উৎপন্ন সমস্ত কিছুকেই ইনি জানেন অথবা উৎপন্ন প্রাণীমাত্রই এনাকে জানেন অথবা যা যা উৎপন্ন সেই সমস্ততেই তিনি বিদ্যমান আছেন অথবা ইনি জাতবিত্ত অর্থাৎ জাতধন- তাঁর থেকেই ধন উৎপন্ন হয় অথবা ইনি জাতবিদ্য অর্থাৎ জাতপ্রজ্ঞান, ইনি নৈসর্গিক প্রজ্ঞানবিশিষ্ট। অতএব 'জাতবেদস্' শব্দটি পার্থিব অগ্নির সর্বজ্ঞতা, সর্বব্যাপকতা, ধনসমূহের উৎপাদক তথা অধিষ্ঠিত দেবতা, নৈসর্গিক জ্ঞানের

অধিষ্ঠান বা আশ্রয় প্রভৃতি গুণের নিখুঁত বিশ্লেষণ। 'জাতবেদস্' শব্দটির নির্বচন অনুসারী বিশ্লেষণ করলে যথাক্রমে, 'জাত+ জ্ঞানার্থক √বিদ্ ধাতু', 'জাত + সত্তার্থক √বিদ্ ধাতু', 'জাত + বিত্ত', 'জাত + বিদ্যা' প্রভৃতি অঙ্গের অনুমান করা যায়।

৬.৩.২. নির্বচনগুলির তুলনা

- শৌনকাচার্য এবং *নিরুক্ত*-কার যাস্কাচার্য উভয়েই সমাসান্তর্গত বিগ্রহের ন্যায় 'জাতবেদস্' শব্দের নির্বচন করেছেন। উভয় স্থানেই একাধিক সংখ্যক নির্বচন দেখা যায় এবং প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক অর্থের দ্যোতক। অতএব বলা যায়, 'জাতবেদস্' শব্দের নির্বচন অনেকার্থক সমস্ত নির্বচনের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।
- শৌনকাচার্য কৃত *বৃহদ্দেবতা* গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে অবস্থিত নির্বচনে 'জাতবেদস্' শব্দ যথাক্রমে পার্থিব অগ্নি ও দিব্য অগ্নির বাচক কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ে মধ্যম-স্থানীয় অগ্নি রূপে বর্ণিত হয়েছে। আবার *নিরুক্ত* গ্রন্থে পার্থিব অগ্নিকে 'জাতবেদস্' বলা হয়েছে।
- শৌনকাচার্য কৃত *বৃহদ্দেবতা* গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে অবস্থিত নির্বচনে 'জাতবেদস্' শব্দ দুটি কারণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'জাতবেদস্' শব্দের নির্বচন চারটি কারণ বিশিষ্ট আধারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। করা হয়েছে। *নিরুক্ত*-কারও 'জাতবেদস্' শব্দের নির্বচনে পাঁচটি কারণ নির্বচনের আধার হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
- *বৃহদ্দেবতা* গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে অবস্থিত 'জাতবেদস্' শব্দের নির্বচনদ্বয়ের সাথে দ্বিতীয় অধ্যায়ে অবস্থিত চারটি নির্বচনের মধ্যে চতুর্থ নির্বচনের এবং যাস্কাচার্য কৃত দ্বিতীয় নির্বচনের ধ্বনিগত ও অর্থগত সমতা লক্ষ্য করা যায়।
- যাস্কাচার্য কৃত নির্বচনসমূহের মধ্যে, 'যা যা উৎপন্ন সেই সমস্ততেই তিনি বিদ্যমান আছেন' অর্থাৎ তাঁর সর্বব্যাপকতা ধর্মের জ্ঞাপক তৃতীয় নির্বচন ছাড়া *বৃহদ্দেবতা* গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে অবস্থিত চারটি নির্বচনের সাথে অর্থগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।
- দুর্গাচার্যের মতে "অর্থসামান্যং বলীয়ঃ শব্দসামান্যাত্"।[৩৪] অতএব, উভয় স্থানেই আকৃতিগতভাবে সমান এরকম 'জাতবেদস্' শব্দ উপস্থিত থাকলেও যেহেতু নির্বচনগুলির অর্থ ভিন্ন, তাই বলা যায় শব্দগুলি পরস্পর ভিন্ন।
- 'জাতবিদ্য' ও 'জাতবিত্ত' শব্দদুটির ক্ষেত্রে যথাক্রমে জাত + বিদ্যা এবং জাত + বিত্ত – এইভাবে দুই সুবন্ত পদের সমাস লক্ষ্য করা যায় কিন্তু বাকিগুলি সুবন্তপদ + ধাতু থেকে নিষ্পন্ন নির্বচন।

৬.৪. রুদ্র

সমগ্র বৈদিকসাহিত্যে রুদ্রদেবতা দুটি পরস্পর ভিন্নধর্মী সত্তায় অবতীর্ণ হয়েছেন। একদিকে তাঁর ক্রোধী, সংহারাত্মক অসৌম্যরূপ অন্যদিকে শান্ত, কল্যাণময় সৌম্যরূপ। ঋগ্বেদে তিনি অন্তরীক্ষস্থানের দেবতা ও মরুদ্গণের পিতা হিসেবেই অধিক প্রসিদ্ধ। এখানে রুদ্রদেবতার উদ্দেশ্যে চারটি সমগ্র সূক্তে, একটি সূক্তের একাংশে ও অন্য একটি সূক্তে সোমদেবতার সহিত তাঁর স্তুতি দেখা যায়। এই সংহিতায় রুদ্র হলেন বজ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে অধিক প্রকটিত হলেও চিকিৎসকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বৈদ্যরাজরূপেও চিহ্নিত হয়েছেন। ঋগ্বেদে (ঋগ্বেদসংহিতা ১/২৭/১০) অগ্নি দেবতাও রুদ্র রূপে স্তুত হয়েছেন। শুক্লযজুর্বেদেও দেখা যায় যিনি রুদ্র তিনিই শিব। সংহারক ও পালক উভয় ভূমিকাতেই যুগপৎ অবতীর্ণ হয়েছেন। ব্রাহ্মণ ও পৌরাণিকযুগে রুদ্র শিবেরই নামান্তর। ঐতরেয়ব্রাহ্মণ অনুসারে দেবতাদের ঘোর রূপ থেকে রুদ্রের উৎপত্তি।

অনুসারে পরমাত্মা প্রকৃতিস্থিত তমোগুণ দ্বারা রুদ্রকে সৃষ্টি করেছেন। *দেবীভাগবতে* বলা হয়েছে প্রকৃতি-পুরুষ উভয়েই নিজেদের মধ্যে স্থিত তমোগুণ দ্বারা রুদ্রকে উৎপন্ন করেছেন।

৬.৪.১. রুদ্র শব্দের নির্বচনসমূহ ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

বিভিন্ন গ্রন্থে অবস্থিত 'রুদ্র' শব্দের নির্বচন থেকে রুদ্রদেবতার 'রুদ্র' নামকরণের কারণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। নির্বচনগুলি হল-

নির্বচনকৃত শব্দ	আকরগ্রন্থ	নির্বচন
রুদ্র	*ছান্দোগ্যোপনিষদ্*	প্রাণা বাব রুদ্রা, এতে হীদং সর্বং রোদযন্তি।[৩৫] [প্রাণসমূহ-ই রুদ্র কারণ তাঁরা ভূতবর্গকে রোদন করান]
	নিরুক্ত	রুদ্রো রৌতীতি সতঃ। রোরূযমাণো দ্রবতীতি বা। রোদয়তের্বা যদরুদত্তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বম্ ইতি কাঠকম্। যদরোদীত্তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বমিতি হারিদ্রবিকম্।[৩৬] (১০/৫) [রুদ্র শব্দ করেন অথবা অত্যধিক শব্দ করতে করতে চলে যান অথবা রোদন করান। যেহেতু রোদন করেছিলেন তাতেই রুদ্রের রুদ্রত্ব কাঠকশাখা অনুসারে। হারিদ্রব শাখার (মৈত্রায়নী শাখা) প্রবচন অনুযায়ী যেহেতু রোদন করেছিলেন তাই রুদ্রের রুদ্রত্ব।]
	বৃহদ্দেবতা	অরোদীদন্তরিক্ষে যদ্ব বিদ্যুদ্বৃষ্টিং দদন্নৃনাম্। চতুর্ভির্ঋষিভিস্তেন রুদ্র ইত্যভি সংস্তুতঃ।[৩৭] [যেহেতু তিনি (ইন্দ্র) অন্তরীক্ষে গর্জন করতে করতে মানুষের জন্য বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি সৃষ্টি করেন, অতএব চার ঋষি তাঁকে রুদ্ররূপে অত্যধিক স্তুতি করেন।]
	সত্যার্থপ্রকাশ	রুদ্রি অশ্রুবিমোচনে যো রোদযত্যন্যাযকারিণো জনান্ স রুদ্রঃ।[৩৮] [যিনি দুষ্কর্মকারীদিগকে রোদন করান তিনি রুদ্র নামে অভিহিত হন।]

ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রাণসমূহকে রুদ্রগণ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। প্রাণসমূহ-ই রুদ্র কারণ তাঁরা ভূতবর্গকে রোদন করান- "প্রাণা বাব রুদ্রা, এতে হীদং সর্বং রোদযন্তি"।[৩৯] অতএব রোদনার্থক √রুদ্-ধাতু (*রুদির্ অশ্রুবিমোচনে,* ১০৬৭) থেকেই রুদ্র শব্দ নিষ্পন্ন বলা যায়।

নিরুক্তকার রুদ্রগণের 'রুদ্র' নামের চারটি কারণ দর্শিত হয়। প্রথমেই বলছে 'রুদ্র রৌতি'[৪০] অর্থাৎ শব্দ করেন। অতএব শব্দার্থক √রু-ধাতু (*রু শব্দে,* পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১০৩৪) থেকে কর্তৃবাচ্যে রুদ্র শব্দ উৎপন্ন হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ হিসাবে বলা হয়েছে- "রোরূযমাণো দ্রবতীতি বা"[৪১] - অথবা মেঘের উদরস্থিত 'রুদ্র'

অত্যধিক শব্দ করতে করতে চলে যান। গ্রন্থকার এখানে শব্দার্থক √রু-ধাতু এবং গত্যর্থক √দ্রু-ধাতুর (*দ্রু গতৌ*, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ৮৪৫) যোগে 'রুদ্র' শব্দের উৎপত্তি। রুদ্র শত্রুগণকে রোদন করান অর্থাৎ সন্তপ্ত করেন তাই তিনি 'রুদ্র। এখানে 'রোদযতেঃ' ক্রিয়াপদটি ণিজর্থ √রুদ্ ধাতুর রূপ, অর্থাৎ ণিজর্থ √রুদ্ ধাতু থেকে রুদ্র শব্দের উৎপত্তি। নিজের ব্যাখ্যার সমর্থকরূপে কঠশাখার প্রবচনও উল্লেখ করেছেন, সেটি হল- "যদরুদত্তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বম্ ইতি কাঠকম্"[৪২] অর্থাৎ যেহেতু রোদন করেছিলেন তাতেই রুদ্রের রুদ্রত্ব। মৈত্রায়ণী সংহিতার হারিদ্রব শাখার (মৈত্রায়ণী শাখা) প্রবচন অনুযায়ী যেহেতু রোদন করেছিলেন তাই রুদ্রের রুদ্রত্ব- "যদরোদীত্তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বমিতি হারিদ্রবিকম্"।[৪৩]

বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে ইন্দ্র নামান্তরসমূহের ব্যাখ্যাকালে 'রুদ্র' শব্দ ব্যাখ্যাত হয়েছেন। এখানে 'রুদ্র' ইন্দ্রের-ই নামান্তর মাত্র। 'রুদ্র' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- "অরোদীদন্তরিক্ষে যদ্ব বিদ্যুদ্বৃষ্টিং দদন্নৃনাম্। চতুর্ভির্ঋষিভিস্তেন রুদ্র ইত্যভি সংস্তুতঃ"।[৪৪] যেহেতু তিনি (ইন্দ্র) অন্তরীক্ষে গর্জন করতে করতে মানুষের জন্য বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি সৃষ্টি করেন, অতএব চার ঋষি তাঁকে রুদ্ররূপে অত্যধিক স্তুতি করেন।

সত্যার্থপ্রকাশ গ্রন্থে ঈশ্বরনাম ব্যাখ্যাকালে ঈশ্বরের 'রুদ্র' নামের ব্যুৎপত্তি করা হয়েছে, সেটি হল- "রুদ্রি অশ্রুবিমোচনে যো রোদযত্যন্যাযকারিণো জনান্ স রুদ্রঃ"।[৪৫] যিনি দুষ্কর্মকারীদিগকে রোদন করান তিনি 'রুদ্র' নামে অভিহিত হন। গ্রন্থকারের মতে √রু-ধাতুর (*রুদির্ অশ্রুবিমোচনে* পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১০৬৭) সাথে 'ণিচ্'(অ) প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'রুদ্র' শব্দ সিদ্ধ হয়।

৬.৪.২. নির্বচনগুলির তুলনা

- *ছান্দোগ্যোপনিষদে* প্রাণসমূহ (ইন্দ্রিয়গণ ও প্রাণসমূহ বা প্রাণবায়ু) 'রুদ্র' নামে অভিহিত হয়েছেন, কিন্তু *নিরুক্তে* নির্বচনস্থিত রুদ্র পিনাকধারী ও মরুৎপিতা এবং *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থে রুদ্র পরমেশ্বরের নামান্তর, তিনিই আবার *বৃহদ্দেবতায়* ইন্দ্রের বাচক।
- *নিরুক্তে* রুদ্র এই একটি শব্দের নির্বচনে আধারস্বরূপ একাধিক কারণ উল্লেখিত হয়েছে কিন্তু অন্য গ্রন্থগুলিতে রুদ্র শব্দের উৎপত্তির একটিই কারণ দেখানো হয়েছে।
- *ছান্দোগ্য উপনিষদে* রুদ্র ভূতবর্গকে রোদন করানোর জন্য রুদ্র, *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থে দুষ্কর্মকারীদের রোদনকারক হওয়ায় তিনি 'রুদ্র'। *বৃহদ্দেবতায়* অন্তরীক্ষে গর্জনকারী রূপে 'রুদ্র'। *নিরুক্তে* শব্দকারী রূপে 'রুদ্র', শব্দ করতে করতে গমন করেন বলে 'রুদ্র', রোদন করানোর জন্য 'রুদ্র' আবার রোদনকারী হিসাবে 'রুদ্র'।
- *ছান্দোগ্যোপনিষদে* এবং *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থে ণিজর্থ রোদনার্থক √রুদ্-ধাতু (রোদযতি) থেকে 'রুদ্র' শব্দ নিষ্পন্ন কিন্তু *নিরুক্তে* 'রোদয়তে' ক্রিয়াপদের দ্বারা ণিজর্থ √রুদ্-ধাতু, 'রোরূযমাণো দ্রবতি' ক্রিয়াপদের দ্বারা শব্দার্থক √রু-ধাতু, গত্যর্থক √দ্রু-ধাতুর দ্বারা রুদ্র শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও *বৃহদ্দেবতায়* শব্দার্থক √রু-ধাতু থেকে 'রুদ্র' শব্দ নিষ্পন্ন।
- *নিরুক্ত*-কার 'রুদ্র' শব্দের একটি নির্বচনে বলেছেন "রোরূযমাণো দ্রবতীতি বা"[৪৬] অর্থাৎ মেঘের উদরস্থিত 'রুদ্র' অত্যধিক শব্দ করতে করতে চলে যান। এখানে শব্দার্থক √রু-ধাতু এবং গত্যর্থক √দ্রু-ধাতুর যোগে 'রুদ্র' শব্দ উৎপন্ন হয়েছে। অতএব এই নির্বচনটি একাধিক ধাতু নিষ্পন্ন অসমস্ত নির্বচন বলা যায় কিন্তু এটি ছাড়া নিরুক্তস্থিত অন্য নির্বচনগুলিতে এবং অন্যান্য গ্রন্থস্থিত নির্বচনগুলিতে যেহেতু 'রুদ্র' শব্দ একটি ধাতু থেকেই নিষ্পন্ন করা হয়েছে তাই সেগুলি একধাতুজ নির্বচন বলা যায়।

- সব গ্রন্থগুলিতেই ক্রিয়ার আধারে নির্বচনগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ক্রিয়াপদের সাথে মূল রুদ্র শব্দের ধ্বনিগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

৬.৫. বরুণ

বৈদিকবাঙ্ময়ে বরুণ মুখ্যতঃ অন্তরীক্ষস্থানীয় দেবতা। *নিরুক্ত* ও *তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে* অদিতির আট পুত্রের মধ্যে তাঁকে স্থান দেওয়া হয়েছে। আচার্য সায়ণের মতে অস্তগত সূর্যই বরুণ- "অস্তংগচ্ছন্ সূর্য এব বরুণঃ"।[৪৭] *শতপথব্রাহ্মণে, তৈত্তিরীয়* ও *গোপথব্রাহ্মণে* তাঁকে জলাধিপতি বলা হয়েছে। বৈদিক বরুণদেব ইরানীয় ধর্মগ্রন্থে 'Ahura Mazda' রূপে পরিচিত। *আবেস্তায়* তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। অধ্যাপক ব্লুমফিল্ড গ্রীক Ouranos এবং বৈদিক বরুণদেবকে অভিন্ন বলে মনে করেন। *ঋগ্বেদসংহিতা* অনুসারে বরুণ সমস্ত প্রাণীদের রাজা- "ত্বং বিশ্বেষাং বরুণাসি রাজা, যে চ দেবা অসুর যে চ মর্তাঃ"।[৪৮] তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট তিনি ঋতের রক্ষক, নৈতিকতার ধারক। ম্যাকডোনালমহোদয় বলেছেন- "Varuna is the upholder of physical and moral order(ṛta)".[৪৯]

৬.৫.১. বরুণ শব্দের নির্বচনসমূহ ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

দেবতাবাচক বা অস্তগামী সূর্যবাচক বরুণ শব্দের একাধিক ব্যুৎপত্তি লক্ষ্য করা যায়, যেমন-

নির্বচন কৃত শব্দ	আকরগ্রন্থ	নির্বচন
বরুণ	*নিরুক্ত*	বরুণো বৃণোতীতি সতঃ।[৫০] [বরুণ আকাশ আবৃত করে]
	বৃহদ্দেবতা	ত্রীণীমান্যাবৃণোত্যেকো মূর্তেন তু রসেন যত্। তযৈনং বরুণং শক্ত্যা স্তুতিষ্বাহুঃ কৃপন্যবঃ।।[৫১] [যেহেতু তিনি একাই স্থূল আর্দ্রতা বা রসের দ্বারা এই পৃথিব্যাদি তিন লোককে আবৃত করে আছেন, অতএব তাঁর এই কর্মের জন্যই ঋষিগণ তাঁকে (ইন্দ্রকে) বরুণ নামে স্তুতি করেন।]
	সত্যার্থপ্রকাশ	বৃঞ্ বরণে, বর ঈপ্সায়াম্ যঃ সর্বান্ শিষ্টান্ মুমুক্ষূন্ধর্মাত্মনো বৃণোত্যথবা যঃ শিষ্টৈর্মুমুক্ষভির্ধর্মাত্মভির্বিযতে বর্য্যতে বা স বরুণঃ পরমেশ্বরঃ।[৫২] [যিনি শিষ্ট, মুক্তিকামী এবং ধর্মাত্মাদের বরণ করেন অথবা যিনি শিষ্ট, মুক্তিকামী এবং ধর্মাত্মাদের দ্বারা স্বীকৃত হন সেই পরমেশ্বর হলেন বরুণ।]

যাস্কাচার্য তাঁর *নিরুক্ত* গ্রন্থে বরুণ শব্দের নির্বচন প্রসঙ্গে একটি কারণ উল্লেখের দ্বারাই নির্বচন করেছেন। তাঁর মতে- "বরুণো বৃণোতীতি সতঃ"[৫৩] অর্থাৎ 'বরুণ' শব্দ কর্তৃবাচ্যে আচ্ছাদনার্থক √বৃ-ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। বরুণ মেঘজালে আকাশ আবৃত করে তাই আবরণার্থক √বৃ-ধাতু থেকে বরুণ শব্দের উৎপত্তি। নির্বচনে 'সতঃ' এই

পদটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যাস্কাচার্যকৃত নির্বচনশৈলীর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট 'সতঃ' পদের প্রয়োগ। 'সৎ' শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে সতঃ এই পদটি হয়। কোনও শব্দের ব্যুৎপত্তিপ্রদর্শন প্রসঙ্গে সৎ শব্দের প্রয়োগ হলে বুঝতে হবে যে ক্রিয়াপদটির দ্বারা ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করা হয়, সেই ক্রিয়াপদটি যে কারকের সাথে যুক্ত থাকে সেই কারকে বা বাচ্যেই শব্দটি নিষ্পন্ন। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। অতএব যাস্কাচার্য আচ্ছাদনার্থক √বৃ-ধাতু থেকে 'বরুণ' শব্দ নিষ্পন্ন করেছেন।

বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে বরুণকে ইন্দ্রের নামান্তর হিসাবে দেখানো হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী একাই স্থূল আর্দ্রতা দ্বারা পৃথিব্যাদি তিন লোকে আবরণ সৃষ্টি করায় ঋষিগণ কর্তৃক 'বরুণ' নামে স্তুত হন। এখানে আবরণার্থক √বৃ-ধাতু থেকে 'বরুণ' শব্দ সিদ্ধ করা যায়।

সত্যার্থপ্রকাশ গ্রন্থে ঈশ্বরের নামান্তর স্বরূপ 'বরুণ' শব্দের নির্বচনে দেখা যায়- শিষ্ট, মুক্তিকামী এবং ধর্মাত্মাদের বরণ বা স্বীকার করেন অথবা তাঁদের দ্বারা স্বীকৃত হওয়ায় পরমেশ্বর নাম বরুণ। গ্রন্থকার *বৃঞ্ বরণে* (১২৫৪, ১৪৮৬) ও *বর ঈপ্সায়াম্* ধাতুর সাথে উণাদি 'উনন্' প্রত্যয় যুক্ত করে 'বরুণ' শব্দটি সিদ্ধ করেছেন।

৬.৫.২. নির্বচনগুলির তুলনা

- *নিরুক্ত*-কার যাস্কাচার্য সতঃ শব্দের প্রয়োগ দ্বারা নির্বচনটি প্রতিষ্ঠা করেছেন, কিন্তু অন্য দুই গ্রন্থে এটি অনুপস্থিত।
- *নিরুক্তে* এবং *বৃহদ্দেবতা* গ্রন্থে 'বরুণ' শব্দের নির্বচনে একটিই কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থে একাধিক কারণ উল্লেখ করা হয়েছে।
- তিনটি গ্রন্থেই 'বরুণ' শব্দের নির্বচনগুলি দেবতার কর্মানুসারে করা হয়েছে এবং নির্বচনগুলি ধাতুজ নির্বচনের অন্তর্গত।
- তিনটি গ্রন্থেই নির্বচনান্তর্গত 'বৃণোতি', 'ব্রিযতে', 'বর্যতে' ইত্যাদি ক্রিয়াপদের সাথে 'বরুণ' শব্দের আংশিক ধ্বনিগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।
- *নিরুক্তে* 'বরুণ' শব্দটি 'বরুণ-দেবতা' রূপেই নির্বচিত হয়েছে কিন্তু *বৃহদ্দেবতা* গ্রন্থে ইন্দ্রের নামান্তর হিসাবে 'বরুণ' শব্দের নির্বচন করা হয়েছে এবং *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থে 'বরুণ' শব্দ ঈশ্বরের নামান্তর।
- *নিরুক্তে* ও *বৃহদ্দেবতা* গ্রন্থে আবরণার্থক √বৃ-ধাতু থেকে 'বরুণ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে কিন্তু *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থে √বৃ-ধাতু (*বৃঞ্ বরণে* পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১২৫৪, ১৪৮৬) ও *বর ঈপ্সায়াম্* (পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১৮৫২) ধাতু দুটি দ্বারা 'বরুণ' শব্দ উৎপন্ন হয়েছে।
- *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থের নির্বচনটি ব্যাখ্যাকালে √বৃ-ধাতুর উত্তর 'উনন্'-প্রত্যয় যোগে পদটি সিদ্ধ হওয়ার কথা বলা হয়েছে, যেটি অন্য দুই গ্রন্থে অনুপস্থিত।
- *নিরুক্তে* বরুণদেবতা মেঘজালে আকাশ আবরণকারী রূপে ধরা অবতীর্ণ হয়েছেন, *বৃহদ্দেবতায়* দেখা যাচ্ছে তিনি রসের দ্বারা তিন লোকের আবরণকারী এবং *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থে তিনিই আবার শিষ্ট ধর্মাত্মাদের রক্ষক ও মুক্তিদাতা। তিন গ্রন্থে তিন রূপে দর্শিত হলেও এই সবই তাঁর বৈদিক পরম্পরা (*ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ, তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ*) অনুযায়ী প্রাপ্ত 'জলাধিপতি', 'ধৃতব্রত', 'ঋতব্রত', 'সকল বন্ধনের মুক্তিদাতা' ইত্যাদি বৈশিষ্টেরই অনুগমন মাত্র।

৬.৬. বিষ্ণু

পৌরাণিকযুগে বিষ্ণু অন্যতম প্রধান দেবতার স্থান লাভ করেন কিন্তু বৈদিকযুগের অন্তর্গত ঋগবেদসংহিতায় মাত্র পাঁচটি সূক্তে বিষ্ণুর স্তব করা হয়েছে। এই বিষ্ণুকে 'ত্রিবিক্রম' বলা হয়। বলিরাজার পৌরাণিক উপাখ্যানে

দেখা যায় কীভাবে বিষ্ণু তিনটি মাত্র পদক্ষেপে যথাক্রমে স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল অধিকার করেন। বিষ্ণুদেবতার এই ত্রিবিক্রমের কাহিনী ঋগ্বেদের সূক্তেও বর্ণিত হয়েছে-

ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্।[৫৪]

অর্থাৎ পরমাত্মারূপ বিষ্ণু নিজের তিন পদক্ষেপে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোককে ব্যাপ্ত করেন। নিরুক্তাচার্য শাকপূণি ঔর্ণবাভ ও দুর্গাচার্যের মতে এই মন্ত্রে 'বিষ্ণু' শব্দ সূর্যের বাচক। ঔর্ণবাভর মতে বিষ্ণুর তিনটি পদক্ষেপ যথাক্রমে উদীয়মান, মধ্যাহ্নকালীন ও অস্তগামী সূর্যের তিনটি স্থান। দুর্গাচার্যের মতে সূর্যরূপে আকাশে অবস্থান, বিদ্যুৎ রূপে অন্তরীক্ষে অবস্থান এবং অগ্নিরূপে পৃথিবীতে অবস্থান হল বিষ্ণুর তিন পদক্ষেপ। ঋগ্বেদে এটাও বলা হয়েছে যে, সর্বব্যাপী পরমাত্মারূপ 'বিষ্ণু' প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে জীবাত্মা রূপে বাস করেন এবং জ্ঞানী পুরুষ তাঁকে সেইভাবেই দেখেন যেভাবে জীব আকাশে সূর্যকে দেখতে পায়-

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরযঃ।
দিদীব চক্ষুরাত্মন্।[৫৫]

*বিষ্ণুপুরাণে*ও পরমাত্মারূপ তাঁকে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারকর্তা বলা হয়েছে। *শতপথব্রাহ্মণে* বলা হয়েছে বিষ্ণুর ছিন্ন মস্তকই সূর্যরূপে পরিণত হয়েছে। *তৈত্তিরীয়সংহিতায়* বিষ্ণুকে পর্বতের অধিপতি বলা হয়েছে।

৬.৬.১. বিষ্ণু শব্দের নির্বচনসমূহ ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

বৈদিক ও লৌকিকসাহিত্যের একাধিক অংশে নির্বচন পদ্ধতি দ্বারা 'বিষ্ণু' শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেগুলি হল-

নির্বচনকৃত শব্দ	আকরগ্রন্থ	নির্বচন
বিষ্ণু	*ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা*	বেবেষ্টি ব্যাপ্নোতি চরাচরং জগৎ স বিষ্ণুঃ।[৫৬] [যিনি চরাচরাত্মক জগৎকে অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যা কিছু বিদ্যমান, এই সব কিছুই ব্যাপ্ত করে আছেন সেই পরমেশ্বর হলেন বিষ্ণু।] বেবেষ্টি ব্যাপ্নোতি সর্বং জগৎ স বিষ্ণুঃ।[৫৭] [যিনি সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত করে আছেন সেই পরমেশ্বর হলেন বিষ্ণু।]
	নিরুক্ত	অথ যদ্বিষিতো ভবতি তদ্বিষ্ণুর্ভবতি। বিষ্ণুর্বিশতের্বা। ব্যশ্নোতের্বা।[৫৮] [অথ অর্থাৎ পূষাবস্থা অতিক্রম করার পর যখন আদিত্য রশ্মিসমূহে পরিব্যাপ্ত হন তখন তাঁর নাম হয় বিষ্ণু, এই বিষ্ণু শব্দ √বিশ্-ধাতু অথবে বি-√অশ্-ধাতু থেকে উৎপন্ন।

	বৃহদ্দেবতা	বিষ্ণোতের্বিশতের্বা স্যাদ্ বেবেষ্টে-র্ব্যাপ্তিকর্মণঃ। বিষ্ণুর্নিরুচ্যতে সূর্যঃ সর্বং সর্বান্তরশ্চ যঃ।।[৫৯] [ব্যাপ্তি বোধক বিষ্ণু এই নাম 'বিষ্' ধাতু (বিষ্ণাতি) অথবা 'বিশ্' ধাতু (বিশতি) অথবা 'বিষ্লৃ' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে, যিনি সূর্য বাহ্যাভ্যন্তরসহ সব পদার্থেই ব্যাপ্ত।]
	মহাভারত	বৃহত্ত্বাদ্ বিষ্ণুরুচ্যতে।[৬০] বিষ্ণুর্বিক্রমনাদ্।[৬১] [যেহেতু তিনি বৃহৎ অর্থাৎ সর্বব্যাপক তাই তাঁকে বিষ্ণু বলা হয়। বিক্রমণ হেতু তিনি বিষ্ণু।] গতিশ্চ সর্বভূতানাং প্রজনশ্চাপি ভারত! ব্যাপ্তা মে রোদসী পার্থ! কান্তিশ্চাভ্যাধিকা মম।। অধিভূতানি চান্তেষু তদিচ্ছংশ্চাস্মি ভারত! ক্রমণাচ্চাপ্যহং পার্থ! বিষ্ণুরিত্যভিসংজ্ঞিত।।[৬২] [তিনি সর্বভূতের গতি বলে বিষ্ণু কিংবা তাঁর থেকে সর্বভূত উৎপন্ন হয়েছে বলে তিনি বিষ্ণু অথবা তিনি স্বর্গ ও মর্ত্য ব্যাপ্ত করে আছেন বা তাঁর কান্তি সর্বাপেক্ষা অধিক কিংবা প্রলয়কালে তিনি নিজ দেহে সমস্ত ভূত প্রবেশ করাতে ইচ্ছা করেন এবং তিনি বামনরূপে সমগ্র জগৎ আক্রমণ করেছিলেন, এইসব কারণে তাঁকে বিষ্ণু বলা হয়।]
	সত্যার্থপ্রকাশ	বেবেষ্টি ব্যাপ্নোতি চরাচরং জগৎ স বিষ্ণুঃ।[৬৩] [চর ও অচর রূপ জগতে ব্যাপক বলেই পরমাত্মার নাম বিষ্ণু]।

আচার্য দয়ানন্দ সরস্বতী মহোদয় *ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা* গ্রন্থে বেদোৎপত্তি বিষয় আলোচনার সময় সর্বাগ্রে যজুর্বেদীয় প্রসিদ্ধ মন্ত্র উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করেছেন। মন্ত্রটির সারমর্ম হল- যজ্ঞ থেকেই ঋগ্বেদাদি চার বেদের

উৎপত্তি হয়েছে। মন্ত্রটির ব্যাখ্যাকালে ভাষ্যকার দয়ানন্দ 'যজ্ঞ' শব্দের দ্বারা সচ্চিদানন্দাদি লক্ষণযুক্ত, পূর্ণপুরুষ, সর্বহুত, সকলের উপাস্য ও পূজ্য সর্বশক্তিমান পরমব্রহ্মকে বুঝিয়েছেন। কে এই যজ্ঞবাচক পরম পুরুষ, পরম ব্রহ্ম- তার উত্তরে তিনি 'বিষ্ণু' নাম উল্লেখ করেছেন, যিনি তাঁর তিন পদক্ষেপে পৃথিবী, অন্তরীক্ষলোক ও দ্যুলোক ব্যাপ্ত করে আছেন- "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ..."।[৬৪]এই প্রসঙ্গেই 'বিষ্ণু' শব্দটির অর্থ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। নির্বচনস্থিত 'বেবেষ্টি' শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'ব্যাপ্নোতি'। যিনি চরাচরাত্মক জগৎকে অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যা কিছু বিদ্যমান, এই সব কিছুই ব্যাপ্ত করে আছেন সেই পরমেশ্বর হলেন 'বিষ্ণু' অর্থাৎ সর্বব্যাপকতারূপ বৈশিষ্টের নিরীখেই পরম ব্রহ্ম, পরমেশ্বর 'বিষ্ণু' নামে অভিহিত হয়েছেন। যিনি সর্বত্র বিরাজিত অর্থাৎ এমন কোনো বস্তু নেই, এমন কোনো বিষয় নেই, যেখানে তাঁর অবিদ্যমানতা বিদ্যমান। সেই সর্বব্যাপক যজ্ঞরূপ বিষ্ণুতেই চতুর্বেদের উৎপত্তি, অন্য কোথাও বা অন্য কারো দ্বারা নয়- "বিষ্ণোর্যজ্ঞস্য চ ব্যাপনসামান্যাত্তাদাত্ম্যব্যপদেশঃ"।[৬৫] উক্ত গ্রন্থের ত্রয়োদশতমে অধ্যায়ে যজ্ঞরূপ পরমেশ্বরের প্রতি আয়ু সহ সমস্ত পদার্থের সমর্পণ বর্ণনাকালে যজ্ঞরূপ পরমেশ্বর বলতে বিষ্ণুকেই বুঝিয়েছেন এবং পূর্বোক্ত ব্যুৎপত্তি অবিকৃতভাবেই উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়াও আচার্য দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁর *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থে প্রথম সমুল্লাসে ঈশ্বরনামব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিষ্ণুর পরমাত্মাবাচকত্বের প্রমাণস্বরূপ 'বিষ্ণু' শব্দের পূর্বোল্লিখিত ব্যাখ্যাটি প্রদর্শন করা হয়েছে। চর ও অচর রূপ জগতে ব্যাপক বলেই পরমাত্মার আর এক নাম বিষ্ণু। 'বিষ্লৃ ব্যাপ্তৌ (জুহোত্যাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১০৯৫) ধাতু থেকে শব্দটির ব্যুৎপত্তি করা হয়েছে।

যাস্কাচার্য তাঁর *নিরুক্তগ্রন্থে* সূর্যের বাচক আদিত্যকেই 'বিষ্ণু' নামে অভিহিত করা হয়েছে। পূষাবস্থা অতিক্রম করার পর আদিত্য রশ্মিসমূহে পরিব্যাপ্ত হলে তাঁর নাম হয় 'বিষ্ণু', এই শব্দ প্রবেশনার্থক √বিশ্-ধাতু (*বিশ প্রবেশনে* ১৪২৪) থেকে অথবা বি-পূর্বক ব্যাপ্ত্যর্থক √অশ্-ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। বিষ্ণু তীব্র রশ্মিসমূহ দ্বারা সর্বত্র প্রবিষ্ট হয়ে থাকেন। রশ্মিসমূহ দ্বারা সকল পদার্থকে ব্যাপ্ত করেন অথবা রশ্মিসমূহ দ্বারা নিজেই অত্যধিক পরিব্যাপ্ত হন।

শৌনক তাঁর *বৃহদ্দেবতা* গ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ে সূর্যের সবিতৃ, ভগ ইত্যাদি নামের তালিকায় বিষ্ণু শব্দ উল্লেখ করে শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করেছেন। তিনি বিষ্ণুকে সূর্য রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। ত্রিবিক্রম সূর্যরূপ বিষ্ণুর তিন পদক্ষেপ হিসাবে যেন তিন লোক প্রকাশমান হয়। তাঁর মতে- ব্যাপ্তি বোধক বিষ্ণু এই নাম √বিষ্-ধাতু (বিষ্ণাতি) অথবা √বিশ্-ধাতু (বিশতি) অথবা 'বিষ্লৃ' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে, যিনি সূর্য বাহ্যাভ্যন্তরসহ সব পদার্থেই ব্যাপ্ত।

বেদোত্তর লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যেও বৈদিক নির্বচন পদ্ধতির অনুবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। বৈয়াসিক মহাভারতের একাধিক স্থানে বিভিন্ন নামপদের অর্থ তথা তাৎপর্য নির্ণয়ের সাধন হল বৈদিক নির্বচনপদ্ধতি। *মহাভারত* এর অন্তর্গত উদ্যোগ ও শান্তি পর্বে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন নামের ব্যুৎপত্তি বর্ণনাকালে 'বিষ্ণু' এই নামকরণের কারণ স্বরূপ একাধিক নির্বচন করা হয়েছে। যেমন, উদ্যোগপর্বে বলা হয়েছে- "বৃহত্ত্বাদ্ বিষ্ণুরুচ্যতে" [৬৬]। বিষ্ণুর্বিক্রমণাদ্।[৬৭]

উদ্যোগপর্বে সঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণকে 'বিষ্ণু' নামে অভিহিত করেছেন এবং 'বিষ্ণু' নামের কারণ স্বরূপ বলেছেন, যেহেতু তিনি বৃহৎ অর্থাৎ সর্বব্যাপক তাই তাঁকে বিষ্ণু বলা হয়। বিক্রমণ হেতু তিনি বিষ্ণু। ব্যাপক ও ব্যাপ্তকারী উভয় ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। এখানে হেতু উল্লেখ করে নির্বচন প্রদর্শিত হয়েছে এবং ব্যাপ্ত্যর্থক বিষ্ ধাতুর সাথে ঔণাদিক ণুক্ প্রত্যয় সংযুক্ত হয়েছে।

শান্তিপর্বেও বিষ্ণু নামের নির্বচনটি হেতু উল্লেখের দ্বারাই প্রদর্শিত হয়েছে। একাধিক নির্বচন উল্লেখ করে বিষ্ণু নামের একাধিক কারণ দেখানো হয়েছে, যেগুলি বিষ্ণুরূপী শ্রীকৃষ্ণের গুণমাহাত্ম্যের দ্যোতক।

'ভারতকৌমুদীকার' নির্বচনগুলির অতুলনীয় ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি 'গতিঃ' শব্দের অর্থ করেছেন 'প্রবেশস্থানম্'। তদনুসারে 'বিশ্ প্রবেশনে' ধাতু থেকে বিষ্ণু শব্দের ব্যুৎপত্তি করেছেন। 'প্রজনঃ' বলতে 'প্রজায়তে জগদুৎপদ্যতে যস্মাদ্'[৬৮] এই অর্থ দ্বারা 'বিশেষেণ স্তৌতি নির্গচ্ছতীতি' বি উপসর্গ পূর্বক *ষ্টু প্রস্রবণে* ধাতু নিষ্পন্ন করেছেন 'বিষ্ণু' শব্দ। ব্যাপ্ত্যর্থে √বিষ্ ধাতু, অধিক কান্তি অর্থে *বিচ্ছ দীপ্তৌ,* অন্তে অর্থাৎ প্রলয়কালে সকল ভূতের প্রবেশস্থান হিসাবে *বিশ্ প্রবেশনে* ধাতু, অবশেষে জগত আক্রমণকারী বিষ্ণু শব্দকে 'বিশ ব্যাপ্তৌ' ধাতুনিষ্পন্ন করেছেন।

'ভারতভাবদীপকার' গত্যর্থক √বিচ্ছ্ (*বিচ্ছ গতৌ)* ধাতু, *বিচ্ছ দীপ্তৌ,* ব্যাপ্ত্যার্থে √বিষ্ ধাতু, সেচনার্থক 'বিষু সেচনে,' 'বিশ প্রবেশনে' ধাতু, 'ষ্ণু প্রস্রবণে' ধাতু সমূহ 'বিষ্ণু' শব্দের উৎপত্তির মূল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

৬.৬.২. নির্বচনগুলির তুলনা

- *ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা*গ্রন্থে বিষ্ণু শব্দ যজ্ঞ ও পরমেশ্বরবাচক, *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থেও পরমাত্মা বাচক তবে, *নিরুক্ত* ও *বৃহদ্দেবতা* গ্রন্থে সূর্যের বাচক এবং মহাভারতে তিনি শ্রীকৃষ্ণের নামান্তর। এক্ষেত্রে, যজ্ঞ ও সূর্যের সাথে বিষ্ণুর সাযুজ্য নিরূপণ নির্বচনকারের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির ইঙ্গিত বহন করে।
- *'ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা,' সত্যার্থপ্রকাশ, নিরুক্ত, বৃহদ্দেবতা* প্রভৃতি গ্রন্থে 'বিষ্ণু' শব্দের নির্বচন তিঙন্তপদের দ্বারা প্রদর্শিত হয়েছে কিন্তু মহাভারতে হেতুবাচক সুবন্তপদের দ্বারাও নির্বচন করা হয়েছে।
- সবকটি স্থানে 'বিষ্ণু' শব্দ সূর্য, যজ্ঞ, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি শব্দের বাচক হলেও *ঋগ্বেদসংহিতা*স্থিত সর্বব্যাপী পরমাত্মারূপ বৈদিক পরম্পরাকে অনুসরণ করেই নির্বচনগুলি আলোচিত হয়েছে।
- ক্রিয়াবোধক নির্বচনগুলিতে ক্রিয়াপদের সাথে 'বিষ্ণু' শব্দের ব্যাকরণ স্বীকৃত ধ্বনিসাম্য লক্ষ্য করা যায়। *মহাভারতা*ন্তর্গত উদ্যোগপর্বে হেতুপরক শব্দের সাথেও মূল শব্দের অর্থানুসারী ধ্বনিসাম্য লক্ষ্য করা যায় কিন্তু শান্তিপর্বে ব্যাপ্যধর্মীতা ছাড়া অন্য হেতুগুলির সাথে তা প্রত্যক্ষভাবে অনুপস্থিত।
- 'ভারতভাবদীপকার' হেতুবাচক শব্দের অর্থবিস্তারের দ্বারা ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করেছেন, যা অন্যান্য নির্বচনগুলির তুলনায় ভিন্নধর্মী।
- *মহাভারতে* 'বিষ্ণু' নামের নির্বচনকালে বৈদিক নির্বচনের পাশাপাশি পুরাণোক্ত বিষ্ণুর মহিমাও অনুসৃত হয়েছে।
- নিরুক্তস্থিত নির্বচনে আদিস্থিত 'বিষিতো ভবতি' এর অর্থ করা হয়েছে 'পরিব্যাপ্ত হয়' অথচ ধাতুনির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত্যর্থক *বিক্ষ্ ব্যাপ্তৌ* (জুহোত্যাদিগণ, ১০৯৫) ধাতুটি গ্রহণ করা হয়নি, এটির গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে বলেই মনে হয়।
- প্রজন শব্দবোধক 'বিষ্ণু' শব্দের নির্বচনে ধাতু নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ভারতকৌমুদীকার বি উপসর্গ পূর্বক *ষ্টু প্রস্রবণে* ধাতু নিষ্পন্ন করেছেন 'বিষ্ণু' শব্দ কিন্তু ভারতভাবদীপকার সেচনার্থক *বিষু সেচনে,* ধাতু উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও 'ভারতকৌমুদীকার' জগত আক্রমণকারী বিষ্ণু শব্দকে *বিশ ব্যাপ্তৌ* ধাতুনিষ্পন্ন করেছেন। কিন্তু ভারতভাবদীপকার *ষ্ণু প্রস্রবণে* ধাতুর কথা বলেছেন।
- *ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা, সত্যার্থপ্রকাশ* ও *মহাভারতের* উদ্যোগপর্বে বিষ্ণু এই একটি শব্দের-ই নির্বচনে আধার স্বরূপ একটি করেই কারণ উল্লেখিত হয়েছে কিন্তু *বৃহদ্দেবতা,* যাস্কাচার্যের *নিরুক্তে* এবং

মহাভারতের শান্তিপর্বে নির্বচনের আধার স্বরূপ 'বিষ্ণু' শব্দের উৎপত্তির একাধিক কারণ উল্লেখ করা হয়েছে।

৬.৭. হিরণ্যগর্ভ

ঋগ্বেদের অধিকাংশ দেবতারাই বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি থেকে কল্পিত হয়েছেন। কিন্তু হিরণ্যগর্ভের পিছনে কোনো প্রাকৃতিক ভিত্তি নেই। বরং ঋগ্বৈদিক ঋষিরা বহুদেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হলেও এই বহুদেবতার অন্তরালে একদেবতাবাদের অস্তিত্ব বিষয়ে তাঁদের মনের মধ্যে যে চিন্তার উদয় হয়েছিল, সেখান থেকেই 'হিরণ্যগর্ভ' দেবতার আবির্ভাব বলা যায়। পুরুষসূক্তে যে বিরাট পুরুষের উল্লেখ পাওয়া যায়, তিনিই হিরণ্যগর্ভসূক্তে 'হিরণ্যগর্ভ' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে স্রষ্টা ও সৃষ্টির আদিপুরুষরূপে অগ্রণী। তিনিই পরবর্তীকালে তৈত্তিরীয়সংহিতা সহ ব্রাহ্মণসাহিত্যে প্রজাপতি, উপনিষদ্ভাবনায় ব্রহ্ম ও পৌরাণিক সাহিত্যে ব্রহ্মারূপে সৃষ্টির একচ্ছত্র অধীশ্বর। মনুসংহিতা অনুসারে স্বর্ণময় অণ্ড থেকে হিরণ্যগর্ভের সমুৎপত্তি।

৬.৭.১. হিরণ্যগর্ভ নামের নির্বচনসমূহ ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

'হিরণ্যগর্ভ' শব্দের একাধিক নির্বচন দেখা যায়। নির্বাচিত গ্রন্থে প্রাপ্ত নির্বচনগুলির বিশ্লেষণ করা যাক-

নির্বচনকৃত শব্দ	আকরগ্রন্থ	নির্বচন
হিরণ্যগর্ভ	*নিরুক্ত*	হিরণ্যগর্ভো হিরণ্যময়ো গর্ভঃ হিরণ্যময়ো গর্ভোঽস্যেতি বা।[৬৯] [জ্যোতির্ময় বা বিজ্ঞানময় গর্ভ, যা সর্বভূতের অন্তঃপ্রকাশক। এই দেবতার গর্ভ বা কারণ হিরণ্ময়]।
	মহাভারত	হিরণ্যগর্ভো দ্যুতিমান্ য এষচ্ছন্দসি স্তুতঃ। যোগৈঃ সংপূজ্যতে নিত্যং স এবাহং ভুবি স্মৃতঃ।[৭০] [বেদে যাঁকে দীপ্তিশীল হিরণ্যগর্ভ নামে জানা যায় এবং যোগীরা যোগের দ্বারা সর্বদা যাঁকে ধ্যান করেন, পৃথিবীতে তিনি-ই সেই হিরণ্যগর্ভ।]
	সত্যার্থপ্রকাশ	যো হিরণ্যানাং সূর্যাদীনাং তেজসাং গর্ভোৎপত্তিনিমিত্তমধিকরণং স হিরণ্যগর্ভঃ।[৭১] [যাঁর নিমিত্ত সূর্যাদি তেজোময় লোকসমূহ উৎপন্ন হয়ে যাঁর আধারে অবস্থিত থাকে, অথবা যিনি সূর্যাদি তেজঃ স্বরূপ পদার্থসমূহের গর্ভ অর্থাৎ উৎপত্তি ও নিবাস-স্থান, সেই পরমেশ্বরের নাম হিরণ্যগর্ভ।]
	ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা	জ্যোতির্বিজ্ঞানং গর্ভঃ স্বরূপং যস্য স হিরণ্যগর্ভঃ। ...সর্বং হিরণ্যাখ্যং গর্ভে সামর্থ্যে যস্য স হিরণ্যগর্ভঃ পরমেশ্বরঃ।[৭২]

		[জ্যোতি অর্থাৎ বিজ্ঞান যার গর্ভস্বরূপ তিনি হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্যাখ্য যা কিছু বিদ্যমান সেই সমস্তই যাঁর গর্ভে বা স্বরূপে সামর্থ্য মধ্যে রয়েছে, এইরূপ পরমেশ্বরকে হিরণ্যগর্ভ বলা হয়।]

'নিরক্তকার' যাস্কাচার্য তাঁর নিরুক্তগ্রন্থে 'ক' অর্থাৎ প্রজাপতি দেবতা সম্বন্ধীয় হিরণ্যগর্ভ সূক্তের প্রথম মন্ত্র ব্যাখ্যা কালে 'হিরণ্যগর্ভ' শব্দের অর্থপ্রসঙ্গে নির্বচন উল্লেখ করেছেন। এখানে 'হিরণ্যময়ঃ গর্ভঃ' শব্দের অর্থ করা হয়েছে জ্যোতির্ময় বা বিজ্ঞানময় গর্ভ, যা সর্বভূতের অন্তঃপ্রকাশক। দ্বিতীয় বিকল্পটি বহুব্রীহিসমাস বিগ্রহবাক্য। এই দেবতার গর্ভ বা কারণ হিরণ্যময় অর্থাৎ সুনির্মল বা সর্বপ্রকার বিশেষ বর্জিত পরমাত্মা। এখানে 'হিরণ্য ও গর্ভ' এই দুই সুবন্ত শব্দ যোগে হিরণ্যগর্ভ শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে।

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী *ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা* গ্রন্থে বেদের বিষয় বিচারকালে 'হিরণ্যগর্ভ' শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন- জ্যোতি অর্থাৎ বিজ্ঞান যার গর্ভ এবং হিরণ্যবাচক সমস্তই যাঁর গর্ভে বা স্বরূপে বিদ্যমান সেই পরমেশ্বর হিরণ্যগর্ভ নামে পরিচিত। এখানে হিরণ্য বোধক শব্দগুলি হল- জ্যোতি ও বিজ্ঞান, অমৃত বা মোক্ষ, প্রকাশ স্বরূপ সূর্যাদি লোক, জীবাত্মা (জ্যোতি), যশ, কীর্তি ও ধন্যবাদ, জ্যোতি বা ইন্দ্র অর্থাৎ সূর্য, বায়ু ও অগ্নি। এখানেও বহুব্রীহি সমাস দ্বারা নির্বচনটি বিশ্লেষিত হয়েছে।

সত্যার্থপ্রকাশ গ্রন্থ অনুসারে 'হিরণ্যগর্ভ' সূর্যাদি তেজঃ স্বরূপ পদার্থসমূহের গর্ভ অর্থাৎ উৎপত্তি এবং নিবাস-স্থান।

মহাভারতে (শান্তিপর্বে) শ্রীকৃষ্ণ পৃথুনন্দন অর্জুনকে নিজের বিভিন্ন নামের ব্যাখ্যাকালে হিরণ্যগর্ভ শব্দেও নিজেকে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বৈদিকযুগের দ্যুতিমান হিরণ্যগর্ভ এবং যোগীদের দ্বারা নিত্য পূজ্য ছিলেন।

৬.৭.২. নির্বচনগুলির তুলনা

- *নিরুক্ত*-গ্রন্থে 'হিরণ্যগর্ভ' শব্দ পরমাত্মা বাচক। *ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা* ও *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থে 'হিরণ্যগর্ভ' শব্দ পরমেশ্বর বাচক। কিন্তু *মহাভারতে* শ্রীকৃষ্ণের বাচক।
- *নিরুক্ত*-কার 'হিরণ্য' শব্দ হিরণ্ময় শব্দের দ্যোতক এবং প্রথম নির্বচনে এই শব্দের অর্থ করেছেন জ্যোতির্ময় বা বিজ্ঞানময়। দ্বিতীয় নির্বচনে 'হিরণ্যময়' শব্দের অর্থ করেছেন 'সুনির্মল'। *ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা* গ্রন্থে হিরণ্য শব্দের দ্বারা হিরণ্যাখ্য যা কিছু বিদ্যমান তা সব-ই বুঝিয়েছেন। নিরুক্তকার কৃত জ্যোতিঃ ও বিজ্ঞান ছাড়াও অমৃত বা মোক্ষ, প্রকাশ স্বরূপ সূর্যাদি লোক, জীবাত্মা (জ্যোতি), যশ, কীর্তি ও ধন্যবাদ, জ্যোতি বা ইন্দ্র অর্থাৎ সূর্য, বায়ু ও অগ্নি ইত্যাদি অর্থ দ্যোতিত হয়েছে। *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থে 'হিরণ্য' শব্দের দ্বারা সূর্যাদি তেজঃ স্বরূপ পদার্থসমূহের কথা বলা হয়েছে।
- *নিরুক্ত*-গ্রন্থে, *ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা* ও *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থে 'হিরণ্যগর্ভ' শব্দের ব্যুৎপত্তি ব্যাকরণ অনুসারী সমস্তপদ হিসাবে প্রদর্শিত হয়েছে বিগ্রহবাক্য স্পষ্ট ও সহজবোধ্য। কিন্তু মহাভারতে উল্লিখিত বিগ্রহবাক্যটি পূর্বের মতো স্পষ্ট নয়।

- *নিরুক্ত* প্রভৃতি তিনটি বৈদিক গ্রন্থ হওয়ায় এগুলিতে 'হিরণ্যগর্ভ' শব্দের বেদানুসারী ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, কিন্তু মহাভারতে বৈদিক 'হিরণ্যগর্ভ' দ্যোতিত হলেও অতিরিক্তভাবে যোগসম্প্রদায়ের সাথে সাযুজ্য নির্মাণ করা হয়েছে।
- *ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা, সত্যার্থপ্রকাশ* ও *মহাভারতে* 'হিরণ্যগর্ভ' শব্দ বহুব্রীহিসমাস নিষ্পন্ন কিন্তু নিরুক্তকার বহুব্রীহি সমাস ছাড়াও কর্মধারয় সমাস দ্বারাও পদটি নিষ্পন্ন করেছেন।
- সর্বত্রই সুবন্তের সাথে সুবন্তের সমাস হয়েছে এবং মূল শব্দের সাথে শব্দাংশ দুটির অর্থ অনুযায়ী ধ্বনি সাম্য লক্ষ করা যায়।
- তিনটি গ্রন্থেই 'হিরণ্যগর্ভ' এই সমাসবদ্ধপদের পূর্ণ নির্বচন না দিয়ে বেশিরভাগভাগ ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র বিগ্রহবাক্য দ্বারা এবং কিছু স্থানে হিরণ্যশব্দের অর্থ উল্লেখ করেই নির্বচন করা হয়েছে। অতএব নির্বচনগুলিকে আংশিক নির্বচনও বলা যায়।

৬.৮. উপসংহার

নির্বচনগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অগ্নির অগ্নিত্ব, বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব, রুদ্রের রুদ্রত্ব ইত্যাদি বিবিধ আঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অর্থাৎ বৈদিক ও বেদোত্তর সাহিত্যে একই দেবতাবাচক শব্দ একাধিক সম ও ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে, যেগুলি তাঁদের নানা গুণ-মাহাত্ম্যেরই দ্যোতক।

তথ্যপঞ্জি

[১] অমরেশ্বর ঠাকুর (সম্পা.), *নিরুক্তম্* ৭/৫/২, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮৪৬।
[২] *তদেব* ৭/২৩/১৬, পৃষ্ঠাঙ্ক ৯১৪।
[৩] *তদেব* ৭/১৪/৩-৬, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮৮৬-৮৮৭।
[৪] রামকুমার রায় (সম্পা.), *বৃহদ্দেবতা* ১/১৭/৯১, পৃষ্ঠাঙ্ক ২২।
[৫] *তদেব* ২/৪/২৪, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৭।
[৬] দুর্গা প্রসাদ (সম্পা.), *সত্যার্থপ্রকাশঃ* ১/২, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৪।
[৭] অমরেশ্বর ঠাকুর (সম্পা.), *নিরুক্তম্* ৭/১৪/৩-৬, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮৮৬-৮৮৭।
[৮] তত্রৈব।
[৯] তত্রৈব।
[১০] তত্রৈব।
[১১] Paolo Visigalli, "Words In and Out of History: Indian Semantic Derivation (Nirvacana) and Modern in Itymology Dialogue". Page- 1144.
[১২] অমরেশ্বর ঠাকুর (সম্পা.), *নিরুক্তম্* ৭/১৪/৪, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮৮৬।
[১৩] মুকুন্দঝাশর্মণ্ (সম্পা.), *নিরুক্তম্* ৭/৪/১৪, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৬৯।
[১৪] তত্রৈব।
[১৫] অমরেশ্বর ঠাকুর (সম্পা.), *নিরুক্তম্* ৭/১৪/৫, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮৮৭।
[১৬] মুকুন্দঝাশর্মণ্ (সম্পা.), *নিরুক্তম্* ২/১/৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ৫৯।
[১৭] অমরেশ্বর ঠাকুর (সম্পা.), *নিরুক্তম্* ৭/১৪/৫, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮৮৭।
[১৮] রামকুমার রায় (সম্পা.), *বৃহদ্দেবতা* ১/৯১, পৃষ্ঠাঙ্ক ২২।

[১৯] *তদেব* ২/২৪, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৭।
[২০] দুর্গা প্রসাদ (সম্পা.), *সত্যার্থপ্রকাশঃ* ১/২, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৪।
[২১] তত্রৈব।
[২২] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্* ৩/১৬/৫।
[২৩] *নিরুক্তম্* ৩/১৩।
[২৪] দুর্গা প্রসাদ (সম্পা.) *সত্যার্থপ্রকাশঃ* (প্রথম অধ্যায়), পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৫।
[২৫] *নিরুক্তম্* ৩/১৩।
[২৬] দুর্গা প্রসাদ (সম্পা.) *সত্যার্থপ্রকাশঃ* (প্রথম অধ্যায়), পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৫।
[২৭] বৃহদ্দেবতা ১/৯২।
[২৮] *তদেব* ২/৩০।
[২৯] *তদেব* ২/৩১।
[৩০] *নিরুক্তম্* ৭/১৯।
[৩১] *বৃহদ্দেবতা* ১/৯২।
[৩২] *তদেব* ২/৩০।
[৩৩] *নিরুক্তম্* ৭/১৯।
[৩৪] তত্রৈব।
[৩৫] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্* ৩/১৬/৩।
[৩৬] *নিরুক্তম্* ১০/৫।
[৩৭] *বৃহদ্দেবতা* ২/৩৪।
[৩৮] দুর্গা প্রসাদ (সম্পা.) *সত্যার্থপ্রকাশঃ* (প্রথম অধ্যায়), পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৫।
[৩৯] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্* ৩/১৬/৩।
[৪০] *নিরুক্তম্* ১০/৫।
[৪১] তত্রৈব।
[৪২] তত্রৈব।
[৪৩] তত্রৈব।
[৪৪] *বৃহদ্দেবতা* ২/৩৪।
[৪৫] দুর্গা প্রসাদ (সম্পা.) *সত্যার্থপ্রকাশঃ* (প্রথম অধ্যায়), পৃষ্ঠাঙ্ক ।
[৪৬] *নিরুক্তম্* ১০/৫।
[৪৭] *ঋগ্বেদসংহিতা* ৭/৮৭/১।
[৪৮] *তদেব* ২/২৩/১/০।
[৪৯] *History of Sanskrit Literature*, P-61.
[৫০] *নিরুক্তম্* ১০/৩।
[৫১] *বৃহদ্দেবতা* ২/৩৩।
[৫২] দুর্গা প্রসাদ (সম্পা.) *সত্যার্থপ্রকাশঃ* (প্রথম অধ্যায়), পৃষ্ঠাঙ্ক ।
[৫৩] *নিরুক্তম্* ১০/৩।
[৫৪] *ঋগ্বেদসংহিতা* ১/২২/১৭।
[৫৫] *তদেব* ১/২২/২০।
[৫৬] *ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা* ১/১।
[৫৭] *তদেব* ১৩/৭।
[৫৮] *নিরুক্তম্* ১২/১৮।

[৫৯] রামকুমার রায় (সম্পা.), *বৃহদ্দেবতা* ২/৬৯, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৯।

[৬০] *মহাভারতম্* (বিশ্ববাণী প্রকাশনী) ৬৪/৪৯।

[৬১] *তদেব* ৭০/১৩।

[৬২] মহাভারতম্ (বিশ্ববাণী প্রকাশনী) ৩২৭/৩৯-৪০।

[৬৩] দুর্গা প্রসাদ (সম্পা.) *সত্যার্থপ্রকাশঃ* (প্রথম অধ্যায়), পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৭।

[৬৪] *শতপথব্রাহ্মণম্* ১/১/১/২/১৩।

[৬৫] তত্রৈব।

[৬৬] *মহাভারতম্* (বিশ্ববাণী প্রকাশনী) ৬৪/৪৯।

[৬৭] *তদেব* ৭০/১৩।

[৬৮] *মহাভারতম্* (বিশ্ববাণী প্রকাশনী) ৩২৭/৩৯-৪০, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৬২১।।

[৬৯] *নিরুক্তম্* ১০/২৩।

[৭০] *মহাভারতম্* (বিশ্ববাণী প্রকাশনী) ৩২৮/২৮২।

[৭১] দুর্গা প্রসাদ (সম্পা.) *সত্যার্থপ্রকাশঃ* (প্রথম অধ্যায়), পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৫।

[৭২] *ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা* (চতুর্থ অধ্যায়), পৃষ্ঠাঙ্ক ৮৯।

***

সপ্তম অধ্যায়
উপসংহার

বৈদিক সাহিত্যের আদিস্বরূপ সংহিতাভাগ নির্বচনের প্রথম উৎপত্তিস্থল হলেও এটির আঁতুর ঘর হল ব্রাহ্মণসাহিত্য। সামবেদ-সংহিতার অন্তর্গত *তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ, জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ, জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ* এই তিনটি শুদ্ধব্রাহ্মণগ্রন্থে এবং *ছান্দোগ্যোপনিষদ্* ও *কেনোপনিষদ্* এই গ্রন্থদুটিতে এমন অনেক বৈদিক শব্দ বিদ্যমান যেগুলি যৌগিক এবং পারিভাষিক উভয়ভাবেই বিরাজিত। এইসমস্ত শব্দের নির্বচনগুলির সামগ্রিক আলোচনা থেকে অবগত হওয়া যায় যে এগুলি বৈদিক সাহিত্যের গভীরতা আস্বাদনে অমৃতময় ভাণ্ডার। বিভিন্ন যাগযজ্ঞ প্রণালী, দেবতা, বৈদিকমন্ত্র প্রভৃতি বর্ণনাকালে প্রাসঙ্গিকরূপে স্থানে স্থানে নির্বচনগুলি প্রদর্শিত হয়েছে। এগুলি সেই সেই বৈদিকশব্দের শুধু অর্থ প্রদর্শনের ভূমিকায় অবতীর্ণ নয়, পাশাপাশি শব্দটি উৎপত্তির হেতু তথা ইতিহাস উন্মুক্ত আকাশের ন্যায় পাঠকের সামনে তুলে ধরেছে। কোনো কোনো সময় বিভিন্ন আখ্যান-উপাখ্যানের সরস উপস্থিতি নির্বচনগুলিকে তাদের পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য সাধনে অনন্যতা প্রদান করেছে। আচার্য যাস্ক *নিরুক্ত* গ্রন্থে যে নির্বচন-সিদ্ধান্ত বা নির্বচন-ধারার কথা বলেছেন, তদনুসারে নির্বচনগুলির শব্দার্থ বিশ্লেষণপূর্বক পদ্ধতি নিরূপণের প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ জানা যায়- যেসমস্ত স্থানে বৈদিক শব্দটির তৎপ্রযুক্ত অর্থ ব্যাকরণগত শব্দগঠনপ্রক্রিয়াকে অনুসরণ করছে, সেখানে ব্যাকরণগত সংস্কার অনুযায়ী নির্বচন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যত্র বৈদিক পরম্পরা অনুসারে প্রাপ্ত অর্থ প্রতিষ্ঠা করার জন্য কখনো, 'বর্ণবিপর্যয়', 'বর্ণলোপ', 'বর্ণাগম' প্রভৃতি ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়ম অবলম্বনে, কখনও বা ক্রিয়াপদের সাথে বর্ণাক্ষরের সমানতা গ্রহণ করে প্রদর্শিত হয়েছে। অতএব পূর্বোক্ত বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়, *তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ* প্রভৃতি সামবেদীয় নির্বাচিত ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে যাজ্ঞিক বর্ণনা ও তত্ত্বচিন্তার আধারে প্রদর্শিত নির্বচনগুলির নির্দিষ্ট পদ্ধতিগত কোনো রূপরেখার উল্লেখ না থাকলেও তা যাস্কাচার্য দ্বারা উক্ত নির্বচন-পদ্ধতিকে (অনেকাংশেই) অনুসরণ করেছে। বিবিধ অর্থপ্রদানকারী নির্বচনগুলি পদ্ধতিগত দিক থেকে যথার্থ এবং যাস্কাচার্য দ্বারা নির্দেশিত নির্বচন-পদ্ধতি এইসমস্ত নির্বচনগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ সমীক্ষার-ই ফলস্বরূপ।

'*নিরুক্তে* প্রাপ্ত সামবেদীয় শব্দসমূহের নির্বচন' নামক অধ্যায়টির সামগ্রিক আলোচনায় দেখা যায়, মূলত সেই সমস্ত শব্দের নির্বচন এখানে আলোচিত হয়েছে যেগুলি নির্বাচিত সামবেদীয় ব্রাহ্মণগুলিতে এবং যাস্কাচার্য বিরচিত *নিরুক্ত* নামক নির্বচন-গ্রন্থে নির্বচন প্রদর্শনপূর্বক বর্ণিত হয়েছে। *সামবেদসংহিতার* অন্তর্গত নির্বাচিত ব্রাহ্মণগ্রন্থ যথা- *তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ, জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ, জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্যোপনিষদ্, কেনোপনিষদ্* নামক বৈদিক গ্রন্থগুলিতে নির্বচনকৃত শব্দগুলি সম্পর্কে যাস্কাচার্য কী নিরুক্তি প্রদর্শন করেছেন তা উল্লেখ ও অর্থনির্ণয়পূর্বক শব্দগুলির উৎস সন্ধান করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণগুলিতে সেই একই শব্দের নির্বচনগুলিতে প্রাপ্ত ধাতু-প্রত্যয়গত বিশ্লেষণ উল্লেখ করে তুলনাত্মক বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। ফলস্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়, একাধিক ব্রাহ্মণগ্রন্থে একই শব্দ যেমন একাধিক ভিন্ন ভিন্ন ধাতু-প্রত্যয় বা শব্দ দ্বারা সিদ্ধ হয়েছে তেমনি একাধিক ব্রাহ্মণগ্রন্থে একই শব্দ একই উৎস থেকেও উৎপন্ন হয়েছে। নিরুক্তকার শব্দের উৎপত্তিতে কখনও একটি ব্রাহ্মণগ্রন্থের সাথে, কখনও বা একাধিক ব্রাহ্মণগ্রন্থের সাথে সহমত পোষণ করেছেন। আবার একাধিক ব্রাহ্মণগ্রন্থ ও *নিরুক্তে* একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিশ্লেষণ ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (যেমন অন্তরিক্ষ শব্দ)। পুনরায় কোন স্থানে ব্রাহ্মণগ্রন্থকে অনুসরণ করলেও তদতিরিক্ত নিজ প্রতিভার প্রকাশস্বরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যুৎপত্তিরও সন্ধান দিয়েছেন। এছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে যাস্কাচার্য একই শব্দের ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তির সাথে

তদ্ভিন্ন অর্থের দ্যোতক হিসাবে ভিন্ন ব্যুৎপত্তিও প্রদর্শন করেছেন, যেটি তাঁর কৃতিত্বে ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেছে। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য 'আদিত্য' শব্দের ব্যুৎপত্তি। অতএব বলা যায় আচার্য যাস্ক বৈদিক নির্বচন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন ঠিকই কিন্তু সর্বত্র অন্ধভাবে গ্রহণ না করে নিজ স্বতন্ত্র মহিমারও পরিচয় দিয়েছেন। বস্তুত তাঁর হাত ধরেই বৈদিক নিরুক্ত (নির্বচন) *নিরুক্ত* নামক নির্বচন-গ্রন্থের মর্যাদা প্রাপ্ত হয়।

'*বৃহদ্দেবতা* ও *মহাভারতে* প্রাপ্ত নির্বচন'- এই অধ্যায়ে আলোচনার দুই আকর গ্রন্থ হল শৌনকাচার্য বিরচিত *বৃহদ্দেবতা* নামক ঋগ্বেদীয় বৈদিক দেবতার বর্ণনাশ্রিত গ্রন্থ এবং অপরটি হল লৌকিক-সংস্কৃত-সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন *মহাভারত* নামক মহাকাব্য, যেটি মহর্ষি বেদব্যাস কর্তৃক প্রণীত হয়েছে। *বৃহদ্দেবতায়* বিদ্যমান বৈদিকদেববাচক শব্দগুলির নির্বচনসমূহ অর্থনির্ণয় ও বিশ্লেষণসহ উৎসসন্ধান করেছি। শৌনকাচার্য দ্বারা প্রদর্শিত নিরুক্তিতে *নিরুক্তকার* আচার্য যাস্কের প্রভাব সুস্পষ্ট। অধিকাংশ শব্দের নির্বচন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যাস্কাচার্য যে উপায়ে বা যে ধাতু বা শব্দ দ্বারা ব্যুৎপত্তি করেছেন *বৃহদ্দেবতাকার* সেই ধাতু বা শব্দ অনুকরণ করেছেন, তবে সর্বত্র তা নয়, তিনি *নিরুক্তকারের* মত যেমন উল্লেখ করেছেন তেমনি বিকল্প উপায়স্বরূপ স্ব-চিন্তনের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন (যেমন ইন্দ্র-শব্দ), এছাড়াও ব্যাকরণগত সংস্কার অনুসারেও তিনি শব্দের নিরুক্তি করেছেন (যেমন- বরুণ)।

মহাভারতের উদ্যোগ ও শান্তিপর্বে প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ নামের নির্বচনগুলি যাস্কাচার্যের তিনটি নির্বচনপদ্ধতি অনুসারে বিশ্লেষণ বিদ্যমান। যদিও ব্যাকরণগত সংস্কারভিত্তিক যাস্কীয়-প্রত্যক্ষনির্বচন পদ্ধতির অধিক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় তথাপি অন্য দুই পদ্ধতিরও (পরোক্ষ, অতিপরোক্ষ) প্রয়োগ নির্ণয় করা যায়। এর থেকে অনুমান করা যায়, বৈদিক নির্বচন তথা যাস্কীয় নির্বচনপদ্ধতি শুধু বৈদিক সাহিত্যের সম্পদ, তা নয়। এটি একদিকে যেমন বৈদিক সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে তেমনি তৎপরবর্তী লৌকিক সাহিত্যেও নিজ গুণে স্বমহিমায় ধরা দিয়েছে।

শ্রীমৎ অনির্বাণ বিংশশতকের মনীষী তথা বেদব্যাখ্যাকার। তাঁর প্রণীত *বেদমীমাংসা* বৈদিক সাহিত্যচর্চার এক অমূল্য সম্পদ। এতদিনে ব্যাকরণ ফুলে-ফলে-শাখায় পল্লবিত হয়েছে মহীরুহ আকার ধারণ করেছে। তথাপি তিনি আলোচ্য গ্রন্থে বৈদিকদেবতা সম্বন্ধে আলোচনাকালে বিভিন্ন দেববাচক শব্দের অর্থনিরূপণের জন্য নিরুক্তির-ই আশ্রয় নিয়েছেন। গ্রন্থটি বঙ্গভাষায় রচিত হওয়ায় নির্বচনগুলি বাংলাভাষাতেই প্রদর্শিত হয়েছে। উক্ত নির্বচনস্থিত শব্দগুলির সাথে সম্পর্কিত সংস্কৃত শব্দ তথা ক্রিয়াপদগুলির সংস্কৃত রূপ বা ধাতুর অনুসন্ধান করে সামগ্রিকভাবে শব্দটির উৎসসন্ধান যেন অন্ধকারে ঢিল নিক্ষেপের মত, তবে লক্ষ্যচ্যুত হওয়ার অবকাশ নেই। বিংশ শতকে রচিত হলেও বা বাংলা ভাষায় লিখিত হলেও বৈদিকদেবতাসমূহ বৈদিক নির্বচনের ছত্রছায়ায় ভিন্ন অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত হয়েছে। এখানেও যাস্কীয়-নির্বচন-সিদ্ধান্তের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

সত্যার্থপ্রকাশ নামক গ্রন্থের প্রথম সমুল্লাসে ঈশ্বরের একশত নাম ব্যাখ্যাত হয়েছে। তারও পূর্বে পরমাত্মাবাচক বেশ কিছু শব্দ ব্যাখ্যাত হয়েছে। সেগুলি সহ প্রথম পঞ্চাশটি শব্দ আলোচনা করেছি। এখানে 'বিরাট্', 'বিশ্ব', 'হিরণ্যগর্ভ' প্রভৃতি পরমেশ্বর অর্থে প্রযুক্ত শব্দগুলি তাঁর বিবিধ গুণ ও কর্মের পরিচায়ক। কয়েকটি ব্যতিরিক্ত সমস্ত শব্দই ব্যাকরণগত শব্দগঠন প্রক্রিয়া অনুসারেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিছু শব্দ বিদ্যমান যেগুলি ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তি ও ধ্বনিতাত্ত্বিক উভয় পদ্ধতি অনুসারেই ব্যাখ্যাত হয়েছে, যা নির্বচনধর্মীতার পরিচয় প্রকাশ করে।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্ নিরুক্ত, বৃহদ্দেবতা, মহাভারত, ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা ও সত্যার্থপ্রকাশ -এই গ্রন্থগুলিতে একাধিক দেববাচক শব্দের নির্বচন প্রদর্শিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি দেবতাবাচক শব্দ যেমন- 'অগ্নি', 'আদিত্য', 'জাতবেদাঃ', 'রুদ্র', 'বরুণ', 'বিষ্ণু' ও 'হিরণ্যগর্ভ' এই সাতটি শব্দের নির্বচনগুলির তুলনাত্মক

আলোচনা থেকে জানা যায় নির্বচনগুলি প্রকৃতপক্ষে সংশ্লিষ্ট দেবতাবর্গের স্বরূপ সম্পর্কেই আমাদের অবহিত করে। অগ্নি প্রভৃতি দেবতার দেবত্ব বিবিধ আঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেগুলি তাঁদের নানা গুণ-মাহাত্ম্যেরই দ্যোতক।

অতএব বলা যায় সুদূর অতীতে শব্দের অর্থ নির্ণয়ের জন্য যে নির্বচন-পদ্ধতির আবির্ভাব হয় তা আধুনিকযুগে ব্যাকরণ-পদ্ধতির প্রভাবে হারিয়ে যায়নি বরং ব্যাকরণকে সাথে নিয়েই তার আলোকসামান্য প্রভায় কবি সাহিত্যিকদের হৃদয়ে সদা বিরাজিত।

***

পরিশিষ্ট

একবিংশ শতকে কতিপয় গবেষকের দৃষ্টিতে নির্বচন

বৈদিক ভাষার অলঙ্কারস্বরূপ উদ্ভূত 'নির্বচন' বা 'নির্বচন-পদ্ধতি'র বহমানতা যে শুধু প্রাচীন বা মধ্যযুগেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, আধুনিকযুগের কবি, সাহিত্যিকদের রচনাতেও এটির প্রয়োগ এই পদ্ধতির গুরুত্বকে অন্য মাত্রা প্রদান করেছে। বেদ-গবেষক ও সমালোচকদের দৃষ্টিতে 'নির্বচন' ('নিরুক্তি', 'নিরুক্ত') বিবিধরূপে ধরা দিয়েছে। সেইরকমই একবিংশ শতকে কয়েকজন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গবেষকের ভাবনার পাখায় ভর করে নির্বচনকে অনুধাবন করা যাক-

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'Saroja Bhate' (প্রাচ্য বেদবিদ্), 'M. A. Mahendale', 'Eivind Kahrs','J. Bronkhorst', 'Paolo Visigalli' (পাশ্চাত্য বেদ-গবেষক) প্রমুখ বেদবিদ্-দের নির্বচন সম্বন্ধিত প্রবন্ধগুলিতে সিদ্ধান্তিত বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলি যথা-

Paṇini and Yāska: principles of derivation (Saroja Bhate)

নিরুক্ত গ্রন্থে অবস্থিত 'ব্যুৎপত্তি' (Derivation) মানেই তা শব্দের অর্থ বর্ণনা করা, এটিই আবার পাণিনীয় ব্যাকরণের প্রাথমিক লক্ষ্যগুলির মধ্যে একটি। পাণিনীয় ব্যাকরণের একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়। 'ব্যুৎপত্তি' বিষয় আলোচনা নিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু মুখ্য পার্থক্য বিদ্যমান, যেমন-

১. যাস্কর মতে ব্যুৎপত্তির ক্ষেত্রে শব্দের ধ্বনিগত ও অর্থগত সাদৃশ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি 'প্রত্যক্ষবৃত্তি' শব্দকে কম গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে পাণিনীর মূল লক্ষ্যই ছিল ব্যাকরণগত গঠন প্রক্রিয়া।

২. যাস্কর মতে সকল নামপদেরই গঠন ও অর্থ সমান রেখে ধাতুগত বিশ্লেষণ করা যায় এবং সেই জন্য সমস্ত শব্দই *নিরুক্ত*-এর বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। কিন্তু পাণিনি 'পরোক্ষবৃত্তি' শব্দ কিছুটা ব্যাখ্যা করলেও 'অতিপরোক্ষবৃত্তি' শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি (derivation) করেননি।

৩. পাণিনি সীমিত কিছু ধাতু ও প্রত্যয়কে উৎস হিসাবে গ্রহণ করে সেগুলি দ্বারা শব্দের নির্বচন করেছেন। যাস্ক পরিচিত ধাতু-প্রত্যয় ছাড়াও কাল্পনিক (fictional) ধাতু প্রত্যয় দ্বারা শব্দকে বিশ্লেষণ করেছেন।

৪. *নিরুক্ত*-এর কাজ সেখানেই শুরু যেখানে ব্যাকরণের কাজ শেষ। এইজন্যই যাস্ক *নিরুক্ত*-কে 'ব্যাকরণস্য কাৎর্স্ন্যং' বলা হয়েছে।

Yāska's Etymology of Daṇḍa (By M. A. Mahendale)

যাস্কাচার্য তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত 'দণ্ড্য' শব্দের অর্থ নিরূপণের পর মূল 'দণ্ড' শব্দের নির্বচন প্রসঙ্গে বলেছেন- "দণ্ডো দদতের্ধারযতিকর্মণঃ"[১] অর্থাৎ 'দণ্ড' শব্দটি ধারণার্থক দদতে বা √দদ্-ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। যদিও দুর্গাচার্য বলেছেন যা অপরাধ বিষয়ে রাজারা ধারণ অর্থাৎ গ্রহণ বা অবলম্বন করেন। স্কন্দস্বামী 'ধারণ' শব্দের অর্থ করেন 'নিরোধ'। তবে এইসব অর্থকে অতিক্রম করে যাস্ককৃত পুরাণোক্ত প্রমাণই √দদ্-ধাতু যে ধারণার্থে প্রযুক্ত তার সঠিক বিশ্লেষণে সক্ষম হয়, সেটি হল- "অক্রূরো দদতে মণিমিত্যভিভাষন্তে"[২]- এর অর্থ হল অক্রূর নামক রাজা মণি ধারণ করেন- 'অক্রূরো ধারযতি মণিম্'। পুরাণোক্ত এই কাহিনীতে 'ধারণ করা' বলতে শুধু হাতের দ্বারা বা মাথায় বা শরীরের যে কোনো অঙ্গে ধরে থাকা বা গ্রহণ করা নয়। কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থে প্রয়োগ না করে, কোনো একজনের বা সকলের প্রতিনিধি হয়ে ধারণ করা, অক্রূর স্যমন্তক মণি ধারণ করেছিলেন মণির অধিকারীর স্বার্থে, জাতির স্বার্থে। মণি থেকে প্রাপ্ত সুবিধা সে ভোগ করতে পারবেনা, যেটি

সে আগে ভোগ করেছে নিজের স্বার্থে। এরকম শাস্তিমূলক ধারণ করা অর্থে ধারনার্থক √দদ্-ধাতু থেকে দণ্ড শব্দ উৎপন্ন। (ধারযতি = to owe)। অতএব শব্দের উৎপত্তির ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পটভূমি বিশেষ ভূমিকা পালন করে, এটিই M. A. Mahendale এর অভিমত।

Yāska's Use of Kasmāt (By Eivind Kahrs)

'Eivind Kahrs' *নিরুক্তে* 'কস্মাত্' শব্দের প্রয়োগ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। যাস্কাচার্য *নিরুক্ত* নামক গ্রন্থে শব্দের নির্বচনের ক্ষেত্রে মাঝে প্রায়শই 'কস্মাত্' এই শব্দ প্রয়োগ করেছেন, যেমন- 'অন্নম্ কস্মাত্'?। লক্ষ্মণ স্বরূপ এই প্রশ্নবোধক বাক্যটির অর্থ করেছেন- 'কোন ধাতু থেকে অন্ন শব্দ ব্যুৎপন্ন?', ভাষ্যকার স্কন্দস্বামী ও মহেশ্বর 'কস্মাৎ' শব্দকে ব্যাখ্যা করেছেন 'কস্মাদ্ ধাতোঃ' এই শব্দ দুটি দ্বারা।

'Eivind Kahrs' *নিরুক্ত*-এর 'বাক্' শব্দের নির্বচন প্রসঙ্গে স্কন্দ- মহেশ্বরের ভাষ্য উল্লেখ করে বলেছেন, স্কন্দ-মহেশ্বরের ভাষ্যের চতুর্থ পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী 'সা চ কস্মাদ্ ধেতোঃ বাক্'? এখানে 'কস্মাদ্ ধেতোঃ' শব্দের অর্থ 'কী কারণে বা কী হেতু' (for what reason 'hetoh')। অর্থাৎ এখানে দেখা যায়, 'ধাতোঃ' স্থানে 'হেতোঃ' বলা হয়েছে। তাঁর মতে সন্ধির দ্বারা 'হেতোঃ' থেকে 'ধেতোর্' এবং অবশেষে 'ধাতোর্' শব্দে পরিণত হয়েছে - হেতোঃ > ধেতোর্ > ধাতোর্। অতএব, 'বাক্' শব্দের নির্বচনে বলা যায়- 'বাক্ কস্মাত্'? এখানে 'কস্মাত্' মানে 'কী কারণের জন্য (কস্মাদ্ হেতোঃ)', 'বাক্' এই নাম। এই প্রসঙ্গে তিনি দুর্গাচার্য ও রাজবাড়ের (Rajvade) মত উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে দুর্গাচার্য বৃত্তিতে বারংবার 'ত্বাত্' অন্ত ব্যাখ্যামূলক শব্দ প্রয়োগ করেছেন অর্থাৎ 'হেতোঃ' শব্দটি তিনি সমর্থন করেছেন বলা যায়। রাজবাড়ের (Rajvade) মতে যাস্ক যেখানে 'কস্মাত্' শব্দ প্রয়োগ দ্বারা কোনো শব্দের ব্যুৎপত্তি করেছেন, সেখানে 'কস্মাত্' শব্দটি ব্যবহার করেছেন 'কোন ধাতু থেকে এবং কেন? (from what root and why?) এই অর্থে। অবশেষে, Eivind Kahrs বলেছেন- 'ধাতু' নয়, 'হেতু' শব্দই গ্রহণযোগ্য। তাঁর মতে 'কস্মাৎ' শব্দের অর্থ 'কেন'? 'কী হেতু' (কারণ)? (why?; for what reason?).[৩]

Nirukta Uṇādisūtra and Aṣṭādhyāyī (J. Bronkhorst)

আলোচ্য শোধপত্রিকায় *নিরুক্ত*-গ্রন্থ, 'উণাদিসূত্র' এবং পাণিনি দ্বারা বিরচিত *অষ্টাধ্যায়ী* গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক এবং সেই বিষয়ে একাধিক গবেষকের মত গ্রহণ ও খণ্ডন করা হয়েছে।

J. Bronkhorst প্রথমে *নিরুক্ত*-গ্রন্থস্থিত নিপাত বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। Folk এর মতে নিপাতের দুটি শ্রেণীবিভাগ বর্তমান। তিনি Folk এর এই মতের বিরোধিতা করে বলেছেন, নিপাতের ভেদ বিষয়ে যাস্কের আলোচনা থেকে নিপাতের চারটি বিভাজনই গ্রহণীয়।

ঐকপদিক শব্দ বলতে তিনি (J. Bronkhorst) বলেছেন যে সমস্ত শব্দের ব্যাকরণগত গঠনের সাথে অন্বিত অর্থ ছাড়াও এক বা একাধিক অর্থ বিদ্যমান এবং এই অর্থবিশিষ্টরূপে বা অর্থের বোধক রূপে শব্দটির ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ জানা নেই, সেই শব্দগুলিকে ঐকপদিক শব্দ বলে। এগুলিকে অব্যুৎপন্ন শব্দও বলা হয়। যেমন- 'আদিত্য' শব্দের 'অদিতেঃ পুত্র' অর্থাৎ অদিতি পুত্র এই অর্থ ছাড়াও সূর্য এই অর্থও বিদ্যমান। কিন্তু সূর্য অর্থের দ্যোতক 'আদিত্য' শব্দের ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ অনুপলব্ধ। যাস্ক সেই সব শব্দ আলোচনা করেছেন যেগুলির ব্যাকরণগত গঠন প্রক্রিয়া সেই সমস্ত শব্দের অর্থ নির্ণয়ে সহায়তা করেনা। ঐকপদিক নামকরণের ক্ষেত্রে ব্যাকরণ প্রক্রিয়ার সহায়তার অভাবকেই বোঝানো হয়েছে। যাস্ক 'দর্বি', 'হোমিন্' শব্দ দুটিকে উণাদিসূত্রের মতোই পরপর উল্লেখ করেছেন। অতএব বলা যায় তিনি এইসমস্ত উণাদিসূত্রের সাথে পরিচিত ছিলেন এবং এগুলি বর্তমান উণাদিসূত্র দ্বারা সংরক্ষিত হচ্ছে।

আবার যাস্কের মতে 'পুরুষ', 'অশ্ব', 'তৃণ' এই শব্দগুলির অর্থের সাথে অন্বিত কৃদন্ত গঠন নেই কিন্তু এগুলি বর্তমানে উপলব্ধ উণাদিসূত্রে বিদ্যমান। অতএব বলা যায় তিনি এইসমস্ত উণাদিসূত্র জানতেন না। তিনি বেশ কিছু উণাদিসূত্র জানতেন যেগুলি বর্তমানে পাওয়া যায়না।

তাঁর মতে *নিরুক্ত* যতদূর সম্ভব ব্যাকরণকে অনুসরণ করে। এটি ব্যাকরণের পরিপূরক। ব্যাকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা অব্যুৎপন্ন শব্দের ক্ষেত্রেই ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ ব্যাকরণপ্রক্রিয়া ভিন্ন উপায়ে করেছেন।

যাস্কাচার্যের *নিরুক্ত* গ্রন্থের ২.১-২ অধ্যায়ে ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণের পদ্ধতি স্বরূপ ব্যাকরণ অনুমোদিত বর্ণবিপর্যয়, বর্ণলোপ ইত্যাদি নিয়মের কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও যাস্ক ও পাণিনি উভয়েই প্রাচীন শব্দের ব্যুৎপত্তিতে √অঞ্চ্ ধাতুর 'অ' এর লোপ ঘটিয়েছেন এবং দীর্ঘীকরণ করে 'প্র' করেছেন, যেখানে অন্যভাবেও ব্যুৎপত্তি করা যেত। অন্যান্য প্রমান এর সাথে এইদুটি প্রমাণের ভিত্তিতে theime মহাশয় পাণিনি সাপেক্ষে যাস্ককে পরবর্তীকালীন বলেছেন।

- J. Bronkhorst এর মতে ব্যাকরণের কাজ যেখানে শেষ হচ্ছে, সেখান থেকেই নিরুক্তের কাজ শুরু হয়।
- ব্যাকরণপদ্ধতি শব্দের গঠনের অপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে, যা শব্দের অর্থ অনুসন্ধানে সহায়ক হয়।
- শব্দের বিশ্লেষণে ব্যাকরণের ভূমিকা অসীম কিন্তু যেখানে অর্থের প্রসঙ্গ উপস্থিত সেখানে নিরুক্তই যথার্থ।
- J. Bronkhorst এর মতে আমরা অনুমান করতে পারি, যাস্ক ব্যাকরণের (পাণিনি-ব্যাকরণ) পাশাপাশি উণাদিসূত্রের মতো বিষয় সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

Words In and Out of History: Indian Semantic Derivation (Nirvacana) and Modern Etymology in Dialogue (Paolo Visigalli)

এই প্রবন্ধ থেকে নির্বচন সংক্রান্ত যে সমস্ত তথ্য পেয়েছি সেগুলি হল-

- একটি শব্দ কোন পটভূমিতে আলোচিত হয়েছে সেটি, নির্বচনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে অর্থাৎ পটভূমি (Context) অনুসারে শব্দের নির্বচন করা যায়। যেমন- 'কাণুকা' এই শব্দের নির্বচন (*ঋগ্বেদসংহিতা* ৮/৭৭/৪)।
- শব্দের নির্বচনে বৈদিক ঐতিহ্যেরও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। যেমন- অগ্নি শব্দের নির্বচনে 'অগ্নিপ্রণয়নকর্ম'কে মাথায় রেখেই নির্বচন করা হয়েছে।
- কোনো কোনো শব্দের (প্রত্যক্ষবৃত্তি) নির্বচন ব্যাকরণানুসারে করা হয়েছে।
- 'পরোক্ষবৃত্তি' শব্দের নির্বচন ব্যাকরণ অনুমোদিত ধ্বনিপরিবর্তনের নিয়মানুসারে করতে হয়। যেমন- 'ধ্' এর স্থানে হ্' ইত্যাদি। 'Paolo Visigalli' 'বৃত্তিসামান্য' শব্দের অর্থ করেছেন- "Similarity with a phonetic change (vṛttisāmānya) that has been accepted by the grammarians..."[৪] অর্থাৎ 'ব্যাকরণ সম্মত ধ্বনিপরিবর্তনজনিত সাম্য'।
- বেশ কিছু স্থানে 'পরোক্ষবৃত্তি' শব্দের একটি অন্তর্নিহিত স্পষ্ট রূপ বিদ্যমান থাকে, যার দ্বারা পরোক্ষ শব্দটির সম্বন্ধ স্থাপন করা যায়।
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্বচনে শব্দের অন্তর্নিহিত স্পষ্ট রূপ থাকেনা। এই ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদ ও শব্দের মধ্যে একটা সরাসরি সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। যেমন- শাকপূণির মতানুসারে 'অগ্নি' শব্দের নির্বচন।

- নেতিবাচক ভঙ্গীতেও নির্বচন প্রদর্শন করা যায়। যেমন- স্থৌলাষ্ঠীবিকৃত 'অগ্নি' শব্দের নির্বচন।
- শব্দটি যে বস্তুর বাচক সেই বস্তুর অভিজ্ঞতামূলক বিশ্লেষণকেও নির্বচনের অঙ্গ হিসাবে ধরা যায়, যেমন- অগ্নি শব্দের নির্বচন- 'অঙ্গং নযতি সন্নমমানঃ'।[৫]
- নির্বচনে ধ্বনিসাম্য অবশ্যই যেন ধাতুর সাথে অর্থানুসারী হয়।

তথ্যপঞ্জি

[১] অমরেশ্বর ঠাকুর (সম্পা.), *নিরুক্তম্* ২/১/২/১৫, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৯৭।

[২] তত্রৈব।

[৩] Eivind kahrs, "Yāska's Use of Kasmāt". Indo-Iranian Journal (231-237). Page 234.

[৪] Paolo Visigalli, "Words In and Out of History: Indian Semantic Derivation (Nirvacana) and Modern in Itymology Dialogue". Philosophy East and West, Vol. 67. Page- 1144.

[৫] অমরেশ্বর ঠাকুর (সম্পা.), *নিরুক্তম্* ৭/১৪/৪, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮৮৬।

***

Select Bibliography

Anirvan. *Veda-Mīmāṁsa.* Kolkata: Sanskrit Book Dipot, 2017 (Rpt.) (1st ed. 2006).

___.___. Kolkata: Sanskrit Book Dipot, 2018 (Rpt.) (1st ed. 1418 BY).

___.___. Sanskrita Book Depot, 2015 (1st edition).

Bandyopadhyay, Ashok Kumar. Paṇinīya *Vaidika* Vyākaraṇa. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhander, 1418 BY (2nd Edition).

Bandyopadhyay, Dhirendranath. *Saṃskṛta Sāhityer Itihāsa*. Kolkata: West Bengal State Book Board, 2010 (rpt.) (1st ed. 1988).

Bandyopadhyay, Shanti. *Vaidika Sāhityera Rūparekhā*. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhander, 2003 (rpt.) (1st ed. 1993).

Bharata. *Nāṭyaśāstram*. Vol. 1. Ed. Suresh Chandra Bandyopadhyay. Kolkata: 1359 (BY).

Bhattacharya, Bishnupada. *Vaidik-Devatā*. Kolkata: Vishwabharati Granthalaya, 1357 BY (1st Edition) (Vishwavidya Sangraha-82).

Bhaṭṭojidīkṣita. *Siddhāntakaumudī.* Vol. 3. Ed. Binodlal Sen. Kolkata: Sadesh, 2005 (rpt.) (2nd imp.).

Chāndogyopaniṣad. Ed. Gambhirananda. *Upaniṣad Granthāvalī.* Vol.3. Kolkata: Udbodhan Karyalaya, 1962.

Chāndogyopaniṣad. Ed. Ganga'Nath Jha. With Sankara's Commentary. Madras: The India Printing Works, 1923.

Chāndogyopaniṣad. Ed. And Comp. Gautam Dharmapal. *Upaniśat-Prasanga*.Vol.8.Badwan: Badwan University, 2020 (1st edition).

Dayananda, Saraswati. *Satyārtha Prakāsh*. Ed. Durga Prasad. *An English Translation of the Satyarth Prakash*. Lahore: Virjananda Press, 1908 (1st Edition).

___.___. Comp. Dharmapal Arya. With Beng. Trans. Kolkata: Arsha Sahitya Prakash Trast, 2021 (rpt.) (1st ed. 2017).

___. *Ṛgvedadibhāṣyabhūmikā.* Comp. Satish Chandra Mondal. With beng. Trans. Delhi: Arsha Sahitya Prakash Trast, 2019 (1st ed.).

Dharmapal, Gouri. *Veder Bhaṣa O Chanda*. Kolkata: Pashchimbanga Rajya Pustak Parshat, 2015 (rpt.) (1st ed. 1999).

Jaiminīya Brāhmaṇam. Ed. Raghuvir and Lokesh Chandra. Delhi: Motilal Banarasi Das, 1954.

Jaiminīya Upaniṣadbrāhmaṇam. Ed. Bhagabaddutta. Lahore: Vidya Prakash Press, 1921(1st Edition) (Shrimaddayananda Mahavidyalaya Sanskritagranthamala- 3).

Kahrs, Eivind. "Yāskas Use of Kasmāt". Indo-Iranian Journal 25 (1983) 231-237.

Kauṭilya. Arthaśāstram. Ed. With Beng. Trnas. Manabendu Bandyopadhyay. Kauṭilīyam Arthaśāstram. Part 1. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 2011 (rpt.) (1st ed. 2001).

___.___. Ed. With Beng. Trnas. Manabendu Bandyopadhyay. Kauṭilīyam Arthaśāstram. Part 2. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 2014 (rpt.).

Kenopaniṣad. Ed. Gambhirananda. *Upaniṣad Granthāvalī.* Vol.1. Kolkata: Udbodhan Karyalaya, 1962.

Lavanyabijaya. *Dhātupāṭhakoshah.* Kolkata: The Banaras Mercantile Company, 2020.

M. A. Mahendale. "Yāska's Etymology of Daṇḍa". American Oriental Society. Vol. 80, No. 2, 1960, Pp. 112-115.

Max Müller, Friedrich. *A History of Ancient Sanskrit Literature*. New Delhi: Asian Educational Services, 1993 (rpt.) (1st pub. 1859).

Mishra, Gopabandhu. *Kṛtpratyaviśleṣaṇa*. New Delhi: Rashtriya Sanskrita Samsthan, 2005 (1st Edition)

Mukhopadhyaya, Govindagopala. *A New Tri-lingual Dictionary*, Sanskrit-Bengali-English. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2013 (rpt.) (1st Edition 2006).

Muṇdakopaniṣat: *Anandagirikṛtaṭīkāsaṃvalita Śāṁkarabhāṣyasametā*. Ed. Harinārāyaṇa Āpte. Anandashramamudranalaya, 1918 (4th rpt.). (Anandashrama Sanskrita Granthavali Granthanka 9).

Musalgaonkar, Gajananshastri and Rajeshwar (Raju) Shastri Musalgaonkar. *Vaidika Sāhitya kā Itihāsa*. Varanasi: Chaukhambha Sanskrit Sansthan, 2009 (rpt.). (The Kashi Sanskrit Series 275).

Niruktaślokavārttika. Ed. Vijay Pal. Kolkata: Srimati Savitridevi Bagadiya Trust, 1982.

Pāṇini. A*ṣṭā*dhy*āyī.* Ed. Si. Shankarram Shastri. A*ṣṭā*dhy*āyīsūtrapāṭhaḥ.* Delhi: Sharada Publishing House, 1994.

Pāṇini. *Uṇadikoṣḥ.* Ed. Satyabrata Shastri. Rajasthan: Kaka Printers, 1966.

Patañjali. *Mahābhāṣya*. Ed. Karunasindhu Das. *Pāṇinīya Mahābhāṣya.* With Beng. Trans. of Moksadacharan Samadhayi. Kolkata: Sadesh, 2005.

Radhakantadeva. *Shabda-Kalpadrum*.Vol. 1-5. Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1967 (3rd ed.) (Chowkhamba Sanskrit Series- 93).

Ṛgvedabhāṣyopakramaḥ. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2009 (rpt.) (1st ed. 2005).

___.___. Ed. With Hindi comm. Sharada Chaturvedi. *Ṛgveda-Bhāṣyabhūmikā*. Sharadi. Varanasi: Chowkhamba Krishnadas Academy, 2016 (rpt.). (Krishnadas Sanskrit Series 58).

Sāmavedasa*ṃ*hitā.Ed. Dilip Mukhopadhyay. With Beng. Trans. and Sāmaveda*Bhāṣyānukramaṇikā.* Kolkata: Akshay Library, 2022 (rpt.) (1st ed 1416 BY).

Sāyaṇa. Ṛ*gveda-Bhāṣyabhūmikā*. Ed. With Beng. Trans. Gurushankara Mukhopadhyaya.

Shabar Swami. *Jaiminīya-Mīmāṃsa-Bhāṣyam.* Ed. YudhiSthira Mimangsaka. *Mīmāṃsa-Śābar-Bhāṣyam.* With Hindi Trans. And Notes. Vol. 2. Hariyana: Ramlal Kapur Trast Press, 1978 (1st Edition).

Skandasvami and, Mahesvara. *Nirukta-bhāṣya-ṭīkā*. Ed. Jnanaprakash Shastri and Naresh Kumar. Delhi: Parimal Publication, 2012 (2nd ed.). (Parimal Sanskrita Granthamala- 104).

___. *Niruktabhāṣyaṭīkā. Vol. 3 and 4.* Ed. Lakshman Sarup. With intro. Lahore: The University of the Panjab, 1934.

___. *Niruktabhāṣyaṭīkā*. Ed. Lakshman Sarup. Lahore: The University of the Panjab, 1931.

Śāṁkhāyanabrāhmaṇam. Ed. With Hindi Trans. Rakesh Shastri. Part 1 and 2. Delhi: Chaukhambha Orientalia, 2020 (1st Edition) (Chaukhambha Prachyavidya Granthamala-39).

Śatapatha-Brāhmaṇam. With comm. *Vedārthaprakāś* of Sāyaṇa and Comm. of Hari Svāmin. According to *Mādhyandina* Recension. Part 1. Delhi: Nag Prakashan, 2020.

Śaunaka. *Bṛhaddevatā*. Ed. Ramkumar Rai. *The Bṛhad-devatā*. With Hindi trans. and Appendices. Varanasi: Chaukhambha Sanskrit Sansthan, 2019 (Rpt.).

Tāṇḍyamahābrāhmaṇam. With comm. *Vedārthaprakāś.* Part 1 and 2. Delhi: Chaukhamba Sanskrita Pratisthan, 1795 (Shakabda).

Taittirīya-Saṃhitā. Ed. Maitreyee Deshpande. *Kṛṣṇayajurvedīya Taittirīya-Saṃhitā*. Vol. 5. With comm. of Sāyaṇācārya. Delhi: New Bharatiya Book Corporation, 2012.

Taittirīyopaniṣad. Trans. and ed. Durgācaraṇa-Sāṃkhyavedāntatīrtha. *Kṛṣṇayajurvedīyā Taittirīyopaniṣad* with Śāṁkarabhāṣya.Vol. 1 and 2. Kolkata: Devasahitya Kutir, 1347 BY (rpt.) (3rd ed.).

Taittirīiyopanisat. With Śāṁkarabhāṣya. Trans. And ed. Swami Justananda. Kolkata: Udbodhan Karyalaya, 2021 (rpt.) (1st ed. 2014).

Vācaspatyam. Vol.1. Comp. Taranath Tarkavachaspati. Kolkata: Kavya Prakash Press, 1873

Vedabyāsa. *Mahābhāratam, Ādiparva to Bhīṣmaparva*. With comm. of Nīlakaṇṭha. Vol. 1. Ed. Panchānan Tarkaratna Bhaṭṭacārya. Kolkata: Bangabsi Electro Machine, 1830 (Shakavda) (2nd Edition).

Vedabyāsa. *Mahābhāratam. With Beng. Trans. and comm. Bhāratabhābadīpa and Bhāratakaumudī.* Shantiparvam 37. Kolkata: Vishwabani Prakashani, 1407 BY (2nd Edition).

Vedic Selections. Part 1. Ed. Kshitish Chandra Chatterji. Calcutta: Calcutta University Press, 1954.

Vidyasagar, Ishwarchandra. *Samagra Vyākaraṇ(a) Kaumudī.* Ed. Hemchandra Bhattacharya. Kolkata: Chalantika Prakashak, 1416 BY (12th rpt.) (1st ed. 1370).

Vishwabandhu. *Nighaṇṭu-Nirvacana-Mimaṁsa.* Delhi: Parimal Publication, 2013 (1st ed.).

Visigalli, Paolo. "Words In and Out of History: Indian Semantic Derivation (Nirvacana) and Modern Etymology in Dialogue". Philosophy East and West. Vol. 67. Published by University of Hawai'i Press, 2017, Pp. 1143-1190.

___.___. "The Vedic Background of Yāska's Nirukta". Indo-Iranian Journal 60 (2017) 1-31.

Yāska. *Nirukta*. Ed. Amareswara Thakur. With Beng. Trans. and Notes. Part 1. Kolkata: University of Calcutta, 2017 (rpt.) (1st ed. 1955). (The Asutosh Sanskrit Series No. 5).

___.___. Ed. Amareswara Thakur. With Beng. Trans. and Notes. Part 2. Kolkata: University of Calcutta, 2005 (rpt.) (1st ed. 1955). (The Asutosh Sanskrit Series No. 5).

___.___. Ed. Amareswara Thakur. With Beng. Trans. and Notes. Part 3. Kolkata: University of Calcutta, 2016 (rpt.) (1st ed, 1955). (The Asutosh Sanskrit Series No. 5).

___.___. Ed. Amareswara Thakur. With Beng. Trans. and Notes. Part 4. Kolkata: University of Calcutta, 2005 (rpt.) (1st ed. 1955). (The Asutosh Sanskrit Series No. 5).

___.___. Ed. and Eng. Trans. Lakshmana Swarupa. With Hin. Trans. Satyabhushana Yogi. *Nighaṇṭu Tathā Nirukta*. Delhi: MLBD, 1985 (rpt.) (1st ed. 1967).

___.___. Ed. Brahmachari Medhachaitanya. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhander, 1424 BY (1st ed.).

___.___. Ed. Mukunda Jha Bakshi. With comm. *Niruktavivṛtti*. Delhi: Chowkhamba Sanskrit Prathisthan, 2016 (rpt.).

___.___. Ed. Taraknath Adhikari. *Yāska's Nirukta (Chapter 1).* With Beng. Trans. and exposition. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2012 (rpt.).

***